সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

সাহিত্যজিজ্ঞাসায়
রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড

সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ

প্রথম খণ্ড

ভারতী পর্ব পর্যন্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত
অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বক্তৃতামালা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী : কলকাতা-১২

SAHITYA-JIJNASAY RABINDRANATH

(Rabindranath as a Literary Critic)

Vol. 1.

by

Dr. Asit K. Banerjee
Calcutta University

প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬৬

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

মূল্য—৯.০০

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

প্রায় দু'বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে 'অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বক্তৃতা' দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে তখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। পরে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য 'সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' এই নাম দিয়ে তিনটি বক্তৃতা প্রস্তুত করি। ইচ্ছা ছিল, সমালোচক রবীন্দ্রনাথের একটি সমগ্র মানসমূর্তি তুলে ধরব। কিন্তু কাজে নেমে দেখলাম, তিনঘণ্টার তিনটি বক্তৃতায় সে চেষ্টা দুঃসাধ্য হবে। তাতে কবিগুরুর প্রতি সুবিচার করা যাবে না, শ্রোতাদের প্রতিও না। তখন ভারতী পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিচার-সংক্রান্ত যাবতীয় রচনা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই, এবং অতি সংক্ষেপে তিনটি বক্তৃতায় সেই অংশটুকু আলোচনা করি। এ গ্রন্থটি সেই বক্তৃতারই পূর্ণ রূপ। বক্তৃতাকালে তথ্যপ্রমাণ প্রভৃতি উল্লেখ করার অবকাশ ছিল না, এখন সেগুলিকে যথাস্থানে নির্দেশ করা গেল।

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির সঙ্গে এই বক্তৃতামালার যোগাযোগ। বাংলাদেশে অলঙ্কার শাস্ত্র চর্চায় তিনি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনীষা ও সংশ্লেষণ-পদ্ধতি দেখে আমি ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত হয়েছি। তাঁর নামসম্পৃক্ত বক্তৃতামালার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি। উক্ত তিন দিনের বক্তৃতায় পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রীতিভাজন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক প্রণব-রঞ্জন ঘোষ, ডক্টর আশুতোষ দাস এবং সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণ উপস্থিত থেকে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা তিন দিন ধরে এ নীরস আলোচনা শুনে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এই আলোচনায় আমি রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধ ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী') থেকে শুরু করে ভারতী পর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ অবলম্বনে সাহিত্যবিচারপদ্ধতির স্বরূপ ধরতে চেষ্টা করেছি। বিষয়গত রীতি বা 'অবজেকটিভ' প্রকরণ অনুসরণ করে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে পরিব্যক্ত তাঁর মতামতের যাথার্থ্য বিচারই আমার প্রধান উদ্দেশ্য—তাতে কতটা সফল হয়েছি, তার বিচারের ভার রইল পাঠকের ওপর। প্রথম অধ্যায়টিতে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের বাংলা সমালোচনা ও সাহিত্যবিচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়েছি। তা না হলে সমালোচনাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যেত না। 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশে রাজনারায়ণ-যোগীন্দ্রনাথ বসু থেকে শুরু করে ইদানীন্তনকালে মোহিতলাল মজুমদার, অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী প্রভৃতি পণ্ডিত ও রসজ্ঞদের আলোচনাকে সামনে রেখে আমি এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত বিশ্লেষণ করেছি। প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচাবপদ্ধতির গোড়ার দিকটি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পরিণতবয়স্ক কবিগুরুর রসবিচার-প্রকরণ বিচার করা যাবে।

এই বক্তৃতার কিয়দংশ 'কথাসাহিত্যে'র কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে তাঁদের পত্রিকার দু'সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান পাঁচুগোপাল দত্ত বক্তৃতাগুলিকে গ্রন্থাকারে দেখবার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন। করুণা প্রকাশনীর বামাচরণ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শোভনাকারে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থপরিকল্পনা ও আলোচনায় আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ. কু. ব.
বাংলা সাহিত্য বিভাগ,

সূচী

এই লেখকের কয়েকখানি গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য়, ৩য়)

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য

সমালোচনার কথা

উনিশ-বিশ (প্রবন্ধসংকলন)

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সমালোচনা

১

শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পসমীক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচেতনা দ্বিধারাবাহী। একটি স্বর্গের মন্দাকিনী, আর একটি মর্ত্যের ভাগীরথী। কখনও তার হৃদ্বৃত্তি মন্দাকিনীর কলসন্ধানী, কখনও তাঁর চিদ্বৃত্তি উপলব্যথিতগতি ভাগীরথীধারার সমরেখ। বস্তুতঃ চিত্তগহনের এ অপরূপ রহস্য যে-কোন সৃষ্টিকামী শিল্পীরই পরম সম্পদ। একাধারে রসসৃষ্টি ও রসবিশ্লেষণ, নির্মিতি ও নির্মিতিকৌশল, কাব্য ও সমালোচনা পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনায় অবিনাভাবে যুক্ত হয়ে আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথই-বা কেন, যে-কোন শিল্পীর হৃদ্বৃত্তি ও চিদ্বৃত্তির যুগপৎ সমন্বয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে। কবির অন্তরে সবদা একজন বিচারক বিরাজ করেন। তাঁর চিত্তগহনে গুপ্ত হয়ে থাকে আবেগের সঙ্গে মনন, রসবোধের সঙ্গে বিশ্লেষণবোধ। তবে রসসৃষ্টির পূবমুহূর্ত থেকে রসোদ্বোধের পূর্ণতাপ্রাপ্তি পযন্ত শিল্পীর মননপ্রক্রিয়া চেতনার অন্তরাল থেকে আবেগকে সৃষ্টিনিয়মের অধীনে রাখে, কাল্পনিকতাকে কল্পনার দ্বারা শাসিত ও সংযত করে। তা নইলে সমস্ত শিল্পসৃষ্টি ভাবরাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত করে রূপ-রেখা-ধ্বনি-রসকে এলোমেলো বিশৃঙ্খল করে তুলত।

পুরাতনী কথায় দেখা যায়, ক্রৌঞ্চবিয়োগবেদনায় ব্যাকুল হয়ে আদিকবি যখন শাকুনিককে অভিশাপ দিলেন, তখন সেটি সম্পূর্ণরূপে করুণায় আর্দ্র এবং আবেগমথিত হলেও শোকার্ত ঋষির শ্লোকোচ্চারণের পরক্ষণেই তাঁর চিদ্বৃত্তি জেগে উঠল :

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদিবিক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শাকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥

(রামায়ণ—আদি—২।১৬)

একথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকির হৃদয়ে এক চিন্তা উপস্থিত হল। যদিও তিনি তখন ঐ দৃশ্যই দেখছিলেন, তবু বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এ কি, আমি এই পক্ষীর শোকে কাতর হয়ে এ কী বললাম! এই যে 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া' —এ প্রশ্নটি নিখিল শিল্পী-সংঘের প্রতিটি সদস্যেরই মনের কথা, রসলোকের চিরকালের প্রশ্ন। শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'র দ্বারা, যার অপর নাম প্রতিভা। তার রহস্য প্রজাপতি ব্রহ্মারও অগম্য। অন্য শব্দের অভাবে তাকে দৈবী নাম দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সৃষ্ট শিল্পবস্তুকে আর পাঁচটা বুদ্ধিগম্য ব্যাপারের মতোই বিচারবিশ্লেষণের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা যায়। কাব্যের সমালোচক কবির অন্তরে বসেই অস্ত্রে শাণ দেন। কবি বাল্মীকি শুধু আদিকবি নন, আদি-সমালোচকও বটে। সৃষ্টিকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল সৃষ্টিকর্মের অব্যবহিত পরে। অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর 'ব্যাঙ' নাটকে ইসকাইলাসের সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি প্রশ্ন করেছেন: "So, answer me! What is it in a poet or admires?"—কোন বিশেষ কারণে কবিরা প্রশংসা দাবি করতে পারেন। এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য গড়ে উঠেছে অলঙ্কারশাস্ত্র, রসতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, poetics ইত্যাদি।

কাব্য রচনা করেন একজন, কাব্যরসের বিচারবিশ্লেষণ ও তৌল করেন আর একজন। অর্থনীতির প্রডাক্শন ও ডিস্ট্রিবিউশনের মতো সাহিত্য ও সমালোচনাকে এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে নিলে শিল্পকর্মের মূল্যনির্ণয়ে সুবিধে হয়। কিন্তু যে জগতে নিয়তিনিয়ম খাটে না, যা নিত্যই হ্লাদৈকময়ী ও রসরুচিরা, তাকে সব সময়ে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্যতার দ্বারা নিবদ্ধ করা যায় না। একথা ঠিক, সঙ্গীতসাধনায় বাদ্যযন্ত্র যেমন কণ্ঠকে অনুসরণ করে, তেমনি সমালোচক ও রসপ্রমাতা শিল্পীকেই অনুসরণ করে থাকেন। আগে সৃষ্টি, তার পরে তার বিচার,

১ *Eleven Plays of the Greek Dramatists*, The Universal Library Edition, New York (P. 350)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।[২] অবশ্য আর্নল্ডের মতো কেউ কেউ শিল্পীর আগে শিল্পবিচারকের স্থান নির্দেশ করতেও পারেন। কিন্তু কালিদাসের চেয়ে মল্লিনাথ-রাঘবভট্ট প্রাধান্য পাবেন এ-ই বা কেমন কথা? রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় কবি-প্রতিভা ও সমালোচক-প্রতিভাকে যথাক্রমে কারয়িত্রী প্রতিভা ও ভাবয়িত্রী প্রতিভা—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।[৩] এই দুই বৃত্তি কি একই, না পৃথক?

---

২ অবশ্য কাব্যবিচার করতে গেলে সমালোচককে কিয়ৎ পরিমাণে কবির সমপর্যায়ে উঠতে হয়। না হলে তিনি যথার্থ বিচার করতে পারেন না। সাঁৎ বোভ বলেছিলেন, "Poetry can only be touched by a poet." ড. জনসনও কতকটা এই রকম বলেছিলেন, "To judge of poets is only the faculty of poets, and not of all poets, but the best." তার আর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'To judge rightly of an author, we must transport ourselves to his time, and examine what were the wants of his contemporaries, and what were his means of supplying them." (Quoted from *English Critical Essays*, XVI–XVIII centuries, Ed. by E. D. Jones, P. 327.) ড্রাইডেন বলেছেন

> Both must alike from Heaven derive their light,
> These born to judge, as well as those to write.

পোপের মতে

> A perfect judge will read each work of wit,
> With the same spirit that its author writ.

এখানে বলা যাচ্ছে, সমালোচককে কিয়দংশে কবির সমধর্মী হতে হবে। মূল্যায়ন শক্তিই হচ্ছে সমালোচকের বড় শক্তি, যাকে রিচার্ডস বলেছেন, "To set up as a critic is to set up as a judge of values." (*Principles of Literary Criticism*, P. 60.)

৩ "সা চ দ্বিধা কারয়িত্রী ভাবয়িত্রী চ। কবেরুপকুর্বাণা। ভাবকস্যোপকুর্বাণা ভাবয়িত্রী' (কাব্যমীমাংসা, চতুর্থ অধ্যায়)। প্রতিভা দু-রকমের—কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। যে-প্রতিভা কবির কাব্যরচনার সহায়ক তাকে কারয়িত্রী প্রতিভা এবং যে-প্রতিভা সমালোচকের উপকার করে তাকে বলে ভাবয়িত্রী প্রতিভা।

প্রতিভাতারতম্যেন প্রতিষ্ঠা ভুবি ভূরিধা।
ভাবকস্তু কবিঃ প্রায়ো ন ভজত্যধমাং দশাম্॥

প্রতিভার তারতম্য হেতু পৃথিবীতে বহু বিচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। যিনি একাধারে কবি ও সমালোচক, তিনি প্রায়ই শোচনীয় নিকৃষ্ট দশায় পড়েন না। আবার কেউ বলেন, কাব্যরচনা ও কাব্যসমালোচনা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। কারণ এ দুটি কার্যের স্বরূপ ভিন্ন, বিষয়ও ভিন্ন।[৪] কিন্তু তা হলেও রাজশেখর সমালোচকের জন্য উচ্চস্থান নির্দেশ করেছেন—সমালোচক হচ্ছেন কবির প্রভু, মিত্র, মন্ত্রণাদাতা, শিষ্য, আচার্য অর্থাৎ সবই হতে পারেন এমন কী বিচিত্র সম্বন্ধ আছে, যা ভাবক-সমালোচকের আর ও হতে পারে না?[৫] সমালোচকের কাজ হল, "To judge a work on its merits, to decide what in it is good and what is bad."[৬] —শুধু এইটুকু মাত্র? আর্নল্ড অবশ্য একথাও স্বীকার করেছেন, "The critical power is of lower rank than the creative."[৭] তাই সমালোচকের বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি আরও একটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যেটি সমালোচকের আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে। তিনি বলেছেন, যথার্থ সাহিত্যবিচারের জন্য প্রয়োজন, "The Indian virtue of detachment and abandoning the sphere of practical life."[৮] এই নিস্পৃহতা

৪ "পৃথগেব হি কবিত্বাদ্ ভাবকত্বং, ভাবকত্বাচ্চ কবিত্বং স্বরূপভেদাদ্ বিষয়ভেদাচ্চ।" (ঐ, চতুর্থ অধ্যায়)।

৫ স্বামী মিত্রং চ মন্ত্রী চ শিষ্যশ্চাচার্য এব চ।
কবের্ভবতি হা চিত্রং কিং হি তন্ন যদ্ভাবকঃ॥ (ঐ)

৬. "Poets and Scholars"—M Bowra (*English Critical Essays*, XX Century, Second Series)

৭. *The Essays in Criticism*—First Series ("The Function of Criticism", p 3)

৮ ঐ, পৃ. ১৬. এলিয়ট বলেছেন, যথার্থ সমালোচকের দুটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়:—(1) Elucidation of works of arts, (2) Correction of

এবং বাস্তবজীবনের কেজো-নীতিবর্জিত চেতনাই সমালোচককে বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তা বলে তাঁকে কেউ শিল্পীর সমকক্ষ বলে মনে করেন না; বরং কিছু নীচে স্থান দিতে চান। এজ্‌রা পাউণ্ড তো সগর্বে বলেছেন, "I think one work of art is worth forty prefaces and as many apologies."[৯]

এ সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে, যথার্থ সমালোচক হবেন রসপ্রমাতা, বিচারক—কিন্তু দণ্ডপাণি নন। যে-সব সমালোচক শুধু নীরস 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনায় আসক্ত এবং তথ্যস্তূপের ওপর পদ্মাসনে আসীন, তাদের ওপর এলিয়টের বিদ্রূপাস্ত্র নিপুণভাবেই বর্ষিত হয়েছে।[১০] কিন্তু অনেক পাঠকের মন সমালোচকের কর্তব্য ও ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নসঙ্কুল হয়ে থাকে। সমালোচক কি শুধু বিচারক হবেন, শুধু বুদ্ধিবিবেচনা ও যৌক্তিকতার মানদণ্ডে শিল্পকে বিচার-বিশ্লেষণ ও কাটাছেঁড়া করবেন? বাতো (Batteux) একদা প্রশ্ন করেছিলেন, "Is wit alone, or heart

---

taste. ("The function on Criticism"—*Selected Essays*, Faber and Faber, p. 24)

৯ *Literary Essays of Ezra Pound* (p. 41)—Edited by T. S. Eliot

১০. উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক এলিয়ট বলেছেন, "And it is an illusion fostered by academic authorities in literature, that there is only one kind of criticism, the kind that is delivered on academic foundations, to be printed afterwards in the proceedings or as brochure in a series." (P.XIV)

এলিয়ট এখানে ঠিকই বলেছেন। সাহিত্যের বিষয় ও রসবস্তু অনুসারে সমালোচনার রীতি-পদ্ধতিও পৃথক হতে পারে। রিচার্ডস্‌-ও এই মতাবলম্বী। তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয়—"It is only fair to say that few critics seem ever to notice it—that poetry is of more than one kind, and that the different kinds are to be judged by different principles.—*Principles of Literary Criticism* (14th Impression), P. 77

alone, the organ of taste or both together?"[১১] সাহিত্যরসবিচারে শুধু বুদ্ধি, না হৃদয়—অথবা দুই-ই কার্যকর হয়? সমালোচককে যদি "a sound judge of values" (Richards) হতে হয়, তবে বুদ্ধির যৌক্তিকতার ওপর বেশী নির্ভর করতে হবে। কিন্তু যথার্থ সমালোচনা একপ্রকার নতুন সৃষ্টি, অর্থাৎ শিল্পবিচারে সমালোচককেও শিল্পী হতে হবে, অন্ততঃ শিল্পীর মনঃপ্রকৃতির খানিকটা সমধর্মী হতে হবে? ফ্লোবেয়র একদা দুঃখ করে তাঁর বন্ধু জর্জ স্যাণ্ডকে বলেছিলেন যে, সমালোচকদের কেউ সাহিত্য ও শিল্পের ভাষা এবং ব্যাকরণ নিয়ে ব্যস্ত, কেউ-বা তার ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে মুখর। কিন্তু "When he will be an artist, a mere artist, but a real artist."[১২] তাঁর মতে, প্রথম শ্রেণীর সমালোচকের প্রধান অস্ত্র কল্পনাশক্তি ও হৃদ্বৃত্তি।[১৩] বৃথা তত্ত্বালোচনা ও যুক্তিতর্কের কচকচিতে সাহিত্যসমালোচনা যে বেশীদূর যেতে পারে না সেকথা প্রসিদ্ধ ইতালীয় সমালোচক ফ্রান্সেসকো দে সাংক্তিস্ (Francesco de Sanctis) ফরাসী সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছিলেন, "The Frenchman does not indulge in theories, he goes straight to the subject; his argument palpitates with warmth of impression and sagacity of observation."[১৪] রবীন্দ্র-সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই 'warmth of impression', 'sagacity of observation' এবং ফ্লোবেয়র-

১১. Croce—*Æsthetic*, Tr. by Douglas Ainslie (The Noonday Press), P. 466

১২. Ibid, P. 368

১৩ "Such a critic must have great imagination and great goodness of heart, I mean an ever-ready faculty of enthusiasm, and then taste; but this last is so rare, even among the best, that it is never mentioned nowadays."—Ibid, P. 368

১৪. Croce, Ibid

আকাঙ্ক্ষিত 'great imagination and great goodness of heart'-এর কথা আবার নতুন করে বিচার করব দ্বিতীয় খণ্ডে।

প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পসাহিত্যের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতোই বহু কবি ও শিল্পী যুগপৎ শিল্পসাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দান্তে, গ্যয়টে, পোপ-ড্রাইডেন, বেন জনসন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, আর্নল্ড, হার্ডিন, টলস্টয়, এলিয়ট, পাউণ্ড এবং আমাদের দেশের প্রাচীন সমালোচক 'যাযাবরীয়' রাজশেখর এঁরা কেউ মূলত কবিশিল্পী-রসস্রষ্টা এবং গৌণতঃ সমালোচক। কেউ বা এর বিপরীত। মনে হয়, শিল্প ও রসস্রষ্টারা নিজ নিজ সৃষ্টিকর্মের বিচার করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সমালোচক হয়ে যেতেন। কারণ শিল্পসৃষ্টিকালে দৈবী 'frenzy'-র (প্লেটোর ভাষায়) প্রভাবে দ্বিতীয় প্রজাপতি হতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই আবেশ চলে গেলে তারা শিল্পকর্মের অন্তঃপ্রেরণার দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাইতেন। তাই দেখা যাচ্ছে, বহু কবিশিল্পী এ-দেশে উৎকৃষ্ট সমালোচক বলেও স্বীকৃত হয়েছেন। আমাদের রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল অবদান হল একপ্রকার অনন্যসাধারণ আবেগের অত্যাতিসূক্ষ্ম চর্যা, তবু বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে এক ধরনের শিল্পজিজ্ঞাসা ধূমায়িত হয়েছিল। বালক নাচিকেতা যম-পুরীতে গিয়ে মৃত্যুকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দুরূহ প্রশ্ন করেছিলেন ('কঠোপনিষদ')। তিনি ছিলেন নিতান্তই ছোট্টর বালক 'কুমারং সন্তম্‌'। তবু তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়াতে তিনি জন্মযবনিকার পরপারবর্তী রহস্যলোক সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন। এই বালকের মনে যেন যুগ-যুগান্তরের মানবপ্রশ্ন দানা বেঁধেছিল —"অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে"।[১৫] কেউ বলেন, তিনি আছেন, কেউ বলেন তিনি নেই। এর জবাব কি? 'নাচিকেত' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই এমনি কতকগুলি প্রশ্নের উদয়

১৫ কঠোপনিষদ্‌, ১।১।৩ (উদ্বোধন প্রকাশিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ১ম পৃ ৬৫)

হয়েছিল। তবে তা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়, তারই সোদরপ্রতিম সাহিত্য-জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বালকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রসবিচারের বিস্ময়কর দক্ষতা দেখেই বোধ হয় তাঁকে precocious child অর্থাৎ নচিকেতাধর্মী বলেছেন।[১৬]

ইতিপূর্বে আমরা যে-সমস্ত কবি-সমালোচকের কথা বলেছি, তাঁরা অতি অল্পবয়সে কবিতা লিখতে পারলেও পৌগণ্ডাবস্থায় শিল্পবিচারে প্রবৃত্ত হন নি। কারণ তা সম্ভব নয়। আবেগের বয়স নেই, শিল্পসৃষ্টি অবাচীন বয়সেও পূর্ণতা লাভ করতে পারে। বরং তরুণ বয়সের সৃষ্টিকর্মে আবেগ অধিকতর সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু সাহিত্যবিচারের জন্য মননের পরিপক্বতা, অভিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা প্রয়োজন। মিল সাহেব আট বছর বয়সেই নাকি লাতিন-গ্রীকবিদ্যা মগজজাত করেছিলেন।[১৭] আট বছর বয়সেই ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া কেটেছিলেন, সাত-আট বছরে রবীন্দ্রনাথ তার ভাগিনেয়ের কাছ থেকে পয়ারের কৌশল শিখে নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। বালক চ্যাটারটন (১৭৫২-৭০) বারো বছর বয়সে পুরাতন কবিতার নকলে *Elinoura and Juga* লিখে তাঁর শিক্ষককে বোকা বানিয়েছিলেন এবং পনের বছর বয়সে রাউলি নামে এক অস্তিত্বহীন পুরাতন কবির রচনা বলে নিজের রচনা বেমালুম চালিয়ে দিয়েছিলেন।

১৬. "রবীন্দ্রনাথের বয়স অনুপাতে তাহার কল্পনা ও বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, ইংরেজিতে যাহাকে বলে precocious child তিনি ছিলেন তাই।"—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩ (১৩৫৩ বৈশাখ)

১৭. তিন বছর বয়সে মিল সাহেবের পিতা তাঁকে গ্রীক শেখাতে আরম্ভ করেন, আট বছর বয়সে তাকে লাতিন শেখানো হয়। শৈশবেই তিনি গ্রীক-লাতিন সাহিত্যের বহু বই পড়ে ফেলেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ভালো করে ফরাসী ভাষা শেখেন, ষোল বছরে রোম্যান ল আয়ত্ত করেন। এই বয়সেই তিনি সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে ইউটিলিটারিয়ান সোসাইটি গড়ে তোলেন। তিনিও যে precocious child-এর একটি নিরেট দৃষ্টান্ত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

হোরেস ওয়ালপোলের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও এই কিশোরের বিশুদ্ধ ধাপ্পাবাজি অনেক দিন ধরতে পারেন নি। সুতরাং অতি অল্প বয়সেই মৌলিক রচনাশক্তি এবং চাতুর্যবুদ্ধিরও রীতিমতো পরিপক্বতা ঘটতে পারে। কিন্তু সমালোচনা ও সাহিত্যবিচারের জন্য যে ধরনের যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োজন, তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা এবং বয়োবৃদ্ধিও দরকার। কারণ সমালোচকের যে-রকম 'The Indian virtue of detachment' (M. Arnold) আয়ত্ত হওয়া দরকার, সেই নিষ্কামতা ও নিস্পৃহতা অল্প বয়সে অর্জিত হওয়া দুরূহ। তবে প্রতিভার বিকাশ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের মতো মৌলিক ও অভিনব প্রতিভা সম্বন্ধে তো বাঁধাপথে কোন ইঙ্গিতই দেওয়া যায় না।

২

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের সাহিত্য-বিচার-সংক্রান্ত রচনাগুলি সর্বদা যে একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ বিচারবোধসমন্বিত মূল্যনির্ধারণে পরিণত হয়েছে তা অবশ্য নয়। কিন্তু এগুলির পশ্চাতে যে-ধরনের সদাজাগ্রত বুদ্ধি ও বিবেচনা কার্যকরী হয়েছে তার মূল্য অসাধারণ। বস্তুতঃ নিতান্ত বাল্যবয়সেই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সৌন্দর্যসৃষ্টির আবেগ ও বিচার-বিশ্লেষণবুদ্ধি সমানভাবে জাগ্রত হয়েছিল। বাল্য-কৈশোরের হৃদয়-অরণ্যে যখন তিনি দিশাহারা স্বপ্নসঞ্চরণ করছেন, তখনও সাহিত্যভোগের জন্য বিচারবুদ্ধির মাপকাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এবং শুধু তিনিই নন—উনবিংশ শতাব্দীতে আরও নানা প্রকার সাহিত্যকর্মের মতো শিল্পবিচার-প্রণালীর প্রতিও ঐ যুগের লেখকেরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার পূর্বে, মধ্যযুগ আলোচনা করলে দেখা যাবে, সে-যুগের বাংলা সাহিত্য দেবকৃপানির্ভর বাতায়নে বসে দেব-দেবীর বন্দনা গাইতেই অভ্যস্ত ছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রচনাবস্তুর মূলে দেবপ্রাধান্য ছিল বলে মৌলিক প্রতিভা ও

মৌলিক সৃষ্টি অতি-আবশ্যক সাহিত্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হত না। কবিরা যেখানে দেবদেবীর প্রত্যাদেশ পেয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, এবং শ্রোতারা যেখানে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে সেই গ্রন্থ শুনে পুণ্য সঞ্চয়ে ব্রতী হয়, সেখানে সৃষ্টিকর্মের ভালোমন্দ মুখ্য ব্যাপার নয়, এবং নয় বলে সৃষ্টিসমীক্ষা লেখক-পাঠক কারও প্রয়োজন ছিল না। হয়তো বিজয়গুপ্তের মতো কোন কবি পূর্বসূরীর কিছু দোষত্রুটি দেখিয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্য লেখার জন্য ইষ্টদেবীর দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছিলেন।[১৮] সেখানে তিনি কাব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে অস্পষ্ট রকম সচেতন ছিলেন এবং ছন্দের বৈলক্ষণ্য ও শব্দপ্রয়োগ-ভ্রান্তিকেই কাব্যদোষের প্রধান ত্রুটি বলে গণ্য করেছিলেন। কাব্যবিচারের আর কোন উপযুক্ততর মানদণ্ড তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নি। অবশ্য চণ্ডীমঙ্গলে বালক শ্রীমন্ত ও ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের বাল্যশিক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়নের নির্দেশ রয়েছে। শ্রীমন্তের পাঠ্যতালিকার মধ্যে রয়েছে মম্মট ভট্টের 'কাব্যপ্রকাশ', বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ,' বামনের

১৮ বিজয়গুপ্ত তাঁর আগের কালের কানা হরিদত্তের অসার্থক [illegible] মনসামঙ্গলের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন। দেবী মনসা হরিদত্তের কাব্যে সন্তুষ্ট না হয়ে বিজয়গুপ্তকে কাব্য লিখতে আদেশ দেবার পর তিনি বলছেন:

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
জোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাই মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি নাহিক মিছে লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

বাক্যের সঙ্গতিহীনতা, শ্রুতিপারুষ্য, মিত্রাক্ষরের অভাব, গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার—হরিদত্তের এই ত্রুটিগুলিকে বিজয়গুপ্ত কাব্যের প্রধান দোষ বলে ধরেছিলেন।

'কাব্যালঙ্কারবৃত্তি' এবং দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'। তৎকালীন সমাজে স্মৃতি-ন্যায়ের সঙ্গে কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কার চর্চাও জনপ্রিয় হয়েছিল. টোলচতুষ্পাঠীতে রীতিমতো অলঙ্কার পড়ানো হত। চৈতন্যদেব ব্যাকরণের অধ্যাপক হলেও অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁর খুব সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গঙ্গামহিমাবিষয়ক শ্লোকে তিনি অতি নিপুণভাবে অলঙ্কারের দোষ দেখিয়েছিলেন এবং মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ ও ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন।[১৯] পরবর্তীকালে তাঁর ভক্ত-শিষ্যেরা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসতত্ত্বকে ভক্তিবাদের সাহায্যে পরিশুদ্ধ করে নূতন রসতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তুভ', রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি,' 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'নাটকচন্দ্রিকা', জীবগোস্বামীর 'রসামৃতশেষ,' বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'আনন্দচন্দ্রিকা', কবিচন্দ্রের 'কাব্যচন্দ্রিকা', বলদেব বিদ্যাভূষণের 'কাব্যকৌস্তুভ' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পক্ষ থেকেই রচিত হয়েছিল। এঁরা সকলেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আদিরসকে ভক্তিরসে উন্নীত করবার জন্য আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণব শিষ্টসমাজে সংস্কৃত রসসাহিত্য-বিচারপদ্ধতি সুপ্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে সহজ বাংলায় সেই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। তিনিও অলঙ্কারাদি রসশাস্ত্রে অতি প্রবীণ ছিলেন এবং রূপগোস্বামী প্রভৃতি আচার্যদের সংস্কৃতে-লেখা রসতত্ত্ববিষয়ক কথাকে যথাসম্ভব সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত থেকেই দেখা যাচ্ছে, কবিরাজ গোস্বামীর রসবিচারপদ্ধতি অতি পরিচ্ছন্ন। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে সে যুগে বাংলা ভাষায় কোন আলোচনাই গড়ে ওঠে নি। কেবল বৈষ্ণবভক্ত ও পদকারগণ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনদের বন্দনা করবার সময় তাঁদের অপূর্ব পদসাহিত্যের দু'চারটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করতেন।

১৯. চৈতন্যভাগবত (আদি, ১১শ) এবং চৈতন্যচরিতামৃত (আদি, ১৬শ)

মধ্যযুগের অন্তিমপর্বের যুগনায়ক ভারতচন্দ্রের মধ্যে বোধ হয় সাহিত্য-বিচারবোধ-সংক্রান্ত সহজ, তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী মনোভাব বর্তমান ছিল। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্থানী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় সু-অভিজ্ঞ রায়গুণাকর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং 'রসমঞ্জরী' ধরনের পুস্তিকা লিখে অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকা প্রকরণের বর্ণনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্র যে অনেকাংশে নাগরিক মনোভাবের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর কাব্যরচনা-সংক্রান্ত মতামত থেকেই স্পষ্ট হবে। মার্জিত, তীক্ষ্ণ, মননসমৃদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, কিছুটা বাক্য ও মনের sophistication, নাগরিক ও রাজসভাজীবী মনোভাবের যেগুলি প্রধান লক্ষণ, সেই ভাবাবেগবর্জিত বুদ্ধির দীপ্তি,—যৌক্তিকতা যার অস্ত্র, ভারতচন্দ্র ছিলেন তারই অমিত অধিকারী। বাংলা ভাষায় তাঁর পূর্বে কেউ সাহিত্য ও কাব্যের মূল উদ্দেশ্য ও প্রবণতা সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য করেন নি :

> প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
> যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

কথাটি রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'র-ই প্রতিধ্বনি—"ভাসা জা হোড় সা হোড়।" রায়গুণাকর ঔদার্যবশতঃ 'যাবনীমিশাল' শব্দ ব্যবহারেও সঙ্কুচিত হন নি। এখানে দেখা যাচ্ছে 'কাব্য রস লয়ে'— এ ধরনের স্পষ্ট কোন মন্তব্য ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের বড় কোথাও পাওয়া যায় না।

এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের কাব্যালোচনা দিয়ে বাংলা সমালোচনা-পর্বের শুরু হল। আনুমানিক ১২৩০ বঙ্গাব্দে রাধামোহন সেন ভারতচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন এবং ভারতের রচনার যে-যে অংশ তাঁর মনোমতো হয় নি, সেই অংশগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন। তিনি প্রাচীন ধারার লেখক বলে তাঁর সমালোচনাটিও পয়ারে রচিত। অবশ্য ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের ত্রুটিগুলিকে তিনি কবির ভুল বলে মনে করেন নি। তাঁর

ধারণা, শব্দগত যে-সব ত্রুটি 'অন্নদামঙ্গলে' লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি সার্থক-কবি রায়গুণাকরের রচনা নয়, খুব সম্ভব এগুলি অল্পশিক্ষিত লিপিকারগণের ভুল। ভারতচন্দ্রের একস্থানের ত্রুটি নির্দেশ করে রাধামোহন বলেছেন :

অতএব কবিতার ভাবে বিবেচনা।
কভু নহে ভারতের এমত রচনা॥

আর একস্থানে ত্রুটিপূর্ণ রচনার অগৌরব থেকে ভারতচন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে তিনি পুঁথি-নকলকারীদের দোষ দিয়েছেন :

কবির সে ত্রুটি নহে লিখকের দোষ।
বিপরীতভাবে কেহ না করিহ রোষ॥

ভারতচন্দ্রের কোন কোন ছত্র বাতিল করে রাধামোহন নিজেও কিয়দংশ রচনা করে দিয়েছেন। তাঁর কবিত্ব রচনার শক্তিও বেশ ছিল। রাধামোহন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সমালোচক তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য তিনি মনের দিক থেকে মধ্যযুগের ব্যক্তি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কাব্যরচনাগত যে দোষত্রুটি আছে সেগুলিকে নকলনবিশদের অজ্ঞতাপ্রসূত, ভারতচন্দ্রের মতো সিদ্ধ কবি সে-রকম ভুল করতে পারেন না, এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাব্যত্ব কোথায় সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি, শুধু দু'চারটি দোষ দেখিয়ে এবং দোষ সংশোধনের পর খানিকটা নিজে রচনা করে ক্ষান্ত হয়েছেন। প্রাচীন মানসিকতার ব্যক্তি হলেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি তবু কাব্যের দোষগুণ নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলেন। এজন্য তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৩

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতচন্দ্রের বিতর্কিত কবিসত্তা নিয়ে সর্বপ্রথম সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত হয়। ভারতচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করে (১৮৫৬) কবি ঈশ্বর গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ

কবির কাব্যালোচনার সুযোগ করে দেন। অবশ্য তারও কিছু পূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধে' প্রাচীন বাংলা কাব্যকে ইংরেজী-ওয়ালাদেব আক্রমণ থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সেকালের কবিদের গুণ ব্যাখ্যা করেন। ড্রিংক্ ওয়াটার বীঠন সাহেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বেথুন সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৮৫১)। তাব এক অধিবেশনে রামবাগানের দত্তবংশের হরচন্দ্র দত্ত 'Bengali Poetry' নামে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী কাব্যের তুলনায় অশ্লীল রচনা ও কৃত্রিম লেখার অপরাধে ভারতচন্দ্রাদি পুরাতন বাঙালী কবিদেব তীব্র আক্রমণ করেন (১৮৫২, ১ এপ্রিল)। কৈলাসচন্দ্র বসুও হরচন্দ্রের কথাব প্রতিধ্বনি করে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত নিন্দা করেন। এই ব্যাপারে রঙ্গলাল ক্ষুণ্ণ হয়ে উক্ত সমিতির আর এক অধিবেশনে (১৮৫২, ১৩ মে) 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করে অশ্লীলতাদোষের অভিযোগ থেকে প্রাচীন বাঙালী কবিদের মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন। এই প্রবন্ধটি পরে (১২৫৯, ১ জ্যৈষ্ঠ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনি কাব্যসমালোচনা ও বিচারপ্রসঙ্গে যে দুটি মৌলিক কথার অবতারণা করেন এখানে সে দুটি উদ্ধৃত হচ্ছে:

> ১. "অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা কাব্যশাস্ত্র বিশেষ চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে ইহার নাম কাব্য।"
>
> ২. "মনুষ্য বড় বিদ্বান হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে সেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন জন্সন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন।"[২০]

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বাংলা কবিতাকে ইংরেজী-নবিশদেব আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে কাব্যবিচার প্রসঙ্গে চিত্তবিনোদনকে

---

২০ উদ্ধৃতিগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধে'র নতুন সংস্করণ থেকে গৃহীত।

তিনি কবিতার প্রধান লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন—অন্ততঃ সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রানুসারে তাঁর তাই-ই মনে হয়েছিল। বিদ্যা ও কবিত্বের পারস্পরিক কোন যোগ নেই। কবিত্বশক্তি বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি সগর্বে স্বীকার করেছেন। এর পর ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় তিনি কাব্য ও কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যে সাহিত্যবিচার-ঘটিত এই কথাগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. "ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্ত্বাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।"

২. "এক্ষণে কাব্য কি?—এবং তদালোচনার ফল কি? সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে ইহার (অর্থাৎ কবিতার) যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যথা—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।" এই স্বল্পবাক্যে কবিতা কলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহদ্ গহ্বরিশেষের মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে।"

৩. "জগদীশ্বর কিরূপ নিয়মে ইহজগৎকে সৌন্দর্যরসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবি-দিগের গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্বক অনুভব করুন।"২১

বাংলা কবিতার 'Defence' লেখার কয়েক বৎসর পরে রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) রচনা করেন, তখন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার চিন্তা-প্রণালী অনেকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে—তা এই কাব্যের ভূমিকা থেকেই বোঝা যাবে। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, ইংরেজী আদর্শে যত বিশুদ্ধরুচির কাব্য রচিত হবে, ততই আদিরসের ভক্ত পুরাতনপন্থী পাঠকের সংখ্যা কমে আসবে। আদিরসের বাড়াবাড়ি ও স্থূলতা যে তার মতো মার্জিতরুচির ইংরেজী কাব্যরসিককে পুরাতন বাংলা কবিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি 'সাহিত্যদর্পণ'কারের "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"

২১. বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকা থেকে গৃহীত হয়েছে।

উক্তি উল্লেখ করে, রসই কাব্যের শেষ নিদান, এই মত অবলম্বন করেছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, ভগবান বিশ্বকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন, সেই সৌন্দর্য সার্থকনামা ইংরেজী ও সংস্কৃত কাব্যে ফুটে উঠেছে। এখানে একটু অবহিত হয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যবিচারের মোটামুটি একটা মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়েছিল।

রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' ইতিহাস, বীররস ও করুণরসকে মিশিয়ে মার্জিত রুচির কাব্য রচনা করে স্থূল আদিরসের ভক্ত বাঙালী পাঠকের রুচির শুচিতা আনতে প্রয়াস করেছিলেন। এই কাব্যরুচিকে তিনি দু'দিক থেকে বিচার করেছেন। একটি হল রসবাদ, আর একটি সৌন্দর্যতত্ত্ব। রসবাদ হল ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের প্রকৃতত্ত্ব। রস অর্থাৎ শিল্পজাত পরমানন্দ শিল্পভোগের চূড়ান্ত ফল। আর একদিকে পাশ্চাত্য মতে, সৌন্দর্যসৃষ্টি আর্টের বড় লক্ষণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বে সুপরিজ্ঞাত রঙ্গলাল ভারতীয় ও য়ুরোপীয় কলাবিদ্যা-বিশ্লেষণের দুটি পদ্ধতিই এখানে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দুই বিষয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তার অবকাশ পান নি। উপরন্তু তিনি মূলতঃ ছিলেন কবি— রসস্রষ্টা। রসবিচার তাঁর প্রতিভার গৌণ লক্ষণ। তাঁর প্রথম মতে তিনি 'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালী'তে কাব্য রচনার জন্য বাঙালী কবিকে আহ্বান করেছেন। কারণ তা হলে আদিরসের অবিবেক-জ্ঞান ও ব্যভিচারবাদ সাহিত্য থেকে লোপ পাবে। কুরুচির বিনাশ ও সুরুচির প্রতিষ্ঠা এ মত তিনি 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় প্রথমেই ব্যক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে সাহিত্য-বিচারের নীতিমার্গীয় পদ্ধতি। চিত্তশুদ্ধির জন্য নীতিপ্রচার সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য, নীতিবাদী প্র্যাগম্যাটিক শিল্পবিচারকেরা প্লেটোর যুগ থেকে আজও পর্যন্ত সেই বাঁধাপথেই চলেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার বিশেষ কোন সূত্র নির্ধারিত হয় নি, তখন রঙ্গলাল কাব্যভোগজনিত স্বাভাবিক রসবোধের দ্বারা

অনুপ্রাণিত হয়ে এইভাবে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড নির্ধারিত করেছিলেন :

১. রস অর্থাৎ আনন্দই কাব্যের একমাত্র পরিণাম ;

২. সৌন্দর্য-সৃষ্টি কাব্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ;

৩. সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সুরুচি-সুনীতি প্রচার অর্থাৎ নীতিপ্রচারও সাহিত্যের একটা বড় কর্তব্য।

পরবর্তী কালেও দেখা যাচ্ছে এই ত্রিধারায় বাংলা সাহিত্যের বিচার-পদ্ধতি অগ্রসর হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যাঁরা নানা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ('সংবাদ প্রভাকর,' 'তত্ত্ববোধিনী,' 'সোমপ্রকাশ,' 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্যসন্দর্ভ' ইত্যাদি) নতুন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য-বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে অস্পষ্ট রকমের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর হলেও গুপ্তকবির যেমন একটি সহজাত রসবোধ ছিল, তেমনি ছিল তাঁর সাহিত্য বিচারের অশিক্ষিত-পটুত্ব। তাঁর সম্পাদিত সাময়িক পত্রাদিতে তরুণ লেখকদের আত্ম-প্রকাশের পথ খুলে দিয়ে, তাদের অক্ষম রচনাকে প্রকাশ করে তিনি একদা নবজাত বাংলা সাহিত্যের ধাত্রীর কাজই করেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি শুধু নিয়মিত নতুন পুস্তকের সমালোচনা-মূলক বিজ্ঞাপনই প্রকাশ করতেন না, তাঁর পূর্ববর্তী কবি (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ) ও পাঁচালীকার-কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনাসংকলন প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।[২২] ভারতচন্দ্রের জীবনী ও কবিপ্রতিভা আলোচনাপ্রসঙ্গে গুপ্তকবি সোচ্ছ্বাসে বলেছেন :

২২. মাসপয়লা অর্থাৎ মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত নিম্নলিখিত কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন :

১. "আহা! আহা! কি সুমধুর! কি আশ্চর্য! কি চমৎকার কৌশল, কি সুললিত সুধাময় শব্দে এই পত্র এবং নাগাষ্টক বিরচিত হইয়াছে।"

২. "ইঁহারা (অর্থাৎ ভারতচন্দ্রাদি কবিরা) কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন। শব্দের কি লালিত্য! কি মধুরত্ব। ভাবের কি মাধুর্য সৌন্দর্য। রসের কি তাৎপর্য ·।"২৩

এখানে লক্ষ্য করা যাবে, ঈশ্বর গুপ্ত পারিভাষিক অর্থে সমালোচনায় বা রসবিশ্লেষণে অগ্রসর না হয়েও উচ্ছ্বাসেব বশে যে-সব উক্তি করেছেন, তার মধ্যে সাহিত্যবিচারের অনেক মৌলিক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৫৩-৫৫ সালের মধ্যে গুপ্তকবির প্রাচীন কবি-সংক্রান্ত নিবন্ধগুলি মাসপয়লা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদই ভালো করে গড়ে ওঠে নি, সাহিত্য-বিচারপদ্ধতি তো দূরস্থান। কিন্তু তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, সহজাত বসবোধ ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির ফলেই সাহিত্য-সমালোচনা ও রসবিচারে বাঁধাবাঁধিভাবে অগ্রসর না হয়েও তিনি সাহিত্যবিচাবঘটিত কতকগুলি মৌলিক অভিমত প্রকাশ করেছেন, যেগুলিকে সাহিত্যবিচাব ও বসসমীক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরা যেতে পাবে। প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে গুপ্তকবি প্রথমে উচ্ছ্বসিতভাবে

১. বামপ্রসাদ সেন (১২৬০ সনেব আশ্বিন, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা)
২. রামনিধি গুপ্ত (১২৬১, শ্রাবণ)
৩. বাম বসু (১২৬১, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ)
৪. নিতে বৈবাগী (১২৬১, অগ্রহায়ণ)
৫. হরুঠাকুব (১২৬১, পৌষ)
৬ রাসু-নৃসিংহ ইত্যাদি (১২৬১, মাঘ)

ঈশ্বব গুপ্ত প্রণীত 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' ইংরেজী ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২৩. ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'কবিচরিত' থেকে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে

ভারতচন্দ্রের শব্দসংযোজনা অর্থাৎ কাব্যের বহিরঙ্গের প্রশংসা করেছেন। 'চমৎকার কৌশল', 'সুললিত সুধাময় শব্দ'—অর্থাৎ কবিতার বাইরের অঙ্গ এবং কৌশল অর্থাৎ artifice-এর ভক্ত ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে সেই রসই নিষ্কাশিত করেছেন। দ্বিতীয় মন্তব্যে শব্দের 'লালিত্য,' 'মধুরত্ব' সম্পর্কে কাব্যের আরেকটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যাতে তাঁর বুদ্ধিবিবেচনার বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। "ভাবের মাধুর্য ও সৌন্দর্য এবং রসের তাৎপর্য" বলতে তিনি বোধ হয় সৎ ভাব, সেই সৎ ভাবকে সৌন্দর্য দেওয়া এবং সেই সৌন্দর্য-পূর্ণ সৎ ভাবের পরিণাম বা তাৎপর্যই যে রসোৎপত্তি, ইঙ্গিতে তিনি এই ধরনের কথাই বলেছেন—অবশ্য খুব কিছু চিন্তা করে এ কথা বলেন নি। কিন্তু এই ইঙ্গিত থেকেই সাহিত্যবিচারের প্রাথমিক সোপান-পরম্পরার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত, দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রথমে তিনি বলেছেন যে, ভারতচন্দ্রাদির মতো সৎ কবিরা স্বভাবকে স্বভাবে রেখে নিজ নিজ মনোভাব উদ্দীপন করে থাকেন। বোধ হয় গুপ্তকবি মনে করেছিলেন যে, কাব্যরচনা ও কবিপ্রতিভার এই হল মূল রহস্য। অর্থাৎ শুধু বস্তুরূপ কাব্যের উপাদান নয়। কবিরা নিজ নিজ মনঃপ্রকৃতি ও হৃদয়াবেগ অনুসারে বস্তুরূপকে শিল্পরূপ দান করলেও উপাদানকে অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত করেন না। অবশ্য অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাব কীভাবে রসোৎপত্তির কারণ হয়, সে কথা তিনি নিজস্ব স্বাভাবিক কবিপ্রবণতার দ্বারা অনুচিন্তন করলেই বুঝতে পারতেন যে, স্বভাবকে স্বভাবে রাখা অর্থাৎ কাব্যের বস্তু-উপাদানকে অবিকৃত রেখে কবিদের মনোভাব বা ভাবাবেগ উদ্দীপন সম্ভব নয়। কবি-প্রত্যয়ী-ভূত সাত্ত্বিক চিদ্বৃত্তি ও বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য হৃদ্বৃত্তির সংস্পর্শে এসে বস্তু-উপাদান শিল্পের রসে অর্থাৎ aesthetic pleasure-এ পর্যবসিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তার নির্দেশটি যথাযথভাবে ধরতে পারেন নি। কারণ প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসতত্ত্বের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। সে যাই হোক, প্রত্যক্ষ জীবনরসের মর্ত্যচারী ছড়াকার, শিক্ষায়-দীক্ষায়

অনগ্রসর ঈশ্বর গুপ্ত স্বাভাবিক বিচক্ষণতার গুণে সাহিত্যবিচারের মূল কথাগুলি আভাসে বলতে পেরেছেন, তা স্বীকার করতে হবে।

মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্যের নবযুগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ও পুরাতন সংস্কারের মোহবন্ধন থেকে মুক্ত করে বাঙালী পাঠককে নতুন জীবনহর্ম্যের তোরণদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করতে মধুসূদনের সমধর্মী আর কোন সারস্বত প্রতিভার নাম মনে পড়ছে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'সাতসমুদ্রের নাবিক' দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদন পাশ্চাত্য ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যবিচারপদ্ধতি খুব ভালো করেই আয়ত্ত করে ছিলেন. তা তাঁর চিঠিপত্রাদি থেকেই বোঝা যাবে। মধুসূদন রসস্রষ্টা ও সৌন্দর্যের বাণীরূপনির্মাতা। কিন্তু তাঁর সাহিত্যবিচারঘটিত সূক্ষ্মদর্শিতা যে কতটা ক্রিয়াশীল হয়েছিল তা তাঁর ইংরেজী চিঠিপত্র থেকে অনুমান করা যাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সমালোচকের পদ গ্রহণ করেননি, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পত্রালাপের সময় নিজের রচনা, সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখা, বিদেশের সাহিত্য এবং সাধারণভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এমন সমস্ত মতামত প্রকাশ করেছেন যে, সে লেখাগুলি বাংলা ভাষায় রচিত হলে তাকে প্রথম সার্থক বাংলা সমালোচকের গৌরবময় আসন দেওয়া যেতে পারত। য়ুরোপীয় সাহিত্যের রসিক পাঠক এবং পাশ্চাত্য সমালোচনায় বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল[২৪] মধুসূদন প্রসঙ্গক্রমে চিঠিপত্রে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তা থেকেই তাঁর সাহিত্যবিশ্লেষণের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি লিখেছিলেন "You know that man's style is the reflection of his mind".[২৫] এ মন্তব্য বিদেশী

২৪ ফরাসী সমালোচকদের খুঁতখুঁতে বিচারবুদ্ধিকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, তিনি এত সতর্কতার সঙ্গে এ কাব্য রচনা করেছেন যে, "Even a French critic would not find fault with me" (মধুসূদনের ইংরেজী পত্রের উদ্ধৃতিগুলি ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' থেকে নেওয়া হয়েছে।)

২৫. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১২৩

সমালোচকদের মতের প্রতিধ্বনি হলেও, এ বিষয়ে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন যে, রচনারীতি রচনাকারেরই মানসসত্তার প্রতিফলন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানা চিঠিতে নিজের কাব্যরচনাশক্তির মূলরহস্য সম্বন্ধে বলেছেন, "The words come unsought, floating in the stream of (I supposed I must call it) inspiration !"[২৬] Inspiration ও অনুপ্রেরণার দৈব কৃপা ব্যতিরেকে শব্দবাজি কি এভাবে ভিড় করতে পারে? এই inspiration-এর ওপর জীবনদেবতাতত্ত্ব আরোপ করেই রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকে এত গাল খেয়েছিলেন।[২৭]

মধুসূদন নিজ প্রতিভার সীমা সম্বন্ধেও খুব অবহিত ছিলেন। কখনও তিনি বলেছেন, "I have a tendency in the lyrical way."[২৮] কোন কোন সময়ে তিনি দেশী-বিদেশী কবি সম্বন্ধে অতি চমৎকার মন্তব্য করেছেন, যা থেকে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। রঙ্গলাল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য: "My opinion of him is—that he has poectical feelings—some fancy, perhaps imagination, but his style is affected and consequently execrable."[২৯] রঙ্গলালের সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলী আলোচনা না করলে এর চেয়ে উদারতর মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ থাকবে কি?[৩০] যে-মিলটনের কাব্যকে মধুসূদন 'divine'

২৬. ঐ, পৃ. ১২৮-১২৯

২৭. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখকে' রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিজীবন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তারই বিরুদ্ধে আক্রমণের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি পরে রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়ে' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২৮. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'কবি-মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী,' পৃ. ১৫১

২৯. ঐ, পৃ. ১৩০-১৩১

৩০. "He (রঙ্গলাল) reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest school of poetry except, perhaps Byron now and then. I like Wordsworth better." ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৩৭

বলেছেন[৩১] সেই মিল্টনের প্রতিভা সম্বন্ধে আর এক পত্রে এ মন্তব্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি, "He has glorious name but few readers....We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him....He is the deep roar of lion in the silent solitude of the forest."[৩২] এখানে মিল্টন সম্বন্ধে তাঁর মতামত যে-কোন রসগ্রাহী পাশ্চাত্য সমালোচকের অনুরূপ।

নাটক ও কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু কিছু প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন। নিজে নাটক রচনায় অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন যে, 'সাহিত্যদর্পণ'-ধৃত সূত্রানুসারে তিনি নাটক রচনা করবেন না, পাশ্চাত্য নাটকের ধারাই অনুসরণ করবেন।[৩৩] কারণ ভারতের নাট্যসাহিত্য (শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটক সত্ত্বেও) সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অনুকূল ছিল না।[৩৪] কাব্যকবিতার বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন তাতে পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রতিধ্বনি থাকলেও এখানে তার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। শেষ দিকে তিনি 'সুভদ্রা' নামে একখানি নাট্যকাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর বন্ধু প্রসিদ্ধ নট কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নাটকটির প্রথম অঙ্কের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিয়ে কবি

৩১. অবশ্য হেমচন্দ্র 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এর তুলনায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে নিকৃষ্ট মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন, "সেই বৃহৎ কাব্যের (অর্থাৎ প্যারাডাইজ লস্ট) সহিত ইহার ('মেঘনাদবধ কাব্য') তুলনা হওয়া দূরে থাকুক তাহার শত যোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কিনা সন্দেহ।" (মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকের মন্তব্য।)

৩২. ক্ষেত্র গুপ্তের ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৫১

৩৩. "I shall not allow myself to be bound down by dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan." (ক্ষেত্র গুপ্তের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩১)

৩৪. ঐ পৃ. ১৬২

তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং যথার্থ কাব্যবিচারপদ্ধতি কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলেন ঃ

> "1st to the imagery ; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed ; 3rd to the individual flow to each verse. Do not care for the general effect. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is a good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical then my friends need not be troubled on my account."

এই পত্রের শেষাংশে বন্ধুকে লিখেছেন ঃ

> "I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language."

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর নিজের কাব্যগুলিকে কীভাবে বিচার করতে হবে, তার সূত্র তিনি এইভাবে নির্দেশ করেছেন ঃ

১. উপমাদি চিত্রকল্প ;

২. চিত্রকল্প ও ভাবের উপযুক্ত ভাষা ;

৩ প্রত্যেক শ্লোক বা স্তবকের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবের প্রবাহ।

তাঁর মতে এই তিনটি থাকলেই তাঁর কাব্য কাব্যপদবাচ্য হবে। 'General effect' —খুব সম্ভব রসপরিণাম : এ সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত হন নি। তিনি জানতেন কাব্যের বহিরঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাগ্রে কাব্যানুকূল হওয়া প্রয়োজন। তার 'general effect' পরে মহাকাল অর্থাৎ ভবিষ্যতের পাঠকসমাজ বিচার করবে। বন্ধুকে চিঠির শেষ পংক্তিতে বলেছেন যে, তাঁর বক্ষ্যমাণ নাট্যকাব্যে ('সুভদ্রা') যথার্থ 'poetry' আছে কিনা, এবং 'poetical language'-এ সেই 'poetry' প্রকাশিত হয়েছে কিনা—এই দুটো ব্যাপার সর্বাগ্রে দেখতে হবে, এবং

তা যদি হয়, তা হলে সে কাব্য একদিন-না-একদিন—তিরিশ বছর পরেও[৩৫] জনচিত্ত আকর্ষণ করতে পারবে। এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কাব্যরচনার মূল প্রবণতা কী, এবং কাব্যবিচারের মানদণ্ডই বা কী, সে বিষয়ে তিনি যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলেছেন সেগুলি নিতান্তই বাহ্যলক্ষণ। অলঙ্কার, ভাব, ভাষা,—এগুলির একত্র সমাবেশকেই কি কাব্য বলা হবে? এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু বলেন নি। রসপরিণাম বা সৌন্দর্যসৃষ্টি—এর কোন একটাকেই বোধ হয় তিনি 'general effect' বলেছেন। তাঁর ধারণা—কাব্যের বহিরঙ্গগুলি নিয়মমাফিক হলে তার রসরূপটিও আপনি-ই ফুটে উঠবে। অবশ্য তার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। কালে তার দাম সকলে বুঝবে। যিনি কাব্যরসম্ভোগ থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি সম্পূর্ণ বাদ দিতে বলেছিলেন,[৩৬] তৎকালীন পুরাতনপন্থী ও নব্য পাঠকদের বাংলা কাব্যের যথার্থ রসাস্বাদন সম্পর্কে বিচক্ষণ সমালোচক-সুলভ তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন।[৩৭] তিনি শিল্প ও সাহিত্যের মূল প্রেরণা ও

৩৫ "The book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence" (ঐ, পৃ ১৬২)

৩৬. 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধাপ্রেম সম্বন্ধে ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ কিছু উনার্থক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমকে অবিশুদ্ধ মনে করতেন। 'মেঘনাদবধে' "চমকি রামা উঠিল সত্বরে, গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে" -এই উক্তিতে তিনি "অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের" দূষিত গন্ধ পেয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য—'বিবিধ প্রবন্ধ', ১২৮৯, প্রথম খণ্ড)। তার উত্তরে মধুসূদন বন্ধুকে লিখেছিলেন, "I think you are rather cold towards the poor Lady of Braja. Poor man, when you sit down to read poetry leave aside all religious bias." (ক্ষেত্র গুপ্তের গ্রন্থ, পৃ. ১৫৭)

৩৭. "As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read." (ঐ, পৃ. ১৫৯)

ফলশ্রুতি সম্বন্ধে প্রায়ই নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। এর কারণ য়ুরোপের ক্লাসিক ও নব্য-ক্লাসিক সমালোচনা-রীতির দ্বারাই তিনি অধিকাংশ সময়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাজেই কাব্যসাহিত্য ও শিল্পবিচারের জন্য তিনি এমন কোন মানদণ্ডের নির্দেশ দেন নি যার দ্বারা সমগ্র শিল্পসৃষ্টির মূল রহস্য অবধারণ করা যায়।

মধুসূদনের সমসাময়িক ভূদেব ও বিদ্যাসাগর মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাখ্যাবিচারে প্রবৃত্ত হলেও তার মধ্য দিয়ে সাহিত্যবিচারের কেন্দ্রীয় ভাবটি ধরবার চেষ্টা করেছেন। ভূদেব 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগে 'উত্তরচরিত', 'শকুন্তলা' ও 'রত্নাবলী' নাটকের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "উত্তরচরিত গাম্ভীর্যে, শকুন্তলা বৈচিত্র্যে, রত্নাবলী পারিপাট্যে।"[৩৮] উত্তরচরিতের গম্ভীর সুর ও নীতিতত্ত্ব ধর্মভীরু ভূদেবের চিত্তরঞ্জন করেছিল। কালিদাসের কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েও তিনি বোধ হয় নীতি-আদর্শাদি বিচার করে ভবভূতির চেয়ে কিছু নীচুতে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর ধারণা, উত্তরচরিত ভাগীরথীর ধারার মতো পরম পবিত্র, শকুন্তলা যেন যমুনা — ভাগীরথীর চেয়ে যমুনাধারা "অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশ" দিয়ে প্রবাহিত ('বিবিধ প্রবন্ধ', পৃ ৬৯)। এই মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, রসের চেয়ে, সৌন্দর্যের চেয়ে চিত্তশুদ্ধির প্রতি ভূদেব কিছু অধিক আগ্রহী। বালক রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচারক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই ধারাটি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তার পরেও ছিল।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে অত্যন্ত পরিমিত মন্তব্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) এবং তৎসম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য যুক্তিমার্গীয় সমালোচনা অর্থাৎ অনেকটা judicious criticism-এর

৩৮. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ (১৩১৫) পৃ., ৬৭

আদর্শে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অবশ্য ভাষা, ভঙ্গিমা, ভাববস্তু প্রভৃতির আদর্শ ধরেই তিনি আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। নিজে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েও সাহিত্যবিচারে সে পুরাতন রীতি প্রায় কোথাও গ্রহণ করেন নি। অলঙ্কারশাস্ত্রের কাব্যবিচার-প্রণালীকে তিনি বোধ হয় খুব একটা শ্রদ্ধা করতেন না। পুরাতন পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যালোচনার প্রতি তাঁর বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না। 'রঘুবংশে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি পুরাতনপন্থী সংস্কৃতওয়ালাদের প্রতি কটাক্ষ করে লিখছেন:

> "রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যে-অংশ পাঠ করা যায় সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমন সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।" (দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', ২য় খণ্ড, পৃ ১৫)

কালিদাসকে তিনি শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করতেন।[৩৯]

সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত না

৩৯. "বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।" (বি রচনাবলী, ২য়, পৃ. ১৪) 'শকুন্তলা'র বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর কালিদাসকে "ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি" বলে স্বীকার করেছিলেন। কালিদাসকে যে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলতেন, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য —"একদিন কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে তাঁহার (বিদ্যাসাগর) সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন একথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ. ২৯)

হয়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণশক্তির দ্বারাই সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কালিদাসপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, 'স্বভাবোক্তি অলঙ্কার' এবং 'স্বভাবানুযায়িনী বর্ণনা'র জন্য কালিদাসের সমধিক আদর। অতিশয় বাস্তববোধসম্পন্ন বিদ্যাসাগর কাব্যের কল্পকাননে বৃথা কুসুমচয়নে কখনও উৎসুক ছিলেন না। যে অলঙ্কার স্বভাবকে অতিক্রম করে না, যে বর্ণনা স্বভাবকে অনুগমন করে তাকেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে, যখনই কোন কিছুকে যুক্তিবিরোধী ও সঙ্গতিবিরোধী মনে হয়েছে, তখনই তিনি তার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন—ব্যাস-বাল্মীকিকেও সহজে মুক্তি দেন নি। কোন কোন সংস্কৃত কবির রচনা যে স্পষ্টতঃ বিরক্তি ও অসন্তোষ উদ্রেক করে, তাও তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। একস্থলে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের ত্রুটি সম্বন্ধে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন:

> "তাঁহারা (সংস্কৃত কবিরা) মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক-নায়িকার প্রথমদর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতাপুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী, যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।" ('বিদ্যাসাগর রচনাবলী', ২য়, পৃ. ৪৪)

কর্মযোগী বিদ্যাসাগর সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার বিশেষ সুযোগ ও অবকাশ পান নি, কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ বা ভক্তি ছিল না। বরং পাশ্চাত্য-সমালোচনারীতির মতো সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যস্রষ্টার রচনাকৌশল সম্পর্কে মাঝে মাঝে বিচারমূলক তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন। এই স্বল্প আলোচনা থেকে তাঁর যুক্তিবাদী ও বাস্তবানুগামী আধুনিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে স্বকীয়তা ও আধুনিক মনোভাবের যথার্থ সূচনা করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর

সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায়।[৪০] বাংলা সমালোচনা ও বিচারবিতর্কের প্রধান প্রাঙ্গণ হয়েছিল সমকালীন সাময়িক পত্র। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সোমপ্রকাশ', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'বঙ্গদর্শন'—এ সমস্ত পত্রিকা বাংলা সমালোচনার জন্মদান ও লালন করেছিল। এক-একটি বাংলা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক-একটি সাহিত্য-গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। সেই গোষ্ঠীভুক্তরা বিশেষ ধরনের সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, সেই মতাদর্শ প্রচারে সবদা অকুণ্ঠ ছিলেন। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র (১৮৫৪) 'মটো' ছিল স্ত্রীসমাজের সেবা।[৪১] ফলে তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীসমাজের উজ্জীবনের আদর্শ প্রচারেই সাহিত্যকে নিয়োগ করতে চাইতেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হলেও প্রথমদিকে এর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী, বিশেষ সমাজে ও গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ খাতে এর ধারা বহমান ছিল না। 'তত্ত্ববোধিনী'তে যে সমস্ত নতুন গ্রন্থের সংবাদ প্রকাশিত হত তাতে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নীতির পক্ষ থেকেই আলোচনা করা হত। প্যারীচাঁদের 'বামাতোষিণী' আখ্যান সমালোচনা করতে গিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী'র গ্রন্থ-সমালোচক এ গ্রন্থের সাহিত্যগুণের চেয়ে স্ত্রীসমাজের উপকারিতার কথাই বেশী প্রশংসা করেছেন (তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৫ শক, বৈশাখ)। 'সোমপ্রকাশে'ও

৪০. 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র প্রথম ছয় পর্ব (১৭৭৩ শক, কার্তিক—১৭৮০ শক, চৈত্র) রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সপ্তম পর্বের সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'রহস্যসন্দর্ভের'ও প্রথম ছয় পর্ব (১৯১৯ সংবৎ—১৯২৮ সংবৎ) রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা করেন। এর পর প্রাণনাথ দত্ত 'রহস্য-সন্দর্ভে'র পরবর্তী দু'বছর সম্পাদনা করেছিলেন।

৪১. 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপন ছিল—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

প্রকাশিত গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সংবাদ থাকত। কিন্তু 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলালের যে সমস্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশিত হত, তাতেই সাহিত্যবিচার-সংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিমানসের বিচার-বিশ্লেষণের প্রথম আভাস তাঁর ক্ষুদ্র নিবন্ধগুলিতেই প্রথম স্ফুটাকার লাভ করে। গ্রন্থের বস্তু-উপাদান, স্রষ্টার মনঃপ্রকৃতি, শিল্পের রচনাকৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে যথার্থ চিন্তাপূর্ণ আলোচনা, যার রীতিটি পাশ্চাত্য সমালোচনার অনুকরণ, তার প্রথম সোপান নির্মাণ করেন রাজেন্দ্রলাল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিচারপদ্ধতি তাঁর করায়ত্ত ছিল বলে তিনি সহজেই creative criticism বা সৃষ্টিমূলক সমালোচনার ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ ('তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'পদ্মাবতী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতির সমালোচনা) এখনও আমাদের প্রশংসা দাবি করতে পারে। তাঁর সাহিত্যবিচারপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি দুই প্রসঙ্গে সাহিত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু'রকম ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছিলেন :

> ১. "জনসমাজের মঙ্গলসাধনই গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য: কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা, কি ইতিহাসলেখক, কি অঙ্কশাস্ত্রকার—সকলেই সেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আপন আয়াস সাধন করিয়া থাকেন, কেহই অন্যের প্রতীক্ষা করেন না। ইতোমধ্যে কবিদিগের উদ্দেশ্য এই যে, কাব্যামৃত দ্বারা জনসমাজের তৃপ্তিসাধন করেন।" ('বিবিধার্থ সংগ্রহ', চৈত্র, ১৭৮০ শক)
>
> ২. "সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করেন।" (বি সংগ্রহ, অগ্রহায়ণ, ১৭৮১ শকাব্দ)

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজেন্দ্রলাল শুধু সাহিত্যের উপাদান ও কবিমানস নিয়ে আলোচনা করেন নি, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মন্তব্যটি করেছিলেন। এখানে স্পষ্টতঃ বলেছেন যে, জনসাধারণের মঙ্গল

করাই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং পরের পংক্তিতেই বলেছেন যে, কাব্যরসের দ্বারা জনসাধারণের তৃপ্তিদানও সাহিত্যের উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনকালে সাহিত্যকে সমাজগঠনের হাতিয়ার স্বরূপ গণ্য করাই ছিল সাধারণ রীতি। অর্থাৎ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রায়শই মঙ্গলকে সাহিত্যের ফলশ্রুতিরূপে গণ্য করতেন। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ণ অর্থে সমাজকল্যাণ এবং বৃহত্তর অর্থে মঙ্গলবোধই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কিনা তাই নিয়ে অতীতে বহু আলোচনা হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও যে হবে না এমন কোন কথা নেই। সুতরাং প্রহসনের দ্বারা সমাজের ত্রুটি সংশোধন হয়, এই মত স্থাপন করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল সাহিত্যের সাধারণ সূত্র নিদেশ করেছেন এইভাবে—"জনসাধারণের মঙ্গলসাধনই গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।" কিন্তু এই ধরনের নির্জলা নীতি তথা জনকল্যাণ প্রচারই যে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, রাজেন্দ্রলালের মতো সাহিত্যরসিক সমালোচক কি করে মেনে নেবেন? তাই পরের পংক্তিতেই তাঁকে বলতে হল, "কবিদের উদ্দেশ্য এই যে, কাব্যামৃত দ্বারা জনসমাজের তৃপ্তিসাধন করেন।" সংসার-বিষবৃক্ষের দুটি অমৃতফলের একটি যে কাব্যামৃত-রসাস্বাদ তা তিনি মনে মনে নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন। সমাজের 'মঙ্গলসাধন' এবং 'তৃপ্তিসাধন' যে সাহিত্যপাঠের একরূপ ফলশ্রুতি নয়, তা তাঁর চেয়ে আর কে বেশী জানত? দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে তিনি রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলে নির্দেশ করেছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র তখন সংস্কৃত কলেজে পড়ানো হত, টোল-চতুষ্পাঠীতেও এ শাস্ত্র রীতিমতো অধ্যাপনা করা হত। কিন্তু 'সাহিত্য-দর্পণ'কারের তিনটি শব্দপরম্পরাগত কাব্যসংজ্ঞা ('কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্') ভিন্ন সংস্কৃত রসতত্ত্বকে পারিভাষিক অর্থে ও গভীরভাবে বড় কেউ প্রয়োগ করেন নি। রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষার যাবতীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনিও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত পরিভাষার দ্বারা সাহিত্যবিচারের প্রয়োজন বোধ করেন নি। অথচ দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র লালমোহন বিদ্যানিধি ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে

'পরিদর্শক' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় সংস্কৃত অলঙ্কারের সংজ্ঞা ধরে বাংলা কবিতা থেকে নানা অলঙ্কার উদ্ধার করেছিলেন এবং ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তাঁর 'কাব্যনির্ণয়' প্রকাশিত হলে গ্রন্থের গোড়ার দিকে তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদে (রসপরিচ্ছেদ, গুণপরিচ্ছেদ, রীতিপরিচ্ছেদ)[৪২] রস, বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব, স্থায়ীভাব, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের বাংলা দৃষ্টান্ত দিয়ে সংজ্ঞা নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। অবশ্য লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি ভালোভাবে বোঝাতে পারেন নি। তা সে যাই হোক, রাজেন্দ্রলাল-বিদ্যাসাগরাদি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা যখন সাময়িক পত্রে ও নিজ নিজ গ্রন্থে সাহিত্যবিচার-সংক্রান্ত নানা আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তখন তারা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করেন নি, এটি লক্ষ্য করবার মতো।

কবি হেমচন্দ্র ১৮৬২ সালে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (দ্বিতীয় সংস্করণ) ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "কাহাকে ভাল লেখা বলে অগ্রে জানা কর্তব্য।"[৪৩] সেই ভাল লেখার গুণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনিও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। "কাহাকে ভাল লেখা বলে"—সে-যুগে অনেকেই এ

৪২ প্রথম সংস্করণের (শ্রাবণ, ১৩১৮) বিজ্ঞাপনে এই তথ্যগুলি তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। ১২৬৯ সালের পৌষ সংখ্যার 'পরিদর্শকে' সম্পাদক এই গ্রন্থের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। এর পূর্বে জগগোপাল গোস্বামীর এই শ্রেণীর পুস্তিকা 'সাহিত্য মুক্তাবলী' সাময়িক পত্রে প্রশংসিত হয় নি। গোস্বামীর এই পুস্তিকায় কিছু কিছু অলঙ্কারের উল্লেখ ও আলোচনা আছে বটে, কিন্তু পুস্তিকাটি কোনও দিক দিয়েই শিষ্টসমাজে গৃহীত হয় নি।

৪৩. মন্মথনাথ ঘোষের 'হেমচন্দ্র' (১ম ভাগ, পৃ. ১৩৯) দ্রষ্টব্য। হেমচন্দ্র সর্বপ্রথম যে ভূমিকা লেখেন, এখন সেটি প্রচলিত নেই। এখন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কোন কোন সংস্করণ (বসুমতী সংস্করণ দ্রষ্টব্য) যে-ভূমিকাটি দেখা যায় সেটি ১৮৭৪ সালে রচিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, পৃ. ২৬-২৭

প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাই বোধ হয় সবদিক দিয়ে পূর্ণতর।

সাহিত্যবিচারঘটিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'বিবিধ সমালোচন' ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বৎসর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' অবসরসরোজিনী, দুখসঙ্গিনী' প্রকাশিত হয় ঐ বৎসর কার্তিক মাসে (১২৮৩), তখন তাঁর বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নি। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি ১৮৭৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে ১২৮২ সালের বৈশাখের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছিল। 'বিবিধ সমালোচনে'র প্রকাশের পর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সহ প্রকাশিত হয় 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯, এপ্রিল)। পরে উক্ত দুই গ্রন্থের প্রচার রহিত করে, উভয় গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু প্রবন্ধ এবং আরও কিছু নতুন প্রবন্ধ যোগ করে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড -- ১৮৮৭, ২য় খণ্ড – ১৮৯২) প্রচারিত হয়। এই দুই খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'-প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ সমালোচনামূলক প্রবন্ধের অনেকগুলি সংকলিত করেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচার ও পুস্তকপরিচয় ধরনের প্রবন্ধের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য।

১. উত্তরচরিত (বঙ্গদর্শন—১২৭৯, জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন)

২. গীতিকাব্য (বৈশাখ, ১২৮০)

৩. প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০)

৪. বিদ্যাপতি ও জয়দেব (পৌষ, ১২৮০)

৫. শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা (বৈশাখ, ১২৮২)

এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সাধারণভাবে, কখনও বিশেষ কোন গ্রন্থকে অবলম্বন করে, কখনও সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের তুলনামূলক পরিচয় দিয়ে একদিকে যেমন বিচারমূলক ও যুক্তিবাদী

সমালোচনার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তেমনি আবার সাহিত্যের উদ্দেশ্য, আদর্শ, প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক চিন্তার সমাবেশ করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর "ধর্ম এবং সাহিত্য" ('প্রচার ১২৯১ মাঘ), "বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন" (১২৯১ মাঘ) এবং "বাঙ্গালাভাষা" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫) প্রবন্ধেও সাধারণভাবে সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যে ভাষাপ্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু ও ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যবিচার সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-প্রবন্ধ থেকে শুধু তাঁরই অভিমত নয়, কিশোর রবীন্দ্রনাথের সমালোচকের ভূমিকায় আবির্ভূত হবার পূর্বে, সমকালে ও পরবর্তী যুগে বঙ্কিম-নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যবিচার ও সমালোচনার মূল সূত্রটি বোধগম্য হবে। প্রথমতঃ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহিত্য কীভাবে সচেষ্ট হয়, তার উত্তর দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন সময়ে নীতি ও মঙ্গলতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্যপ্রচার, আনন্দদান —সে বিষয়ে তিনি অতিশয় অবহিত ছিলেন। মঙ্গলতত্ত্ব ও সৌন্দর্য-আনন্দতত্ত্ব-- বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম এই দুই রেখাপথে সঞ্চরমাণ। সমালোচনামূলক প্রবন্ধেও তার অন্যথা হয় নি।

তার প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধ 'উত্তরচরিত' শুধু একটি বিশ্লেষণধর্মী ও বিচারবোধসম্পন্ন উৎকৃষ্ট সমালোচনা নয়; এর মধ্যে তিনি কাব্য-সাহিত্যের তাৎপর্য ও পরিণাম সম্বন্ধে অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং তার দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সৃষ্টিক্ষমতা, স্বাভাবিক অনুকরণ এবং সৌন্দর্য সৃজন —শিল্পী ও কবির কাছ থেকে আমরা প্রধানতঃ এইগুলিই চাই।[৪৪] অবশ্য স্বভাবের অবিকল অনুকরণ কখনই শ্রেষ্ঠ শিল্প নয়,

---

৪৪. বিবিধ প্রবন্ধ (১ম), পৃ. ৩৯ (সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ)

শুধু আমোদ বা Pleasure-ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়।[৪৫] চিত্তরঞ্জন কি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে? শুধু চিত্তরঞ্জন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলে বেন্থামের তর্ককে কুতর্ক বলে নিন্দা করলেও মনে মনে তা অস্বীকার করা যায় না। বেন্থামের মতে সাহিত্যরসভোগ ও 'পুশ্‌পিন' খেলার আনন্দে কোন পার্থক্য নেই।[৪৬] তাই হয়তো কেউ কেউ বলবেন শুধু চিত্তরঞ্জন কাব্যসাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়—"অনেকে উত্তর দিবেন—নীতিশিক্ষা।" তাই যদি হয়, তবে "হিতোপদেশ রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে।" এর পর প্রশ্ন করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি স্থায়ী সিদ্ধান্তে এলেন:

> "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।"—বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, পৃ ৪১ (সা. প. সংস্করণ)

এর একটু পরেই তিনি বলেছেন, "কবিরা জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।" কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা কবিরা কিভাবে জনসমাজে শিক্ষাদান করেন?

৪৫ "আমোদ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ ৪২)

৪৬ "বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুস্পিন খেলার একই দর।" (বি প্র ১ম, পৃ ৪০, পাদটীকা,) বেন্থামের উক্তিটি স্মরণীয়—"The game of pushpin is of equal value with the arts and sciences of music and poetry" (Alba Warren—"English Poetic Theory", 1825—1865, P 66-67 Quoted in '*Literary Criticism*' by Wimsatt and Brooks

> "কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন ? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি ? সৌন্দর্য, অতএব সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বি. প্র. ১ম, পৃ. ৪২)

সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে গেলে শুধু প্রকৃতি বা বস্তুজগতের অবিকল অনুকরণ করলে চলে না। "যাহা স্বভাবানুযায়ী, অথবা স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।"

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ সৌন্দর্য-সৃষ্টিকেই কবি-সাহিত্যিকের প্রধান কলাকৃতি বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিত্তশুদ্ধিকে নির্দেশ করেছেন। কারণ তাঁর মতে "কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা।" স্বভাবকে অবলম্বন করে স্বভাবকে অতিক্রম করে যাওয়া এবং শিক্ষা ও নীতিপ্রচার—এই দুই ভাবাদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র দোদুল্যমান। এ যেন শেলীর কবিসম্পর্কে উচ্ছ্বাসোক্তি—"Unacknowledged legislators of the world", এবং আর্নল্ডের 'criticism of life' ও 'high seriousness'-এর প্রতি সমর্থন। সৌন্দর্যসৃষ্টিই যদি কবির প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তা হলে নীতিপ্রচার, চিত্তশুদ্ধিজনন, সমাজমঙ্গল—কোনটি গৌণ উদ্দেশ্য হবে তা নিয়ে সমালোচকের শিরঃপীড়া ঘটার কারণ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সমালোচক, যিনি সাহিত্যকে শুধু আমোদ বা pleasure বলে ভাবতে পারেন নি, যিনি বাংলার মনঃপ্রকৃতি ও চরিত্রকে নতুন করে গড়ে তুলবার ব্রত নিয়েছিলেন, তিনি তো শুধু সৌন্দর্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। কাজেই চিত্তশুদ্ধি গৌণ জেনেও তাকে মুখ্য লক্ষণ অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টির পাশে সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হয়েছে। তাঁর মতে, সুকাব্য থেকে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুবাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্যে সে বিরত হয়। তাঁর এ মত অনেকাংশে যুক্তিবিরোধী। যিনি সৌন্দর্যসৃষ্টিকে সাহিত্যের মুখ্য লক্ষণ বলেছেন, তিনি উল্লিখিত যুক্তিবিরোধী উক্তি করলেন কেন ? নীতি-উপদেশক চোরকে সরাসরি উপদেশ দেয়, ধর্মোপদেশক নরকভীতি

দেখায়, নীতিবেত্তা ন্যায়-অন্যায় দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কবি এমন এক সর্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করেন যে, "তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য কি কিঞ্চিৎ পরিমাণে শর্করামণ্ডিত তিক্তবটিকা নয়? এই দোলায়িত মনোভাব অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টি ও মঙ্গলবোধ—এটি হল উনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য-বিচারপদ্ধতির সাধারণ লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্রও তার বাইরে যেতে পারেন নি। বাতাসের মধ্যে বাস করে বায়ুমণ্ডলের চাপের বাইরে যাওয়া যায় না। একদা তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "সৌন্দর্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্য-রসাস্বাদনসুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই।"[৪৭] সে শক্তি বিধাতা তাঁকে প্রচুর দিয়েছিলেন, কিন্তু রসরসিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই লোকশিক্ষক বঙ্কিমের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন।

একদা কোন পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, উপন্যাসাদি থেকে যে রকম আমোদ পাওয়া যায় ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা থেকে সেরকম আমোদ পাওয়া যায় না কেন।[১৮] বঙ্কিমচন্দ্র এর জবাব দিতে গিয়ে নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করেন এবং প্রবন্ধের শেষাংশে বলেন ঃ

> "সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম।... কিন্তু সাহিত্যে যে-সত্য ও যে-ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশমাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, পৃ. ১৮২)

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারকরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন। সাহিত্য হবে সোপান। সেই সোপান ধরে

৪৭. 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৬১)

৪৮. 'ধর্ম এবং সাহিত্য' (প্রচার, পৌষ ১২৯২, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়)

ধর্মের মঞ্চে আরোহণ করতে হবে—এই মত শিল্পী ও রসসাধক বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, লোকশিক্ষক ও নীতিবেত্তার উপদেশ। সৌন্দর্যসৃষ্টি যে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য, এই মত তিনি পরবর্তী কালে অনেকাংশে পরিত্যাগ করেছিলেন। 'বাঙ্গালাভাষা' সংক্রান্ত প্রবন্ধে ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫) তিনি বলেছিলেন, "যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা।" 'উত্তরচরিত' রচনার চার বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যঘটিত মতবাদ বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই পরোপকারকে সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেছেন। 'জ্ঞানবৃদ্ধি' এবং 'চিত্তোন্নতি' ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এই হল এই যুগের বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। ১২৯০ সালের মাঘ মাসের 'প্রচারে', 'উত্তরচরিত' রচনার বারো বছর পরে, 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে তিনি নতুন লেখকদের সুলেখক হবার জন্য কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন:

> ১ "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"
>
> ২. "সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, পৃ ২০৬)

এখানে দেখা যাচ্ছে "মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন" এবং "সত্য ও ধর্মের" প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অবিচল আস্থা রয়েছে, তবে সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্যের বিকল্প উদ্দেশ্য বলে তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন। 'ধর্মতত্ত্বে'ও বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যকে চিত্তশুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যসৃষ্টিতে নিয়োগ করতে চেয়েছেন।[৪৭] যে সমস্ত লেখক কুকাব্য রচনা করে অপরের

৪৭. 'ধর্মতত্ত্বে'র ২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তিনি বলেছেন, "কাব্যই এবিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে

চিত্তশুদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আত্মা কলুষিত করতে চায় তাদের তিনি "তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত"[৫০] করতে বিধান দিয়েছেন। এই সমস্ত আলোচনায় মধ্যভিক্টোরীয় (Mid-victorian) সাহিত্য-রুচিবোধে লালিত, আর্নল্ড, রাসকিন, এমার্সনের পরিমণ্ডলে বর্ধিত বঙ্কিমচন্দ্রের দণ্ডপাণি মূর্তিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক, সাহিত্যবিচার-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির অনেক স্থলে মাত্রাতিরিক্তপরিমাণে মঙ্গলতত্ত্বের প্রাধান্য ঘটলেও শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যতত্ত্বকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সাহিত্যের মূল লক্ষ্য যে সৌন্দর্যসৃষ্টি, একথা সমকালের য়ুরোপীয় সমালোচকগণও স্বীকার করতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, আর্নল্ড ইত্যাদি কবি ও সমালোচকদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধা করেন নি। 'উত্তরচরিত' সমালোচনাকালে তিনি লিখেছেন :

> "সৃষ্টিকৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এদেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য। এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য

প্রেমিক হয়। ও অন্য কবি, ধর্মের একজন প্রধান সহায়।'—ধর্মতত্ত্ব, পৃ. ১৪৯ (সা প. সংস্করণ।

৫০. বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "অনেকগুলি জটিল ও দুরূহ নৈতিক তত্ত্ব অনির্বচনীয় সৌন্দর্যপরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমাময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা তাহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, কিন্তু সৌন্দর্য নৈতিকতত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।" এই সমালোচনাটি ১৮৭৭ সালে রচিত বলে তখন তিনি 'উত্তরচরিতে'র আলোচনার আবহাওয়ায় বাস করছিলেন। তাই এখানে নৈতিক তত্ত্ব ও সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্যকেই কাব্যের উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছেন।

সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি। আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।"

(বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৪৩-৪৪, সা. প. সংস্করণ)

সহজ কথায় রসোদ্ভাবন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আমাদের চিত্তবৃত্তি

> "অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে 'স্থায়ীভাব' নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে Passion বলিয়াছেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম" (বি. প্রবন্ধ, ১ম, পৃ ৪৪)।

বলাই বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র ধৈর্য ধরে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত স্থায়ীভাবের রসোৎপত্তির ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করেন নি।[৫১]

তিনি এখানে ভাব ও রসসম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা হয়ে গেছে। আলঙ্কারিকেরা আদিরসকে এত প্রাধান্য দিলেও স্নেহ-প্রণয়-দয়াকে স্থায়ী বা ব্যভিচারীর মধ্যে স্থান-নির্দেশ করেন নি বলে তিনি তাদের বিচারপদ্ধতির ত্রুটি ধরেছেন। কিন্তু এর পরেই পারিভাষিক শব্দার্থ বাদ দিয়ে সহজভাবে রসকে বোঝাতে গিয়ে যা বলেছেন, তাতেও তাঁর চিন্তার ত্রুটি ঢাকা পড়ে নি বা বক্তব্যবিষয় বিশেষ সুগম হয় নি। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে বঙ্কিমের দৃষ্টি বিশেষ স্বচ্ছ ছিল না। তাঁর মতে মানুষের সমস্ত ক্রিয়ার পশ্চাতে আছে চিত্তবৃত্তি। সেই চিত্তবৃত্তিগুলিকে তিনি স্থায়ীভাব বলতে চেয়েছেন। 'অবস্থানুসারে', অর্থাৎ বিভাবনার সংস্পর্শে এসে

৫১. ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি স্থায়ীভাব ও ব্যভিচারীভাবের সত্যকার স্বরূপ ও পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এবং শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব রতিকে প্রেমাখ্য মধুর চিত্তবৃত্তিবিশেষ না বুঝিয়া বুঝিয়াছিলেন এক কদর্য মনোবৃত্তি বলিয়া।"

—'কাব্যালোক' (১ম সং), পৃ. ২০৭

তা (স্থায়ীভাব) বেগবতী হয়, অর্থাৎ প্রকাশোন্মুখ হয়। সেই বেগ অর্থাৎ ভাবাবেগকে বা বেগবতী চিত্তবৃত্তিকে "সমুচিত বর্ণন দ্বারা" অর্থাৎ তাকে কাব্যের মধ্যে বাণীমূর্তি দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্যের উদ্দেশ্য। এখানে দেখা যাচ্ছে, যদিও তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের স্থায়ীভাবের রসে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটিকে মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চান নি, কিন্তু রস কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, আবেগের দ্বারা সৌন্দর্যসৃষ্টি—এই রকম একটি অস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এ মতের যৌক্তিকতা যেমনই হোক, এখানে দেখা যাচ্ছে—সৌন্দর্যসৃষ্টি, আবেগের দ্বারা বেগবতী চিত্তবৃত্তির সাহায্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে তিনি একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু রস ও সৌন্দর্যের কি সম্পর্ক তা তিনি পরিস্ফুট করতে পারেন নি। রসের শেষ পরিণাম আনন্দ, সৌন্দর্যেরও শেষ পরিণাম আনন্দ।[৫২] 'রসগঙ্গাধরে'র লেখক জগন্নাথ অনেক আগেই এইভাবে রস ও সৌন্দর্য, আবেগ ও মননের দ্বৈতস্বরূপ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন।[৫৩]

৫২. এডগার অ্যালান পো বলেছিলেন, "I make Beauty the province of the Poem" (*Literary Criticism—A Short History* by Wimsett and Brooks, p. 47) তিনি সৌন্দর্যকেই কাব্যরসের উদ্দেশ্য বলেছিলেন। কিন্তু শিলার বলেছিলেন, আনন্দই সমস্ত শিল্পের মূল কথা—"All art is dedicated to joy ··The right art is that alone, which creates the highest enjoyment', (Ibid. p. 265)

৫৩. 'রসগঙ্গাধর'-প্রণেতা জগন্নাথ বলেছেন, "যত্তু রসবদেব কাব্যমিতি সাহিত্য-দর্পণে নির্ণীতম্, তন্ন। বস্তুলঙ্কার প্রধানানাং কাব্যানাম অকাব্যত্বাপত্তেঃ।" সাহিত্যদর্পণে যে রসবৎ বাক্যই কাব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে তা ঠিক নয়। তাহলে বস্তুপ্রধান ও অলঙ্কারপ্রধান কাব্য অকাব্য হয়ে পড়বে। আর একস্থানে তিনি বলেছেন, "রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।" রমণীয় অর্থযুক্ত বচনাই কাব্য। এই রমণীয়তার অর্থ, তার ভাষায় "লোকোত্তরাহ্লাদজনক জ্ঞানগোচরতা"—অলৌকিক আনন্দের জ্ঞানময়তাকে রমণীয়তা বলে। অর্থাৎ 'রসগঙ্গাধরে'র মতে লোকোত্তর আহ্লাদজনকতা যদি কাব্যের ফলশ্রুতি হয়, তা হলে সেই আনন্দলোকে দুটো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আর যে-সমস্ত কথা বলেছেন, সেগুলি আমরা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আবার উত্থাপন করব। এখন সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, আনন্দ, সৌন্দর্য ও মঙ্গল—সাহিত্যসম্পর্কে এই তিনটি কীভাবে পরস্পরে অনুস্যূত হয়ে আছে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন। সে আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, সৌন্দর্য ও মঙ্গল—এই দুই মেরুপথে তাঁর সাহিত্য-বিচারবুদ্ধি যাতায়াত করেছে।

তার সমকালে 'বঙ্গদর্শন'গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তার শিষ্যদের অনেকেই মঙ্গলতত্ত্বকে সাহিত্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ড ধরেছিলেন এবং সে মঙ্গল বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন কেবল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মঙ্গল। চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, যোগেশ্বর পাঁড়ে এঁরা মূলতঃ হিন্দুসমাজ ও ধর্মের রুদ্ধ বাতায়ন থেকেই সাহিত্যবিচারকর্ম সমাধা করতে উন্মুখ হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'শকুন্তলাতত্ত্বে' (১৮৮১) এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে (১২৮১ বঙ্গাব্দ) দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মৃন্ময়ী' (বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র sequel) সমালোচনায় যে মানদণ্ড ব্যবহার করেছিলেন, আজ হয়তো তা আমাদের মনে কৌতুক সঞ্চার করবে। কিন্তু সে যুগে, অর্থাৎ হিন্দুধর্মে ও সমাজের নবজাগরণের দিনে সে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতসঙ্গত। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'শকুন্তলাতত্ত্বে' এই ধরনের হিন্দুয়ানির পক্ষ থেকে শকুন্তলা নাটক বিচার করেছেন। তার মতে: "অভিজ্ঞান শকুন্তলা ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য।··· অভিজ্ঞান

একটি আবেগধর্মী রস, আর একটি মনোধর্মী রমণীয়তাবোধ। আবেগ দিয়েও আনন্দে যাওয়া যায়, বুদ্ধির দ্বারাও আনন্দে যাওয়া যায়। সুতরাং যে কাব্যে রসের প্রকাশ নেই, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি আছে, যেমন সাম্প্রতিক কবিতাসমূহ—তাকেও সৎকাব্য বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্ততঃ জগন্নাথ এযুগে বর্তমান থাকলে তাই-ই করতেন।

শকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্যদর্শন।"[৫৪] কখনও তিনি এই নাটককে সমাজতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।[৫৫] কখনও বলেছেন, "অভিজ্ঞান শকুন্তল মানসিক শক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য।"[৫৬] কখনও শকুন্তলার তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "ব্যক্তি-বিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়, তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ ইহাই অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথম অর্থ।"[৫৭]

এই সমস্ত উক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে, চন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষদিকে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংরক্ষণের জন্য ব্যগ্র হয়ে বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের মধ্যে কখনও মানসিক নীতি, কখনও বা সাঙ্খ্যদর্শনের ফলিত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে উৎকটভাবে উৎসাহিত হয়েছেন। তাই নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কালে তিনি কালিদাসকে ব্রাহ্মণত্বের উচ্চ মঞ্চে স্থাপন করে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, "কালিদাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ হইয়া দেখাইলেন যে, ধর্মের কাছে ভারতের ঋষিতপস্বীও কিছু নয়। কালিদাস, তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও, তুমি জগতের ব্রাহ্মণ।"[৫৮] দুষ্মন্তের মধ্যে তিনি শুধু ধর্মভাবই লক্ষ্য করেছেন—"কি গম্ভীর, কি দুর্জয় ধর্মভাব! কি মনোহর ধর্মানুরাগ।"[৫৯] তাঁর এই সমস্ত উক্তি এবং তার অন্যান্য গ্রন্থের

৫৪. শকুন্তলাতত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু (১৮৮১), পৃ ১১৪

৫৫. "অভিজ্ঞান শকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।" (পৃ ১০৮)

৫৬ ঐ, পৃ. ১১৭

৫৭ ঐ, পৃ. ১০৪

৫৮. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৯

৫৯. বঙ্কিমচন্দ্রের বেহাই দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী'র সমালোচনায় ঔপন্যাসিকের রচনায় ন্যায়, সত্য, পাতিব্রত্য প্রভৃতি সদগুণের যথোচিত গৌরব রক্ষিত হয় নি বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "পতিব্রতার মাহাত্ম্য অপবিত্রতার নীচতা যিনি বুঝেন না, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিব না। ধর্মাধর্মের স্বাতন্ত্র্য

মতামত থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশুদ্ধ ধর্ম ও সমাজনীতির মানদণ্ডেই তিনি সাহিত্যবিচারে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সে ধর্ম ও সমাজনীতির অর্থ, হিন্দুসমাজ ও আচারগত সংস্কার। সাহিত্যবিশ্লেষণ ও বিচারের যৎকিঞ্চিৎ শক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু সাহিত্যবহির্ভূত দর্শন ও সমাজ-মানসিকতার দ্বারা তিনি এতটা জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, রসবিশ্লেষণের স্বাভাবিক প্রবণতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবশ্য এজন্য তিনি সর্বদা দোষভাজন হতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যপ্রসঙ্গে যে ধরনের চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছিলেন, তাঁর শিষ্যদের হাতে পড়ে সেই তত্ত্ব নিছক নীতি-উপদেশ ও ধর্মতত্ত্বের ফলিত ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। বীরেশ্বর পাঁড়ে 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে' (১৮৯৭) নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ীকাব্য'-কে ('রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস') কঠোরভাবে আক্রমণ

রক্ষা করিতে যিনি জানেন না, তাহাকে সহৃদয় বলিব না। পাপের জয় দেখিতে আমরা নারাজ।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য' থেকে উদ্ধৃত।)

পরবর্তীকালে যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর উপন্যাস থেকে সমাজ, নীতি, ধর্ম, হিন্দুত্ব প্রভৃতির জয় দেখাতে চেয়েছিলেন। এমন কি বিচক্ষণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যিনি সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা দিতেন, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, 'বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন, সমাজের বিরোধী কার্য করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। এবং করিলেই শেষে আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়।...বঙ্কিমবাবুর রচনায় প্রলোভন আছে, তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার করিলে সুখও আছে। সুতরাং বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।" ('বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি', বঙ্গদর্শন, ১২৮৫) বঙ্কিমের বহু রচনা যে শুধু preaching, এ বিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন, "তাহার কমলাকান্তের দপ্তর একটি preaching-এর খনি। কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায়, তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগত বাণীগুলিও প্রচার ভিন্ন কিছুই নয়।" (ঐ)

করেছিলেন। কারণ তাতে হিন্দুধর্মের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সাহিত্যসমালোচনায় স্বাভাবিক রসভোগের শক্তি বিসর্জন দিয়ে ধর্ম-নীতি ও হিন্দুত্বের মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বাভাবিক রসবোধ ও সাহিত্যবিচার-সংক্রান্ত একটি সুসমঞ্জস যুক্তিবোধ থাকলেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে সাহিত্যে নীতিপ্রচারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনায় নবশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবার পূর্বে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে একদিকে সাধারণভাবে মানুষের চরিত্রনীতি, আর একদিকে বিশেষভাবে বাঙালী হিন্দুর সমাজ, ধর্ম ও আচার-নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল। বোধ হয় কবি ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কোন সমালোচক নীতি-ধর্মের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম সমালোচনার যথার্থ রীতিপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন।[৬০] শুধু সৌন্দর্য দিয়ে কাব্যবিচারের যৌক্তিকতা তাঁর অনেক প্রবন্ধেই দেখা যাবে।[৬১] মনস্তত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব এই দুটি চাবি দিয়ে ঠাকুরদাস সাহিত্যবিচারের প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ খুলেছেন। সেদিক থেকে তাঁকে বাংলা সমালোচনার একটি স্মরণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পটভূমিকায় আমরা বালক-কিশোর রবীন্দ্রনাথের সমালোচনারীতি, সাহিত্যরসভোগের বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যের মূল্যবিচার সম্পর্কীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিশ্লেষণ করে তার থেকে কিশোর-সমালোচকের চিন্তাপ্রণালী বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

৬০ ১২৯১ সনের 'পাক্ষিক সমালোচকে' প্রকাশিত তাঁর 'সমালোচন সাহিত্য' প্রবন্ধে সমালোচনার যথার্থ স্বরূপ কী হবে, তাই নিয়ে বিচক্ষণ আলোচনা আছে।

৬১ ১৩০১ সনের 'নব্যভারতে' "কবি বিহারীলাল" প্রবন্ধে তিনি শুধু সৌন্দর্যের দ্বারাই কাব্যবিচারের কথা বলেছেন। যখন তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন, তার কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারে, বিশেষতঃ 'পঞ্চভূতে'র (১৮৯৭) কয়েকটি নিবন্ধে নীতিপ্রচারের 'কেজো' মাপকাঠি পরিত্যাগ করে আনন্দ-সৌন্দর্যের অসীম লোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

১

ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য ও সাহিত্যবিচার-পদ্ধতির মূলসূত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিঞ্চিন্ন্যূন পনের বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন নাম গোপন করে সাহিত্যসমালোচকের বেশে অবতীর্ণ হলেন এবং প্রচলিত তিনখানি কাব্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য পাঠকদের সামনে নিক্ষেপ করলেন তখন কবির অন্তরঙ্গেরা বালক-কবির সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রণালী ও সিদ্ধান্তে অভিনিবেশ দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাল্যজীবন এবং প্রতিবেশ সম্বন্ধে অবহিত থাকলে বিস্ময়ের কারণ অনেকটাই হ্রাস পাবে। ১৩০৭ সালের এক পত্রে চন্দ্রনাথ বসু (যাঁর সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-নীতি-সমাজ নিয়ে একাধিকবার লিপিযুদ্ধ হয়েছিল) রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই - উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। ...ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি, যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর।"[১] চন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রতিভার এই যে দ্রুতগতি, বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করেছেন, সেই বৈচিত্র্য তাঁর বাল্য-কৈশোর পর্বের কোন কোন রচনায় পাওয়া যায়। প্রতিভার রহস্য এখনও রহস্যময়, কোন বিজ্ঞান এখনও প্রতিভার উৎপত্তি ও বিকাশের বিবর্তন-ইতিহাস পুরোপুরি নির্দেশ করতে পারে নি। তবু হৃদয়াবেগের সাহিত্যের ধরনধারণ বুদ্ধিমূলক বিশ্লেষণের বাইরে হলেও মননমূলক সাহিত্যের পীঠস্থান ও পটভূমিকে মন দিয়ে অনেকটা বোঝা যায়। মনের ধর্ম

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার '৮৩' সংখ্যক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৭

পরস্পর যৌক্তিকতাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে—যে-যৌক্তিকতা মূলতঃ ভূমিতলচারী। তাই বালক-কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল রহস্য যতই দুর্জ্ঞেয় হোক না কেন, তাঁর সাহিত্য-বিচারবুদ্ধির মৌলিকতা নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার নয়।

প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার মানদণ্ড নিয়ে নানাপ্রকার আলোচনা চলছিল, এবং নীতি, মঙ্গল ও সৌন্দর্য—এর কোন্‌টি সাহিত্যবিচারের যথার্থ মানদণ্ড হবে তাই নিয়ে সেকালের সাহিত্য-সমাজে নানা প্রসঙ্গ উঠেছিল। এই বিচার-বিতর্কসঙ্কুল সাহিত্যবিচারের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটল। দ্বিতীয়তঃ, ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায়, শিক্ষাদীক্ষা, বিচিত্র গৃহশিক্ষার প্রভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের অপরিণত মন দ্রুতবেগে পরিণতি লাভ করেছিল। তৃতীয়তঃ, তাঁর সহজাত রুচিবোধ ও বিচারবুদ্ধি, যা বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাবও তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসাকে তীক্ষ্ণতা দিয়েছিল। যে-বয়সে তিনি কাব্যসাহিত্যের তাৎপর্য ও মূল্য নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছেন, স্থিরসিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করেছেন, সে-বয়স সাহিত্যবিচার কেন, যে-কোন বুদ্ধিপ্রধান আলোচনার উপযুক্ত নয়। তবে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে বিস্ময়ের কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের বত্রিশ বছর বয়সের অদ্ভুত সাহিত্যকর্মের পরিচয় পেয়ে, কোন কোন দিক দিয়ে তাঁর প্রতিবাদী প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থ এমন শক্তি আমার নাই।"[২] তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জয়ন্তীসভায় শরৎচন্দ্র অভিনন্দন-লিপি পাঠের উপসংহারে বলেছিলেন, "কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে এই যে বিস্ময়বোধ, এ হল মৌলিক প্রতিভার যথার্থ কুলধর্ম এবং এ ধর্ম বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের অপরিণত মনে কতটা ছায়াপাত করেছিল, তাঁর জীবনকথা থেকে সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

---

২. ঐ পুস্তিকা, পৃ. ২৮

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'য় বাল্যকথার যে স্মৃতিচিত্র অঙ্কিত করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, অভিজাতবংশীয় ঠাকুর-বাড়ির সংবত সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়মের জন্য অতি বাল্যকালেই কবিকে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের হেফাজতে পড়তে হয়েছিল। এই সময়কার মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উত্তরকালে কবি বলেছেন, "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।"[৩] বাল্যকালের এই বাধা-নিষেধের ফলে যখন বাল্য-চাঞ্চল্য চাকরদের দৃষ্টিসঙ্কেতে নজরবন্দী হয়ে রইল, তখন বাধ্য হয়েই কল্পনাপ্রবণ বালকের অবারিত কল্পনা অসম্ভবের সাধনায় অগ্রসর হল। কল্পনার সঙ্গে যোগ দিল আবেগ—সে আবেগ যত ছেলে-মানুষিভরা হোক না কেন। দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা বলে যে কবিতাটি স্থিরীকৃত হয়েছে[৪], উনচল্লিশটি স্তবকে রচিত মিলহীন পয়ারের সেই কবিতাটিতে আবেগের উচ্ছ্বাস থাকলেও চিন্তা ও মননের পরম্পরাগত বিকাশ তাতে সর্বত্রই স্পষ্টতা লাভ করেছে। ১৭৯৭ শকের (১৮৭৫, জুন-জুলাই) আষাঢ় সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'বালকের রচিত' "প্রকৃতির খেদ" কবিতাটিতেও[৫] তের বছরের বালকের চিন্তাপ্রণালীর যে ঐক্য ও সংহতি দেখা যাচ্ছে, তাও কম বিস্ময়কর নয়। বাল্যকালেই রুদ্ধদ্বার কবিচেতনা কখনও আপন

৩. জীবনস্মৃতি, ১৩৬৮ সালের সংস্করণ, পৃ. ৮ (এই সমালোচনায় জীবন-স্মৃতির এই সংস্করণটি ব্যবহার করা হয়েছে, পত্রাংক ও এই সংস্করণের।)

৪. কবিতাটির নাম 'অভিলাষ' ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৮৭৪, নভেম্বর-ডিসেম্বর) 'তত্ত্ববোধিনী'তে এটি 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত' বলে প্রকাশিত হয়। এটি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা তা প্রমাণ করেন সজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ আশ্বিন)। রবীন্দ্রনাথও সে কবিতার স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বীকার করেন।

৫. প্রবোধচন্দ্র সেন—রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা (দেশ, ১৬ চৈত্র, ১৩৫২)

মনে নিজ হৃদয়বৃত্তির আলো-ছায়ালোকে বিচরণ করত, কখনও-বা নিজেকে চিন্তা ও যুক্তির মধ্যে ছেড়ে দিত। ফলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর আবেগ ও মনঃপ্রকৃতি সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। মাত্র আট-নয় বছর বয়সে তিনি পদ্মের ওপর একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির একস্থলে মধুপের স্থানে নতুন-শেখা 'দ্বিরেফ' শব্দটি বসিয়ে বালক-কবি মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন। অবশ্য ন্যাশনাল পেপারের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র কবিতাটি শুনে বললেন, "বেশ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিরেফ শব্দটার মানে কি?" যে নতুন শব্দটির ওপর বালকের সব চেয়ে ভরসা ছিল, সেটি সমালোচক নবগোপাল মিত্রের কাছে ফেঁসে গেল। বালক-কবি সক্ষোভে ভেবে নিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল নবগোপালবাবু সমঝদার লোক নহেন। তাহাকে আর কখনও কবিতা শুনাই নাই" (জীবনস্মৃতি)। এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি প্রিয় শব্দ, যার ঝঙ্কার তাঁর বালক মন ও কানকে ভরিয়ে তুলেছিল, নবগোপাল মিত্রের হাসি সত্ত্বেও "সেটি মধপানমত্ত ভ্রমরের মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।" নবগোপালবাবু যে 'সমঝদার লোক' নন, তা বালকবি এই ঘটনা থেকেই সিদ্ধান্ত করলেন।[৬] লক্ষণীয়, এই বয়সে শুধু কবিতা রচনা নয়, কবিতার সমঝদার অর্থাৎ সমালোচক সম্বন্ধে তাঁর অস্পষ্ট রকমের ধারণা ছিল। মূল্য বিচার নয়, রায় দান নয়, রসের সমঝদারি অর্থাৎ কবির সঙ্গে সমালোচকের রসের সমভাগিতা সমালোচনার যে বড় ধর্ম, এরকম কথার অস্পষ্ট আভাস বালকের মনেও ফুটে উঠেছিল। এই নিয়ে পরিণত বয়সে 'জীবনস্মৃতি'তে পরিহাস করলেও রসালোচনা ও

---

৬. আর একবার, বাল্যকালে লেখা তাঁর একটি পারমার্থিক কবিতা মহর্ষিদেবকে শোনানো হলে "সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল-সকালই যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারচ্ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্য তাহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই (জী-স্মৃ)।" এতে বালক-কবি মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

উপভোগ্যতা যে সাহিত্যবিচারের বড় অঙ্গ, যে-মতে তিনি সমগ্র জীবন ধরেই আসক্ত ছিলেন, তার ক্ষীণ সঙ্কেত এই ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে।

বালক-ছাত্রদের কৌতূহল উদ্রেকের জন্য তাঁর বাল্যকালের গৃহ-শিক্ষক মানুষের কণ্ঠনালী সংগ্রহ করে তার সাহায্যে স্বরযন্ত্রের কলা-কৌশল ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু গোটা মানুষটাকে—তার বাক্যালাপের সমগ্রতাকে বাদ দিয়ে তার খণ্ডিত কণ্ঠনালীর সাহায্যে শিক্ষকমহাশয় বালক রবীন্দ্রনাথের মনে কৌতূহল জাগাতে পারেন নি। তার পর আর একদিন মানবদেহ সম্বন্ধে নবীন ছাত্রদের অধিকতর কৌতূহল উদ্রেকের জন্য শিক্ষকটি তাঁদের মেডিকেল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদাগারে নিয়ে গেলেন। সেখানকার দৃশ্য দেখে বালক-কবির কি মনে হয়েছিল, বহুকাল পরে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি সে সম্পর্কে বলেছেন :

> "টেবিলের উপরে একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল, সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই, কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল, সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ঙ্কর, এমন অসঙ্গত যে সেই মেজে-উপর পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।" (জীবন-স্মৃতি, পৃ. ২৩)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে ('প্রবাসীতে' ১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৯ সালে শ্রাবণে প্রকাশিত) পরিণত বয়সের পরিপক্ক জ্ঞানবুদ্ধি থেকেই যে এ উক্তি করেছেন, এমন মনে করার কারণ নেই। বালক-রবীন্দ্রনাথ মৃতদেহ দেখে ততটা বিস্মিত হন নি, যতটা হয়েছিলেন একটি 'কৃষ্ণবর্ণ', 'অর্থহীন' কাটা পা দেখে। মানুষকে খণ্ডিত করে দেখা তাঁর কবিজীবনের প্রকৃতি নয়, ব্যক্তি-জীবনেরও স্বভাব নয়। পরবর্তীকালের সাহিত্য-বিচারে তিনি যে সমগ্রতা ও পূর্ণত্বের পরিমণ্ডল থেকে শিল্পসৃষ্টির রহস্যানুসন্ধান করেছেন, সেটি পরবর্তীকালের অধীত বিদ্যা ও ঐশ্বর্যবান অভিজ্ঞতার উপরি

পাওনা নয়। তাঁর বাল্যকালের স্বভাবধর্মের মধ্যেই এই জাতীয় একটি সমগ্র বিচারবোধ ও পূর্ণ রূপদৃষ্টি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল। তাই টেবিলে-শয়ান মৃতদেহ তাঁর বালক-মনে শঙ্কা ও কৌতূহল সৃষ্টি করে নি, কিন্তু কাটা পা'খানি খণ্ডিত বলেই তাঁর কাছে অপূর্ণ ও অর্থহীন মনে হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তীকালে তাঁর রসোপ-ভোগ ও বিচারবুদ্ধিকে যে কতটা প্রভাবিত করেছে তা আমরা পরে আলোচনাকালে বিশ্লেষণ করব।

বাল্যকাল থেকেই অতিশয় কল্পনাসমৃদ্ধ ছিলেন বলে নয়-দশ বৎসর বয়সেই, ইংরেজী বিশেষ কিছু না জানলেও, তিনি ডিকেন্সের ছবিওয়ালা *Old Curiosity Shop* থেকে মোটামুটি রসভোগের আনন্দ পেয়েছিলেন। গদ্যের ঢঙে ছাপা 'গীতগোবিন্দে'র ঝঙ্কারমুখর পদগুলিকে যখন যথাযথ ছন্দ-যতি দিয়ে পড়তে পারলেন তখন খুশির আর সীমা রইল না। দেবভাষার অনুস্বার-বিসর্গের স্তূপ ঠেলে নিতান্ত বালকবয়সে গীতগোবিন্দের ধ্বনিঝঙ্কারে মুগ্ধ হওয়াও সহজ নয়। তবু তার ধ্বনিসৌন্দর্যে তাঁর কান মুগ্ধ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, 'কুমার-সম্ভবে'র একটি শ্লোক তাঁর বালক-মনে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল, এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কুমারের প্রথম সর্গের পঞ্চদশ শ্লোকটির[৭] কয়েকটি শব্দের ('মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর', 'কম্পিত-দেবদারুঃ') ধ্বনি ও চিত্রমাধুর্য বালকের মন জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গোটা শ্লোকটির অর্থ করে

৭. কবি 'জীবনস্মৃতি'তে শ্লোকটি এইভাবে আরম্ভ করেছেন—"মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকরাণাং" ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে আছে:

ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।

যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্ন-শিখণ্ডি-বর্হঃ॥ কুমার, ১।১৫

অনুবাদ: ভাগীরথীধারায় জলকণাবাহী যে বায়ু মুহুর্মুহু দেবদারুশাখাকে কম্পিত করে এবং যা ময়ূরপুচ্ছকে বিশ্লিষ্ট করে, মৃগান্বেষণরত কিরাতদের দ্বারা সেই বায়ু সেবিত হয়। (এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের কিছু পার্থক্য আছে।)

নিলেন ("মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে" – 'জীবনস্মৃতি'), তখন শ্লোকটির উপভোগ্যতা ও সৌন্দর্য যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেল। বাতাস ময়ূরপুচ্ছকে "চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে– এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল" (জীবনস্মৃতি)। কবির এ উক্তি থেকে লক্ষ্য করা যাবে, ময়ূরপুচ্ছের সমগ্রতাকে যখন মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকর ও কম্পিতদেবদারুর বায়ু ছিন্নভিন্ন করে ফেলল, তখন এ দৃশ্য বালকের ভালো লাগল না। মন্দাকিনীনির্ঝরের শীতলত্ব এবং দেবদারুশাখার কম্পন তাঁর বালক-মনকে রসভোগে উন্মুখ করে তুললেও, গোটা অর্থ পাওয়ার পর তিনি মনের দিক থেকে বড় পীড়া বোধ করতে লাগলেন। অর্থাৎ বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, তাৎপর্য, অর্থ ইত্যাদির দ্বারা রসোপভোগ অনেক সময়ে সম্পূর্ণ হবার অবকাশ পায় না। এই প্রসঙ্গে বালক-মনের তলে দুটি ভাবনা জেগেছিল। একটি হল- বিশ্লেষণের ছিন্নভিন্নতার দ্বারা রসের উপভোগ্যতা ও সৌন্দর্যের পূর্ণতা অনেক সময়েই খর্ব হয়ে পড়ে, এবং অপরটি হল রসোপভোগের জন্য বোধগম্যতাই শিল্পসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ নয়।[৮]

৮. 'Function of Criticism' প্রবন্ধে এলিয়ট 'understanding' ও 'enjoyment'-এর কোন একটিকেই কাব্যসমালোচনা থেকে বাদ দিতে চান নি। তার মন্তব্য—"The critic accordingly is a literary critic if his primary interest, in writing criticism, is to help his readers to understand and enjoy" (*English Critical Essays, XX century*, second series P 51-52). অবশ্য বোধ ও ভোগ ('understanding' ও 'enjoyment') একপেশে হয়ে গেলে বা একটির ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপিত হলে কি ত্রুটি ঘটতে পারে সে বিষয়ে এলিয়ট বলছেন, "If in literary criticism, we place all the emphasis upon understanding, we are in danger of slipping from understanding to mere explanation. We are in danger even of pursuing criticism as if it was a science which it never can be. If, on

আট-ন বছর বয়সে, যে বয়সে অন্য বালকে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ আটে-ছয়ে যতিভাগ করে পয়ারে কবিতা লেখা শেখেন[৯] এবং কোন-এক কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীলখাতা সংগ্রহ করে কবিতা রচনা শুরু করেন। একটু বয়স বাড়লে পড়া চলল অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ', 'পদার্থবিদ্যা', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মেডিকেল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবুর কাছে যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী শেখাও চলেছে। প্যারীচরণ সরকারের *The Eirst Book of Reading* এবং *The Second Book of Reading* কোন-রকমে শেষ হতেই মকলকের (Macculloch)-এর *Course of Reading* শ্রেণীর একখানি দুরূহ বই ধরানো হল। ফলে বিদ্যা অর্জনের চেয়ে বর্জনের দিকেই তাঁর আকর্ষণ হল বেশী। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে কবিতা রচনা চলেছে, "বয়স যদিচ তাঁর এগার বছর।" নর্মাল স্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত এব সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু স্কুল-পালানো ছাত্রের মধ্যে অকস্মাৎ কবিতা লেখার দুর্লভ শক্তি আবিষ্কার করলেন। বালক-কবি পদার্থবিদ্যা পড়লেন বটে, কিন্তু "পদার্থের সঙ্গে কোনো

---

the other hand, we over-emphasize enjoyment, we will tend to fall in the subjective and impressionistic, and our enjoyment will profit us no more than mere amusement and pastime" (Ibid, p. 53) এখানে দেখা যাচ্ছে এলিয়টের মতে শুধু বোধগম্যতার ওপর জোর দিলে শেষ পর্যন্ত সমালোচনা সরলার্থ ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকবে। এমন কি, তা হলে সাহিত্য সমালোচনাও বস্তুবিজ্ঞান বা যুক্তিবিজ্ঞানের একটি শাখামাত্রে পর্যবসিত হবে। আবার যদি উপভোগ্যতার দিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে ব্যক্তিগত অভিরুচিই সাহিত্যবিচারের একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে পরিগণিত হবে এবং কাব্যরস-ভোগ সময় কাটাবার তুচ্ছ চিত্তবিনোদনে আত্মনিয়োগ করবে।

৯. তাঁর ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি মাতুলের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন, তিনিই একদিন বালক রবীন্দ্রনাথকে পয়ার লেখার কৌশল শিখিয়ে দেন।

সম্পর্ক ছিল না"। বালকের কাছে 'মেঘনাদবধ' 'শিশুপালবধ' রূপে দেখা দিল! নর্মাল স্কুলে বিদ্যা হল না। তখন তাঁকে বেঙ্গল অ্যাকাডেমির ফিরিঙ্গী স্কুলে ভর্তি করা হল। ফল যে আরও ভালো হল, এমন কথা ইতিহাসে লেখে না। ইতিমধ্যে তাঁর উপনয়ন হয়ে গেল (১৮৭৩, ৬ ফেব্রুয়ারী)। তখন তাঁর বয়স এগার বৎসর ন'মাস। নতুন বটু হয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে গায়ত্রী পাঠ করছেন। মন্ত্রের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার বয়স হয় নি, কিন্তু কবি বাল্যস্মৃতি মন্থন করে বলছেন, "আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।" এই বয়সেই 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দ তাঁর কানকে ধ্বনিমাধুর্যে এবং হৃদয়কে আনন্দবেগে পূর্ণ করে তুলত। ইংরেজী বিশেষ জানা না থাকলেও ডিকেন্সের উপন্যাস নাড়াচাড়া করে তার থেকে এক রকম রসাস্বাদন করতে পারতেন। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে[10] গদ্যের আকারে ছাপা 'গীতগোবিন্দ' যতি দিয়ে পড়তে পারতেন এবং জয়দেবের ভাষার ধ্বনিতরঙ্গে মুগ্ধ হবার মতো কানও তৈরি হয়েছিল। একদিন কৌতূহলের বশে এবং ধ্বনিমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিতের কাছে 'কুমারসম্ভবে'র শ্লোকের অনুবাদ জানতে চাইলেন। এই সময়ে হিমালয় যাত্রার পূর্বে পিতার সঙ্গে তিনি কিছুদিন বোলপুরে ছিলেন। সেখানে মহর্ষি গীতার সংস্কৃত শ্লোক ও তার বঙ্গানুবাদের নকল করার ভার দিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের ওপর। সেখানে 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে বীররসের একখানি কাব্যও লিখে ফেলেছিলেন, দুঃখের বিষয় সেটি হারিয়ে গেছে। বাংলার বাইরে হিমাচলের সান্নিধ্যে গিয়ে মহর্ষি কনিষ্ঠপুত্রের শিক্ষার ভার নিজহস্তেই নিলেন। পড়ানো চলতে লাগল বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনী, ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ আর রিচার্ড প্রোক্টরের জ্যোতিষগ্রন্থ (খুব সম্ভব *Half hours with the Telescope* এবং *The Orbs Around Us*[11]) থেকে

১০. এটি খুব সম্ভব ১৮৭৫ সাল। দ্রষ্টব্য: জীবনস্মৃতি, তথ্যপঞ্জী পৃ. ২৪৪

১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী (১ম), পৃ. ৩৯ (পাদটীকা।)

নানা তত্ত্বকথা। তার কিছু কিছু তিনি বাংলায় লিখতেন। সেগুলি কিছু মাজাঘষা হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী'তে (১৭৯৬ শক, পৌষ) "গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি" নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে প্রবন্ধে তাঁর নাম ছিল না। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম গদ্যরচনা এইটি। তাঁর প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' নামে তার একমাস পূর্বের 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। হিমালয় থেকে কলকাতা ফিরলেন মাত্র কয়েক মাস পরে, কিন্তু বয়স না বাড়লেও অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল প্রচুর। ঋজুপাঠের যৎসামান্য বিদ্যা দিয়ে মায়ের কাছে বাল্মীকি পড়া ও ব্যাখ্যার চেষ্টা, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ও সেণ্টজেভিয়াস স্কুলে ভর্তি—ফল যথাপূর্বং। তখন মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার ভার নিলেন। জ্ঞানচন্দ্র কুমারসম্ভব অনুবাদ করে পড়াতে লাগলেন, বালককে দিয়ে ম্যাকবেথের অংশবিশেষ তর্জমা করিয়ে নিলেন। তার খানিকটা মাজাঘষা হয়ে ১২৮৭ সালের 'ভারতী'তে ('সম্পাদকের বৈঠক') প্রকাশিত হয়। মেট্রোপলিটান স্কুলের হেডপণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য তাঁকে শকুন্তলা ধরালেন (১৮৭৫)[১২], বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে সেই অনুবাদ শোনানো হলে বালক-কবির বেশ খানিকটা সাহস বেড়ে গেল। দেখা যাচ্ছে, কবি এই বয়সেই সেকালের বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় বই পড়ে ফেলেছিলেন।[১৩] দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' (১৮৭২), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৭৭৪-১৭৮১ শকাব্দ), 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩, পুনঃপ্রকাশ—১৮৬৭), 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পৌলবর্জিনী' (পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১২৭৫-৭৬ সালে প্রকাশিত), বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত

১২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৪৭

১৩. "আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।"—জীবনস্মৃতি, পৃ. ৬২

'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' (১২৮১-৮৩ সালের—মধ্যে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত —বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল) প্রভৃতি অধিগত করে ফেলেছিলেন।

অপরদিকে তাঁদের পরিবারে তখন সাহিত্য ও নাটকের হাওয়া বইছিল। গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ—ঠাকুরবাড়ির বড়ো এবং ছোটরা এবং বাইরের রামনারায়ণ তর্করত্ন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী — এঁরা সাহিত্যের ভোজ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বালক-কবির তাতে ডাক পড়া সম্ভব ছিল না, আড়াল-আবডাল থেকে তিনি যৎকিঞ্চিৎ রসাহরণের চেষ্টা করতেন। কিন্তু ইংরেজী কাব্য ও সমালোচনার মধ্যে যাঁরা এই অপরিণতবয়স্ক বালককে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু ও ঠাকুরবাড়ির অন্তরঙ্গ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্যে সমান রসজ্ঞ অক্ষয়চন্দ্র চৌধরী জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতে রবীন্দ্রনাথের ওপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[১৪] কবি, সমালোচক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়চন্দ্র আত্মপ্রকাশে স্বতঃই বিমুখ ছিলেন, প্রতিভার অনুপাতে যৎসামান্য রচনার চিহ্ন রেখে গেছেন। কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, এবং যার কিছু কিছু 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, তার সমস্তই অক্ষয়চন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়।

এতদিন দু'একটি রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে যথার্থ রচনাসহ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৫)। ১২৭৯ সালে (১৮৭৩) রাজশাহী বোয়ালিয়া থেকে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে "সাহিত্যদর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা" (শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত)

১৪. কবির উক্তিঃ "ইহার সঙ্গ রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।" ('জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি, জীবনস্মৃতি, পৃ. ২৪৬)

প্রকাশিত হয়। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে এর চতুর্থ বর্ষ শুরু হয় এবং সেই মাস থেকে এর সঙ্গে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকা মিলিত হলে পত্রিকা দু'খানি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' এই নাম নিয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে লাগল। এই পত্রিকার নবকলেবরের প্রথম সংখ্যা থেকেই বালক রবীন্দ্রনাথের 'প্রলাপ' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ এবং 'বনফুল' কাব্যের প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়।[১৫] এই 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রকে পরিণত বয়সে কবি যতই পরিহাস করুন না কেন[১৬], এই পত্রের যে সংখ্যায় বালক-কবির 'বনফুল' প্রকাশিত হল, সেই সংখ্যার লেখক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামদাস সেন এবং দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়।[১৭] এখানে দেখা যাচ্ছে, 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রথম সর্গ প্রকাশের সময় কবির বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর সাত মাস। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা, যার প্রথম স্বীকৃতি তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে দিয়েছেন ('ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি), তখন তাঁর বয়স প্রায় সাড়ে পনের বছর। কিন্তু তারও বেশ কিছুকাল আগে, যখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর, তখন তাঁর লেখা

১৫ এই পত্রিকার ১২৮২ অগ্রহায়ণে 'বনফুলে'র ১ম সর্গ, মাঘে ২য় সর্গ, ফাল্গুনে 'প্রলাপ' (কবিতাগুচ্ছ), চৈত্রে 'বনফুলে'র ৩য় সর্গ, ১২৮৩ বৈশাখে 'প্রলাপ', জ্যৈষ্ঠে বনফুলের ৪র্থ ৫ম সর্গ, শ্রাবণে ৬ষ্ঠ সর্গ, ভাদ্রে ৭ম সর্গ, আশ্বিন-কার্তিকে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধ (লেখকের নাম ছিল না) এবং 'বনফুলের' সর্বশেষ ৮ম সর্গ প্রকাশিত হয়। এর চার বছর পরে 'বনফুল' ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৬. "এই সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।" (জী-স্মৃ, পৃ. ৭৪)

১৭. এই সংখ্যায় রজনীকান্তের 'অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়', দ্বিজেন্দ্রনাথের 'পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র', রাজনারায়ণ বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস 'অমৃতাঙ্কুর', কালীবর বেদান্তবাগীশের 'আর্যজাতির ভূবৃত্তান্ত,' কার্তিকেয়চন্দ্র

গ্রহনক্ষত্র-সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ কিছু পরিমার্জিত হয়ে ১৭৯৬ শকের (পৌষ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়, তাতেও তাঁর নাম ছিল না। প্রবন্ধটির নাম 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'।[১৮] রচনার কিছু দৃষ্টান্ত থেকে বালক-রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার স্বাদ পাওয়া যাবে :

> "কোন মেঘবিনিমুক্ত তারকা-সমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগনমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবে। যেসকল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে তাহারা কি শূন্য, না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীব দ্বারা পূর্ণ? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোন স্থান থাকিতে পারে যেখানে প্রাণের চিহ্নমাত্রও নাই?" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ, ১৭৯৬ শক)

এই সমস্ত তথ্য-উপাদান থেকে দেখা যাচ্ছে, ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বালক-মন কী ধরনের চিন্তার সামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে

রায়ের 'ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত', এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ললিত-সৌদামিনী' মুদ্রিত হয়।

১৮ 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, "ইহা ছাড়া তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম" (পৃ ৫১)। এখানে দেখা যাচ্ছে, ড্যালহৌসি যাবার পথে অমৃতসরে অবস্থানের সময় মহর্ষি বালকপুত্রকে জ্যোতিষ সম্পর্কে পাঠ দিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথ সেগুলি লিখে ফেলতেন। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি' রচনার অনেক পরে 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪০) তিনি বলেছেন, "তারপর সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে, আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম" (জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ১৭২)। মনে হয়, গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে আলোচনা বোলপুর থেকেই শুরু হয়েছিল। তারপর অমৃতসর ও ড্যালহৌসী গিয়ে সে আলোচন আরও পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং অনুমান হয় তিনি বোলপুর থেকেই সেই

উঠেছিল। স্কুলে এবং বাড়িতে শিক্ষার ভূরিভোজ থেকে হয়তো তিনি যথেষ্ট লাভবান হন নি, কারণ নিরর্থক জ্ঞানের সঞ্চয়ে তাঁর কোন দিনই রুচি ছিল না। কিন্তু কাব্য ও বিজ্ঞান—এ দুয়ের প্রতি তাঁর বালক-মন বিশেষ আকর্ষণ বোধ করত। কাব্য হল হৃদয়রহস্য, বিজ্ঞান হল বস্তুরহস্য—এই দুই ব্যাপার ত্রয়োদশ বৎসরের বালকের অপরিণত কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল উচ্ছ্বসিত আবেগে, অপার্থিব সৌন্দর্যে এবং অজানা কৌতূহলে। ফলে একদিকে লেখা চলেছে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের 'অভিলাষ', 'প্রকৃতির খেদ'[১৯], 'বনফুল' 'প্রলাপ-গুচ্ছ'। অপরদিকে লেখা চলেছে সুদূর-লোকবাসী গ্রহনক্ষত্রদের

আলোচনাগুলি বাংলায় লিখতে আরম্ভ করেন। তারই কিছু অংশ 'তত্ত্ব-বোধিনী'র কর্মকর্তাদের কারও দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের খাতিরে এই প্রবন্ধটিকেই ('গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি') রবীন্দ্র-নাথের প্রথম গদ্যরচনা বলে স্বীকার করতে হবে। মনে হয়, এই গদ্য নিবন্ধ-গুলি ১৮৭৩ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে রচিত এবং পরিমার্জিত হয়ে ১৮৭৪ সালের পৌষ মাসে (১৭৯৬ শক) 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়। গদ্যনিবন্ধ রচনার সময় তাঁর বয়স বারো বৎসরের অনধিক, 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশের সময় চৌদ্দ বৎসরের কিছু কম।

১৯. 'প্রকৃতির খেদ' নামে একটি কবিতা ১৭৯৭ শকের আষাঢ় মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'তে মুদ্রিত হয়। রচনাকার হিসাবে শুধু 'বালকের রচিত' এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে সেটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা তার একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১২৮২ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ সাপ্তাহিক 'সাধারণী'র এক সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভায় নানা অনুষ্ঠানের পর "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।" শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেন, (দ্রষ্টব্য—দেশ, ১৩৫২, ১৬ই চৈত্র) যে মাসের কোন এক তারিখে এই কবিতা রচিত হয়। তবে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো-তের নয়, সাড়ে তের বৎসর।

গদ্যবিবরণী এবং এই যুগের সব চেয়ে পরিণত পরিপক্ক রচনা—একটি সমালোচনা—"ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখ-সঙ্গিনী"। অতঃপর আমরা কাব্যবিচারঘটিত এই নিবন্ধ থেকে বালক রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-প্রতিভার প্রথম নিদর্শনটির কিছু বিস্তারিত আকারে বিশ্লেষণ করব।

২

"ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী" প্রবন্ধটি যখন 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক, ১৮৭৬) প্রকাশিত হল তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বৎসর ছ'মাস। বিষয়টি হল, তখনকার সাহিত্যসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ তিনজন কবির সদ্য-প্রকাশিত কাব্যের সমালোচনা। এই আলোচনাটি সে-যুগের পাঠকসমাজে কিঞ্চিৎ আলোড়ন তুলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবিও সে আলোড়নের কথা বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি এই কালের অনেক রচনার কথা বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু সাড়ে চোদ্দ বৎসরের এই রচনাটির কথা তাঁর স্মৃতিপটে অম্লান ছিল। প্রথমে আমরা উক্ত তিনখানি কাব্য ও কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' কবিতাপুস্তকখানি সেযুগে পাঠকমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই ক্ষুদ্র কাব্য ১৭৯৬ শকে (অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে) প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে কবির নাম ছিল নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কবি তাঁর আত্মীয় রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়কে কাব্যটি উপহার দিয়ে লিখেছিলেন: "আমার আদরিণী 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-কে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'প্রথম ভাগ' (১২৮৬। ১৮৮০) নামে প্রকাশিত হয়। "আখ্যাপত্রে শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত" এবং "বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত" এই উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এ কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ শকে

(১৮৭৭)। প্রথম ভাগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটি নানা মহলে অতিরিক্ত প্রশংসা লাভ করে। এতটা প্রশংসার পিছনে অবশ্য গূঢ় কারণ ছিল। একটি বিশেষ কারণে এ কাব্যকে পাঠকেরা কোন মহিলা-কবির লেখা বলে মনে করেছিল, সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরাও সে-কথা বিশ্বাস করে মহিলাকবির এই কাব্যকে প্রবল জয়বাদ্যসহ অতি-প্রশংসায় তুলে ধরলেন। কাব্যটি যে মহিলার রচনা (যদিও আখ্যাপত্রে রচনাকার নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামটি বেশ মোটা হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল), এ বিশ্বাসের কতকগুলি সূত্র আছে। সে রহস্যময় সূত্রগুলি স্বয়ং নবীনচন্দ্রই যোগান দিয়েছিলেন। কবি তাঁর আত্মজীবনীতে (অদ্যাপি অপ্রকাশিত- তার দুই পৌত্র মৃণালকান্তি ও নির্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়ের কাছে আছে)[২০] এই রহস্যের কথা সবিস্তারে বলেছেন। কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৩ সালে বর্ধমানের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে তিনি নানা ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও দুঃসাহসিকতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। কবিতা রচনায় তাঁর ঝোঁক ছিল। যাই হোক একদা ঔষধপত্র তৈরি করে তিনি বেশ ধনশালী হয়েছিলেন। 'নবীনবাবুর লোহসার' সে-যুগে জ্বরঘ্ন পাচনরূপে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি ব্যবসায় যেমন সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তেমনি অজস্র কবিতা লিখেছিলেন। তার প্রায় সমস্তই অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি কবিতা ১৮৭৫ সালে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' নামে প্রকাশিত হয়। এর পরের ঘটনা তাঁর স্মৃতি-কথা থেকেই উদ্ধৃত করি:

> "ভুবনমোহিনী প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার কারণ, ইহা ভুবনমোহিনী দেবী নামিকা কোন বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের রচিত, এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া নানাজনে নানাপ্রকার সমালোচনা আরম্ভ করিল। আমাকেও অনেক

২০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), পৃ ৫

লোক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমি প্রকৃত কথা বলিতে লাগিলাম, তথাপি কাহারও ভ্রম দূর হইল না।"

চুঁচুড়ার 'সাধারণী' পত্রের সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, "ভুবনমোহিনী প্রকৃত প্রতিভাশালিনী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস" (সাধারণী, ১২৮২, ১৬ই ফাল্গুন)। এডুকেশন গেজেটের (১২৯১, ২৬শে চৈত্র) সমালোচনাতেও "মহিলাকবির" এই কাব্য উচ্চ প্রশংসা লাভ করল। কাব্যটির আখ্যাপত্রে নবীনচন্দ্রের নাম থাকলেও সমালোচক, সম্পাদক ও পাঠকেরা এ কাব্যকে স্ত্রীলোকের রচনা বলেই প্রশংসার মাত্রা চড়িয়ে দিলেন। এ রকম অদ্ভুত ধারণা পাঠকমহলে কেন প্রচারলাভ করল, এবং এর উদ্ভাবয়িতা কে, সে বিষয়ে স্বয়ং কবি নবীনচন্দ্র কোন সংশয় রাখেন নি। তাঁর 'সিন্ধুদূতে'র (১৮৯৩) আখ্যাপত্রে তিনিই যে "ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র কবি তা ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এর পিছনে একটু রহস্যকৌতুক আছে। ১৮৭৪ সাল থেকে তাঁর কবিতা অক্ষয় সরকারের 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অকৃতজ্ঞ শুক'-এ কবির নাম ছিল না। এর পর 'কাঁদ কেন?' এবং 'কিবা দেখিলাম' (১৮৭৪, ৮ই ও ১৫ই নভেম্বর) কবিতা দুটির শেষে শুধু 'শ্রী' এই স্বাক্ষর ছিল। এর পর ১৮৭৫, ১১ এপ্রিলের 'সাধারণী'তে তাঁর 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী' কবিতা 'শ্রীভুবনমোহিনী দেবী' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ঐ সনের 'সাধারণী'তে (২৬এ সেপ্টেম্বর) 'নীলাম্বরের কালোমেঘ' কবিতাটিও ভুবনমোহিনী দেবীর নামে ছাপা হয়। এমন কি 'বঙ্গদর্শনে'ও (১২৮২, শ্রবণ) ভুবনমোহিনী দেবীর রচিত বলে তাঁর 'দরিদ্র যবক' কবিতা প্রকাশিত হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে এর দু'বছর আগে তাঁর স্বনামে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' প্রচারিত হয়েছে। কবি কেন 'ভুবনমোহিনী দেবী' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর স্মৃতিকথায় সে-সম্পর্কে বলেছেন :

"এই স্থানে (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের নসীপুর গ্রাম) হইতে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে দুই একটি মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথমে

সম্পাদক মহাশয় ঐ সকল কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিলেন যে, *এই দুইটি কবিতা* কবিতাই হয় নাই, সুতরাং প্রকাশ করা গেল না। তৎপরে আর একটি কবিতা *ভুবনমোহিনী দেবী*,—স্বাক্ষর করিয়া পাঠানোতে সম্পাদক মহাশয় আহ্লাদে অধীর হইয়া ভূয়সী প্রশংসাবাদ সহকারে মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন। এই কবিতা লইয়া নসীপুরে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে খুব একটা বাহবা পড়িয়া গেল। এইরূপে ভুবনমোহিনী দেবী স্বাক্ষরে কবিতাসকল বাহির হইতে লাগিল। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত পুস্তিকা, পৃ. ১৫)

অবশ্য ভুবনমোহিনী দেবী নামটি একেবারে কাল্পনিক নয়। তাঁর 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' যে-রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উপহার দেওয়া হয়, তিনি ছিলেন কবির আত্মীয়। তারই স্ত্রীর নাম ভুবনমোহিনী। ইনিও যৎসামান্য লিখেছিলেন, বোধ হয় নবীনচন্দ্রের উৎসাহে। ১৮৭৫ সালে এঁর 'বল্লরী' নামে কাব্য এবং 'আমোদিনী' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।* 'বিনোদিনী' নামে একখানি মাসিকপত্র ১২৮১ (১৮৭৫, ৩০ এপ্রিল) সনের বৈশাখ মাসে এঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তবে ঐ পত্রের সম্পাদিকা হিসেবে শুধু তার নামটি মলাটে ছিল। নবীনচন্দ্র ও অন্যান্য বন্ধুরা এটি পরিচালনা করতেন। সুতরাং কিঞ্চিৎ স্বার্থ, কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের ইচ্ছায় এই আত্মীয়ার নামে তিনি পত্রিকাদিতে কিছু কিছু কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, বাকি কবিতা তাঁর স্বনামেই ছাপা হয়েছিল। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এ ঘটনা জানতেন। কেন না 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র সমালোচনা করে তাঁর পরিচিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাধারণীতে লিখেছেন—"ভুবনমোহিনীপ্রতিভার কথা সাধারণীর পাঠকেরা সকলেই বোধ হয় জানেন। ভুবনমোহিনী দেবী সময়ে সময়ে সাধারণীতে যে সকল পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং বিনোদিনী পত্রিকায় যে সকল পদ্য লিখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত নবীনবাবু পুস্তকাকারে ভুবনমোহিনী প্রতিভা নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভুবনমোহিনী

* এই তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন তার 'বীরভূমি বিবরণে'র দ্বিতীয় খণ্ডে।

প্রকৃত প্রতিভাশালিনী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে আমরা ভুবন-মোহিনী দেবী সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রকে যেরূপ গোপনে বলিয়াছি, এবার প্রকাশ্যে সমালোচকরূপে সেইরূপ বলিতেছি যে, ভুবনমোহিনী যদি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার প্রতিভার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনা ও শোভাবর্ধন করেন, তবে সত্যসত্যই তাঁহার প্রতিভা ভুবনমোহন করিবে।" (সাধারণী, ১২৮১, ১৭ই ফাল্গুন)

এখানে দেখা যাচ্ছে, 'সাধারণী' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, যাঁরা নবীনচন্দ্রকে বিশেষভাবে চিনতেন, যে-ভুবনমোহিনী দেবীর নামে 'বিনোদিনী পত্রিকা' 'সাধারণী' মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হত, তাঁরা বোধ হয় মনে করেছিলেন যে, সেই-ভুবনমোহিনীর কবিতাই নবীনচন্দ্র মেজে-ঘষে সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছিলেন। এ কাব্যের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের কোথাও ভুবনমোহিনী দেবীর নাম ছিল না। শুধু ইংরেজীতে দু'ছত্রে এই ভাবে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছিল—"ভুবন মোহিনী প্রতিভা। Edited and Published by Nobin Chandra Mookhopadhyaya, ১ম ভাগ।" এ রকম নির্দেশ থেকে 'সাধারণী' সম্পাদক হয়তো মনে করেছিলেন, নবীনচন্দ্রের আত্মীয় রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী ভুবনমোহিনী দেবী কবিতাগুলির প্রকৃত লেখিকা। কিন্তু একটু অবহিত হলেই 'সাধারণী' সম্পাদক বুঝতে পারতেন যে, কাব্যগুচ্ছটিতে নবীনচন্দ্রের স্বনামে প্রকাশিত অনেক কবিতা গৃহীত হয়েছিল। বিশেষতঃ উপহারপত্রে নবীনচন্দ্র রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়কে এই কথা লিখেছেন, "আমার আদরিণী ভুবনমোহিনী প্রতিভাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" কাব্যগুচ্ছ যদি রাধিকানাথের সহধর্মিণীর রচনা হত, এবং নবীনচন্দ্র শুধু সংস্কারক ও প্রকাশক হতেন, তা হলে তিনি ভুবনমোহিনীর স্বামীকে নিজের জবানীতে, বিশেষতঃ "আমার আদরিণী ভুবনমোহিনী প্রতিভাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম"—এরকম উক্তি কখনই করতে পারতেন না। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র ১ম ও ২য় ভাগের যাবতীয় কবিতা নবীনচন্দ্রেরই রচনা। শুধু

সম্পাদকের চোখে ধুলো দিয়ে ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্মনাম নিয়ে সহজে কবিতা প্রকাশ করার ইচ্ছায় তিনি এই সুচতুর পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। এরকম ঘটনা হাল আমলেও অহরহ ঘটছে। স্ত্রীজাতির প্রতি অহেতুক কৃপাকরুণার জন্য কোন কোন পত্রিকা-সম্পাদক স্ত্রীলোকের নামস্বাক্ষরিত অনেক বাজে কবিতাকেও সেযুগের পত্রিকায় সাগ্রহে স্থান দিতেন, এযুগেও এ ঘটনা দুর্লভ নয়। এই দুঃখে অনেক বিখ্যাত লেখক প্রথম জীবনে বাধ্য হয়ে স্ত্রীলোকেব নাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ-বা অন্য কারণে পুরুষের নাম গোপন করে স্ত্রীলোকের নামেই বিখ্যাত হয়েছেন। অনিলা দেবী, নীহারিকা দেবী এবং অমলা দেবীর কথা পাঠকেব মনে পড়বে নিশ্চয়।

নবীনচন্দ্র নিজেই ভুবনমোহিনী দেবী সম্বন্ধে কিছু রহস্যের অবতারণা করায় সে-যুগেব মুগ্ধ পাঠক ও সম্পাদক—সকলেই 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'ব বচনাকাবকে স্ত্রীজাতীয়া মনে করে পরম পুলকিত হয়েছিলেন। সেযুগেব অনেক বিচক্ষণ পাঠক ভুবনমোহিনী দেবী স্বাক্ষরিত এই ধরনেব কবিতাগুলিকে মহিলার রচনা মনে করে 'দিল্লীকা লাড্ডু'কে সুমিষ্ট মোদকখণ্ড ভেবে 'বসচবণা' করেছিলেন। সেই হুজুগের ঢেউ কলকাতার সাহিত্যসমাজে বেশ কিছুদিন আলোড়ন তুলেছিল, এবং বালক রবীন্দ্রনাথও সে ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁদেব মজলিসেও এ ব্যাপাব নিয়ে আলোচনা চলত। এ বিষয়ে দীর্ঘকাল পবে তিনি 'জীবনস্মৃতি'-তে সর্বপ্রথম এ ঘটনার উল্লেখ করেন। এটি যদি তাব ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত না হত, তা হলে এ কাব্য নিয়ে আলোচনাব কোন অবকাশই ঘটত না। কারণ 'জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, "তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী-নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল।··· তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু[২১] আছেন- -তাঁহার বয়স আমার

২১. প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক ছিলেন।

চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহারবরূপে পাঠাইয়া দিতেন।[২২] এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল। আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর-সরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক আলোচনা লিখিলাম।" (জী-স্মৃ. পৃঃ ৭৫)

এখানে তাঁর প্রথম স্বাধীন সমালোচনা ও গদ্য রচনার ইতিহাস সম্পর্কে আর কিছুমাত্র সংবাদ নেই। তবে দেখা যাচ্ছে, 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'র ভাব ও ভাষার অসংযমের জন্য এগুলি স্ত্রীলোকের লেখা নয় বলে কিশোর-সমালোচকের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর কাছে ভুবনমোহিনী-স্বাক্ষরিত চিঠি দেখেও বালকের বিশ্বাস টলে নি। কিন্তু প্রবন্ধটিতে দেখা যাচ্ছে, কবি নারী কি পুরুষ, এমন কোন ইঙ্গিত নেই। যদিও কিশোর-সমালোচক তার তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও বুঝেছিলেন, এ কাব্য স্ত্রীলোকের রচনা হতে পারে না, কিন্তু প্রবন্ধ প্রমাণাভাবেই কি ছাপার অক্ষরে সে কথার কোন ইঙ্গিত দেন নি? বরং 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' যে স্ত্রীলোকের লেখা, তা ঐ প্রবন্ধে এক প্রকার স্বীকার করেই নিয়েছেন। এ বিষয়ে পরে আমরা আবার আলোচনা করব। মোটকথা 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি যাই বলুন, প্রবন্ধটি লেখার সময়ে এ কাব্যের কবি যে স্ত্রীলোক এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

তিনি দ্বিতীয় যে কাব্যখানির সমালোচনা করেছিলেন, সেটি

২২. ভুবনমোহিনীর স্বাক্ষরে প্রবোধচন্দ্র ঘোষকে এই চিঠি কে লিখতেন? নবীনচন্দ্র কি? এই উপহার কার হাতে পৌঁছাত? নবীনচন্দ্র এ-ও আত্মসাৎ করতেন নাকি?

সে-যুগের জনপ্রিয় কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসরসরোজিনী' (১ম ভাগ) কাব্য। এটি ১২৮৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরেই বোধ হয় এটি সমালোচনার জন্য 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রেরিত হয়। এর দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৯ সালে মুদ্রিত হয়।[২৩] রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম ভাগটি এসেছিল। কিশোর কবি-সমালোচক যখন এ কাব্যের কঠোর সমালোচনা করেন, তখন তাঁর বয়স পনের বৎসরের সামান্য বেশী, রাজকৃষ্ণ তখন সাতাশ বৎসরের যুবক এবং কয়েকখানি কাব্য রচনা করে তখনই কবিখ্যাতি লাভ করেছেন।[২৪] 'অবসরসরোজিনী'র কবিতা সে-যুগের প্রধান প্রধান সাময়িকপত্রে ('বান্ধব', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'আর্যদর্শন', 'মধ্যস্থ', 'সোমপ্রকাশ', 'এডুকেশন গেজেট,' 'সাধারণী' ইত্যাদি) প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিতান্ত কিশোরবয়সী রবীন্দ্রনাথ অকুতোভয়ে যশস্বী কবির বিরুদ্ধে কলমে শাণ দিয়েছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' কবিতাগুচ্ছ ১৮৭৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। বাগবাজারের বিখ্যাত নিয়োগী পরিবারে তাঁর জন্ম। 'সাধারণী', 'আর্যদর্শন'. 'বান্ধব'. 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁর অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য 'দুঃখসঙ্গিনী'র কোন কপি এদেশে নেই, শোনা যায় এক কপি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আছে। এ কাব্য ছাড়াও পরবর্তীকালে তাঁর 'বিনোদমালা' (১৮৭৮),[২৫] 'মালতীমালা' (১৮৯৯), 'সন্ধ্যামণি'

২৩. 'অবসরসরোজিনী'র ৩য় ও ৪র্থ ভাগও রচিত হয়েছিল, তবে সেগুলি পৃথক কাব্যাকারে মুদ্রিত না হয়ে তার গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে (১৮৮৫) এর তৃতীয় ভাগ এবং ৪র্থ ভাগে (১৮৮৯) এর চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। ১২৮৯ সাল থেকে তার গ্রন্থাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হয়, মোট সাত খণ্ড গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল।

২৪. 'অবসরসরোজিনী'র পূর্বে তার 'বঙ্গভূষণ' (১৮৭৪), 'মহন্তবিলাপ' (১৮৭৪), 'কবিতাকৌমুদী' (১ম—১৮৭৫, ২য়—১৮৭৫), 'ভারতে যুবরাজ' (১৮৭৫) এই কয়খানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২৫. ১৩০৫ সালে 'বিনোদমালা'র যে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে 'দুঃখসঙ্গিনী' ও 'বিনোদমালা'র কতকগুলি নির্বাচিত কবিতা স্থান পেয়েছিল।

(১৯২৬) প্রভৃতি গীতিকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র মূলতঃ প্রেম ও কামনারাগের কবি, দাম্পত্য স্নিগ্ধতার কবি। তাঁর সহধর্মিণীর নাম বিনোদকামিনী। 'বিনোদমালা'র মধ্যে স্ত্রীর নামটি রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কিশোরচিত্তের কাছে 'দুঃখসঙ্গিনী'র কবিতাগুলি মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।

৩

পনের বৎসরের কবিকিশোর কীভাবে তাঁর প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধে সাহিত্যবিচার করেছিলেন, কোন আদর্শের বশে কাব্যপ্রত্যয়ের দোষগুণ ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং সেই বয়সে সাহিত্য-বিশ্লেষণবুদ্ধি ও রসাস্বাদনশক্তি তাঁর কতটা আয়ত্ত হয়েছিল, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধটির বক্তব্যবিষয় এবং সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক।

প্রবন্ধটির এক-তৃতীয়াংশ সাধারণভাবে কাব্যসমালোচনা। কবি প্রথমে গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য এবং ইংরেজী lyric কবিতা আলোচনা করেছেন। ১২৮০ সালের (১৮৭৩) 'বঙ্গদর্শনে' নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী'র আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, বাংলা গীতিকাব্য সম্বন্ধে সেই হল প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। গীতিকবিতা যে ইংরেজী লীরিক কবিতার বাংলা রূপান্তর তা সে-যুগের ইংরেজী শিক্ষিত গীতিকবিরা অল্পাধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু এর লক্ষণ এবং অন্যান্য কাব্য থেকে এর পার্থক্য সম্বন্ধে প্রথম যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র— রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ লেখার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'র এ প্রবন্ধটি পড়েছিলেন বলে মনে হয়। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৭২) তখন রবীন্দ্রনাথ সবে বারোয় পড়েছেন। একটু বয়স বাড়ার

পর, তাঁরা অর্থাৎ বালকেরা বড়োদের পড়ার পর মাসিক বঙ্গদর্শন পড়ার সুযোগ পেতেন। 'জীবনস্মৃতি' থেকে দেখা যাচ্ছে, 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাস যখন ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন ঠাকুরবাড়ির বালকেরা ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতেন।[২৬] 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বাদশ সংখ্যার মধ্যে (১৮৭১-'৮৭৩) 'বিষবৃক্ষ' সমাপ্ত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ বারো বছরে পড়েছেন। চন্দ্রশেখর ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে ১২৮১-৮৩ ভাদ্র পর্যন্ত (১৮৭৩-১৮৭৪) মোট চৌদ্দ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের জুন মাসে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ-পনের বৎসর। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে বারো-তের বৎসর থেকেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি ('উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব') তাঁর দৃষ্টিপথে পড়েছিল। বঙ্কিমের অনেক-গুলি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' নামে ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। এর তিন মাস পরে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প যে, বঙ্কিমের গীতিকাব্য-সংক্রান্ত স্তুতি

---

২৬. এ বিষয়ে তিনি 'জীবনস্মৃতি'-তে বলেছেন, "অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পর বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।"—('জীবনস্মৃতি,' পৃ. ৬৪)

প্রবন্ধ তিনি পড়েছিলেন। গীতিকবিতা সম্পর্কে দেশীবিদেশী সাহিত্য থেকে তিনি যে তথ্যাদি সংগ্রহ কবেছিলেন, তাব অন্তরালে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুবাব প্রেবণা ছিল বলে মনে হয়, এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুবীব প্রেবণা ও উৎসাহ তাঁকে সমালোচকপদে ব্রতী কবেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৌঠাকুবাণী যেমন তাঁব বাল্যকৈশোব পর্বেব কাব্যবচনাকে উৎসাহেব বাবিসেকে অঙ্কুবিত হতে সাহায্য কবেছিলেন, তেমনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুবী ববীন্দ্রনাথেব বিদেশী সাহিত্য বসভোগ ও বসবিচাবেব শক্তিকে স্ফুটতব কবেছিলেন এবং তাঁব সমালোচক প্রতিভা বিকাশে পবোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভূত সাহায্য কবেছিলেন। ববীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে এ বিষয়ে একাধিকবাব উল্লেখ কবেছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি যা বচনা কবতেন, উৎসাহী সমঝদাব শ্রোতা অক্ষয়চন্দ্রকে শোনাতেন, কাবণ তাঁব মতামতেব বিশেষ মূল্য দিতেন।[১] 'জীবনস্মৃতি'ব পাণ্ডুলিপিতে ববীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃ স্বীকাব কবেছেন, "তাব সদ্য বচনাগুলি সবদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা কবিয়া আমাব তখনকাব বচনাবীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহাব লেখাব অনুসবণ কবিয়াছিল।" শুধু বচনাবীতিই নয়, ইংবেজী ও

১. 'জীবনস্মৃতি'—"বাল্যকালে আমাব কাব্যালোচনাব মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুবী মহাশয় জ্যোতিদাদাব সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংবেজি সাহিত্যে এম এ। সে সাহিত্যে তাহাব যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুবাগ ছিল। আবাব পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, বামপ্রসাদ, ভাবতচন্দ্র, হরুঠাকুব, বাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধব কথক প্রভৃতিব প্রতি তাঁহাব অনুবাগেব সীমা ছিল না। সাহিত্যভোগেব অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যেব চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুব সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদেব সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন কবিয়া তুলিত।" 'জীবনস্মৃতি'ব আব একস্থলে অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে এই বকম উল্লেখ আছে, "তখনকাব কালেব ইংবেজি সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদেব কাছে মূর্তিমান কবিয়া তুলিয়াছেন, তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন।" এ বিষয়ে ববীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়েব মন্তব্য (ব—জীবনী, ১ম, পৃ. ৫৮) দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে দীক্ষা, বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তিনি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করবার সময়েই (১৮৭৮) তিনি তেইনের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ[২৮] মনোযোগ দিয়ে পড়েন, এবং এর থেকে কিছু কিছু তথ্য নিয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখে সেগুলি 'ভারতী' পত্রে প্রকাশ করতে থাকেন।[২৯] গীতিকাব্য মহাকাব্য প্রভৃতির তথ্যগুলি তিনি অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে বোধ হয়, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধও তাঁর অভিমত গঠনে কিছু সাহায্য করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে লীরিক কবিতাকেই গীতিকাব্য বলেছেন।[৩০] গীতিকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি

২৮ তার পুরো নাম হিপ্পোলাইট অ্যাডলফ্ তেইন (Hippolyte Adolphe Taine—1828-93), ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ *Histoire de la litterature englaise* প্রকাশ করেন ১৮৬৩ সালে। এতে তিনি ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনচিত্ত প্রভৃতির প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ আলোচনা করেন। এরই ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেছেন যে, আমেদাবাদে অবস্থানকালে তিনি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে বললেন, "আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।" তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি, অ্যাংলো স্যাক্‌সান ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।" (জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ২০৪)

২৯. এর মধ্যে দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য : (১) স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫), (২) নর্মান জাতি ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬)।

৩০. "খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি।

বলেছেন, "বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" পরে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মানুষের আবেগের সবটা ব্যক্ত হয় না, যেটুকু ব্যক্ত হয় তা যখন ক্রিয়া (action) এবং সংলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তা হয় "নাটক-কারের সামগ্রী।" "যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী"। কিন্তু মহাকবি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় ব্যাপারকেই চিত্রিত করতে পারেন। আর একটু স্পষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও গীতি-কাব্যের প্রভেদ বর্ণনা করেছেন. "কিন্তু যে কাব্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতি-কাব্যের অধিকার।" পরে তিনি উপসংহারে বলেছেন, "যাহা ব্যক্তব্য তাহা পর-সম্বন্ধীয় কার্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়।" এই প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে, গীতিকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্য ও নাটকের কী সম্পর্ক এবং গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তা তিনি মোটামুটি নির্ণয় করতে পেরেছেন। কবির "ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র" যে কবিতার উদ্দেশ্য, তাই-ই গীতিকাব্য—এই হল তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত। পরে তিনি ব্যক্তব্য ও অব্যক্তব্য গুণ দুইটিকে যথাক্রমে নাটক ও গীতিকাব্যের লক্ষণ এবং মহাকাব্যে দুইয়ের লক্ষণ আছে বলে যে-মত ব্যক্ত করেছেন তা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। মনে হয়, তখন গীতিকাব্যের পুরো স্বরূপটা তাঁর কাছে ততটা আত্মপ্রকাশ করে নি। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেবে' তিনি গীতিকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যকে প্রাকৃতিক নিয়মের ফল বলে মেনে নিয়েছেন অনেকটা তেইনের মতো।[৩১] পূর্বভারতের "তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্বরা এবং তাহার উৎপাদ্য অসার তেজোহানিকর ধান্য।" ফলে "উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ

তন্মধ্যে একপ্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে।" ('বিবিধপ্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৪৭, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)

৩১. তেইন ১৮৫৮ সালে ফরাসী ভাষায় লেখা রচনাসংগ্রহ *Essais de critique et d' histoire* গ্রন্থে সাহিত্যকে বস্তু ও বিজ্ঞানেরই শাখা বলে

চরিত্রের অনুকরণে” যে গীতিকাব্যের সৃষ্টি হবে, এবং তাতে যে, “কোমলতাপূর্ণ, অতিসুমধ্ব দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়” থাকবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? এই সিদ্ধান্তের পর তিনি বাংলা গীতিকাব্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। “একদল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত কবিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়েরই দৃষ্টি কবেন।” এঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক বিদ্যাপতি। “জয়দেব যে প্রণয়গীত করিয়াছেন তাহা বহিরিন্দ্রিয়েব অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতিব কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদিব কবিতা বহিরিন্দ্রিয়েব অতীত।” তৃতীয় শ্রেণীব গীতিকবি'রা হলেন “ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী।” এঁদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হল—এঁরা শুধু কবি নন, “বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ।” বহু-দিকে বহুবিষয়ে তাঁদেব বুদ্ধি সর্বত্রগামিনী। কিন্তু “এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণেব লাঘব হইয়াছে”--বঙ্কিমচন্দ্র সে-বিষয়েও স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধে দেখা যাচ্ছে, বাংলা গীতি-কবিতাব প্রাচুর্যেব কারণ বাংলাব আদ্র ও উষ্ণ জলবায়ু। তাঁর কৃত গীতিকবিদের শ্রেণীবিন্যাস বেশ কৌতহলপ্রদ। একদল অর্থাৎ আধুনিক জীবনেব নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বাবা কবিতাকে অলঙ্কৃত কবতে চান। এখানেও দেখা যাচ্ছে, গীতিকবিতাব উৎপত্তিব জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তেইনের মতানুসারে শুধু প্রাকৃতিক কারণেব ওপব গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে তিনশ্রেণীব গীতিকবিতাব কথা বলেছেন,

গ্রহণ করেছিলেন। এই তত্ত্বকথার ভিত্তিতেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রস্তুত হন। বঙ্কিমচন্দ্র ‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে প্রায় তেইনের মতের প্রতিধ্বনি কবে বলেছেন, “সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল।...সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।...যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজ-বিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।” (বিবিধপ্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৫৩)

তার মধ্যে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কবিরাই বিশুদ্ধ গীতিকবি। প্রকৃতির চিত্র বা জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। "মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাবসকল", যাকে তিনি "অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য" বলেছেন—যখন সেই সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি কবির রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়, তখন তাকেই গীতিকবিতা বলা যেতে পারে। কিন্তু কবির এই যে ব্যক্তিগত ভাব, যাকে subjectivity বলা হয়, যা না হলে যথার্থ গীতিকবিতা হয় না, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন হলেও গুরুত্ব সম্পর্কে ততটা অবহিত ছিলেন না। এই ভাবটিকে গীতিকবিতার একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করলে তিনি গীতিকবিদের তিন শাখায় বিভক্ত করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। এই পটভূমিকা মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলোচনায় প্রকাশিত গীতিকবিতা-বিষয়ক মতামতের স্বরূপ বোঝা যাবে।

২

প্রবন্ধটির প্রথমে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের সুখদুঃখের অনুভূতি কোন সঙ্গীর কাছে প্রকাশিত হলে তবে শান্ত হয়। এখনও-বা সেভাব সঙ্গীতের দ্বার প্রকাশিত হয়। "যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি।"[৩২] এখানে গীতিকবিতা ও সঙ্গীতকে কবি একই শাখার দুটি সমজাতীয় ফুল বলে মনে করেছেন, "গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য···গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মনের বেগ প্রকাশের জন্য মানুষ সঙ্গীতের সাহায্য

৩২. 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী,' রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১০৬ (এই প্রবন্ধের পৃষ্ঠাঙ্ক

নেয়। প্রথম যুগে যাঁর মনে বেগ উপস্থিত হত তিনি তা প্রকাশের জন্য সঙ্গীতের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, তিনি হয়তো সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকণ্ঠ নন। "কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন।" এইভাবে গানের সঙ্গে গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয় এবং "গীত হওয়া গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য" হলেও কবির নিজস্ব মনোভাব প্রকাশের ইঙ্গিত (বঙ্কিমের ভাষায় "ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা") গীতিকাব্য বলে পরিণতি হল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গীতি-কবিতা ও গানকে প্রথমে একই মর্যাদা দিচ্ছেন। সঙ্গীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করতে না পারলে আমরা আত্মপ্রকাশের জন্য গানের আশ্রয় নিই—এই বলে তিনি প্রবন্ধের সূচনা করেছেন। অর্থাৎ কবি-চেতনার সঙ্গে পাঠক ও শ্রোতৃমন অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে; নীরব কবিত্ব, নিজস্ব ভাবসম্ভোগের জন্য কবিতা লেখা, পাঠকসমাজের কাজ আড়িপেতে শোনা -কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথ এ সব জল্পনা বিশ্বাস করতেন না, উত্তরকালেও করেন নি। মহাকাব্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, যে-মহাবীর শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করেন, দেশের গৌরব বর্ধন করেন, তাঁর কীর্তিকাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্য রচিত হয়। মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিশোর-সমালোচক স্পষ্টভাবেই বলেছেন:

> "সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয় তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি।" পৃ. ১০৬

পরে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন যে, ঋগ্বেদের গানের জন্য রচিত শ্লোকগুলি ঋষিদের ভক্তির উৎস থেকে উত্থিত হয়েছিল। তাই গীতিকবিতার দ্বারাই বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল এবং গীতিকবিতার দ্বারাই ফরাসী বিপ্লবের মতো বিরাট

রবীন্দ্ররচনাবলীর এই খণ্ড ও সংস্করণ নির্দেশ করছে। এর পর যেখানে এই প্রবন্ধের উল্লেখ থাকবে এই সংস্করণ থেকেই পৃষ্ঠাঙ্ক ও উদ্ধৃতি দেওয়া হবে।)

রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এর পর তাঁর মতামত আরও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে :

> "গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেন না তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর হৃদয়ের অনুকরণমাত্র।"

এখানে তাঁর অভিমত বোধ হয় এই যে, মানুষ নিজের মনের কথা যতটা স্পষ্টভাবে বলতে পারে, অপরের মনের কথা ততটা পারে না। কাজেই মহাকাব্য, যাতে পরের হৃদয়ের কথা থাকে তা খানিকটা সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু তা কৃত্রিম শিল্প, অকৃত্রিম হৃদয়বাণী নয়—কিশোর সমালোচকের এই হল সুচিন্তিত অভিমত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মহাকবিরা ব্যক্তব্য ও অব্যক্তব্য উভয় বিষয়েই পারঙ্গম। মহাকাব্যকে কৃত্রিম শিল্প বললেও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন মহাকবিদের (ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, ভার্জিল) মহাকাব্যকে কৃত্রিম শিল্প বলেন নি। কারণ সেই সমস্ত মহাকবি প্রাচীনযুগে কৃত্রিমতার দ্বারা, ঢাকা-ঢাকা-গোপনীয়তার দ্বারা পরিচালিত হতেন না। "সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন।" এই মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, প্রাচীন মহাকাব্য যাকে Epic of growth বা আদি মহাকাব্য বলে, কবি তাকেই অকৃত্রিম মহাকাব্য মনে করতেন এবং পরবর্তীকালের Epic of Artকে কৃত্রিম শিল্পকলাসমন্বিত বলে একে কিছু নিম্নাসন দিয়েছেন এর প্রতি তাঁর মন প্রসন্ন ছিল না। গীতিকবি কি শুধু নিজ হৃদয় চিত্রিত করবেন? তার মতে প্রথমে নিজের হৃদয় চিত্রিত করতে গীতিকাব্যের উদ্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু কালে কালে শুধু নিজের হৃদয়ই নয়, "নিজের ও পরের মনোচিত্র নির্মিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না।" জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটি আরও একটু স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ" (বি. প্রবন্ধ. ১ম)। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ—দুজনেই গীতিকবিতার *motif* কিছু বাড়িয়ে দিতে চান। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে

শুধু নিজস্ব আবেগ নয়, তার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানও স্বীকৃত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শুধু নিজের মনোভাব নয়, পরের মনোভাবও গীতিকবিতায় স্থান পেতে পারে এবং স্থান না পেলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে না। যে কাব্যে আখ্যানের প্রাধান্য আছে গীতিরসপ্রবণতা সত্ত্বেও তাকে রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্য আখ্যা দিতে রাজী হন নি। 'মেঘদূত', *Lalla Rookh* প্রভৃতিকে তিনি খণ্ডকাব্য বলেছেন, বরং 'ঋতুসংহার', *Irish Melodies*, ওড, সনেট প্রভৃতিকেই যথার্থ গীতিকবিতা বলেছেন।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক কারণে এদেশের গীতিকাব্যের প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত আর্দ্রভূমির দেশ বাংলায় প্রচণ্ড পৌরুষের চেয়ে কোমলতাপূর্ণ গীতিকাব্যের প্রাধান্য স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাংলাদেশে পৌরুষ-বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্যের অভাবের কারণ :

> "বাংলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের করতলে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে। আমাদের ভাষাতে [illegible] গুণে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা, [illegible], [illegible] মহাকাব্যের নায়কের অন্য চিহ্ন [illegible] আদর্শ পাইবার যোগ্য নয়? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত, [illegible], স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালার হৃদয়ে নাই, সুতরাং [illegible] হৃদয়ে প্রেম [illegible] বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব চণ্ডীদাসের লেখা হইতে প্রেমের [illegible] নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে [illegible] হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে।" (পৃ ১০৭)

রবীন্দ্রনাথের এ অভিমতের মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধের বিশেষ প্রভাব আছে বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা তেইনের মতো বাহ্যিক কারণকে জাতির চরিত্র ও সাহিত্যের মূল প্রেরণা বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই একই প্রকার মত প্রকাশ করেছেন। মহাকাব্য কেন লেখা হয় না এবং বৈষ্ণবধর্ম ও

সাহিত্যের প্রাধান্য এদেশে ঘটল কেন, সে বিষয়ে তাঁর অভিমত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেই পরিপুষ্ট হয়েছে।[৩৩]

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালী-হৃদয়ে স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-হিতৈষণা প্রভৃতি কয়েকটি পৌরুষব্যঞ্জক কথা স্থান পেয়েছে এবং অনেক কবি সেই সমস্ত স্বভাবের বশে মহাকাব্য রচনা করতে ব্যস্ত হয়েছেন ; কিন্তু তাতে তাঁদের বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখা যাচ্ছে না। কারণ তাঁরা মানুষের রুদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ করার মতো নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা হারিয়েছেন। তাই "মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের শব্দছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে।"[৩৪] মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে পাশ্চাত্য ভাব ও সাহিত্যের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত অর্বাচীন বয়সে বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবিদের সমালোচনা করেছিলেন।

---

৩৩. "এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষ-শূন্য, অলস, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকলপ্রকার সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত-আটশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাড়াইয়াছে। এইজন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৫৫)। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অভিমত যেন বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি।

৩৪. অবশ্য মধুসূদন এর জবাব দিতেন এইভাবে : "If the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism?" (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' ; পৃ. ১২৩)

তাঁর মতে, বাংলা গীতিকাব্যে যে ক্রন্দনের রোল উঠেছে, তা কারও অনুকরণজাত নয়। পরাধীনতার যন্ত্রণাই গীতিকবিদের হৃদয়কে বেদনামথিত করেছে। "কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাতে ঢালিয়া দিতেছে" (পৃ. ১০৭)। অবশ্য কিশোর-সমালোচক এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে, জাতীয় ভাব ও স্বদেশপ্রেম নিয়ে গীতিকবিরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন। তাই তিনি ঈষৎ অপ্রসন্নচিত্তে বলেছেন, "এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসঙ্গীত লেখেন, তাহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই; তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সোপান হাস্যজনক।"

প্রবন্ধের এইটুকু হল কিশোর-সমালোচকের ভূমিকা। এখানে দেখা যাচ্ছে, কবি গীতিকবিতার মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা এবং মহাকাব্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে বহুলাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র (১ম) একটি প্রবন্ধের অনুসরণ করেছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, সেটকু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত। এই সময় থেকেই তিনি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন। পরে দেখা যাবে, তিনি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের তুলনা করে হেমচন্দ্রকেই প্রশংসার শিরোপা দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, তাঁর মতে গীতিকবিতা মানুষের হৃদয়-অন্তঃপুরের কবিতা। যেখানে কবি সেই একনিষ্ঠ হৃদয়বার্তা দিতে পারেন, সেখানেই তিনি গীতিকবি হিসেবে সার্থক হন। তবে গীতিকবিতাতে স্বদেশীভাবের বাহুল্য ক্রমে ক্রমে কৃত্রিমতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সে বিষয়েও কিশোর-সমালোচক প্রবীণ কবিদের সাবধান করে দিয়েছেন।

এর পর তিনি তিনখানি কাব্যের মধ্যে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ও 'অবসরসরোজিনী'র একসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র প্রতি কবির লেখনী তত নির্মম নয়, বোধ হয় এটি স্ত্রীলোকের রচনা বলে।[৩৫] পরবর্তীকালে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে 'ভুবনমোহিনী'কে মহিলাকবি বলে স্বীকার করতে চান নি, তাই নিয়ে তার বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তর্কাতর্কিও হয়েছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধে সেকথার কোন ইঙ্গিত নেই। এখানে তিনি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র কবিকে স্ত্রীজাতীয় বলেই ধরে নিয়েছেন। উক্ত দুখানি কাব্যের সম্পর্কে বলেছেন, "উহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক।" অবশ্য তখন রাজকৃষ্ণ রায়ের বয়স অন্ততঃ সাতাশ এবং রবীন্দ্রনাথ পঞ্চদশ বর্ষের কিশোর। যুবক রাজকৃষ্ণের 'অবসরসরোজিনী'র কবিতাগুলি এমনই অপরিণত যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেগুলি বালকের রচনা বলেই মনে হয়েছিল! অতঃপর দুখানি কাব্যের তুলনামূলক বিচার করে তিনি দেখালেন যে, ভুবনমোহিনীর কবিপ্রতিভায় শিক্ষাদীক্ষা ও পরিমার্জনার অভাব থাকলেও তাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও স্বাভাবিকতা আছে। "একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জিত

৩৫. 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, উক্ত কাব্য প্রকাশের পর এটি স্ত্রীলোকের রচনা মনে করে অনেকেই খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিশোর-সমালোচক কাব্যটিতে স্ত্রীহস্তের স্পর্শ পান নি। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি বলেছেন, "এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলোকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না" (পৃ. ৭৫)। কিন্তু প্রথম-প্রকাশিত এই প্রবন্ধে তিনি 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'র কবিকে নারী বলেই মনে করেছিলেন।

মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।” আর একজন অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ রায় “আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহাকিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে তাহার সৌন্দয নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন।” রাজকৃষ্ণ দু'একটি ইংরাজী কবিতার ভাব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু স্বীকৃতি দেন নি—তাই কবির এই ইঙ্গিত। পরে তিনি দেখালেন, ভুবনমোহিনী শুধু নিজের তৃপ্তির জন্যই কবিতা লিখেছেন, আর রাজকৃষ্ণ যশের জন্য কলম ধরেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে ভুবনমোহিনীর কবিতাই যথার্থ গীতিকবিতা- যদিও ততটা পরিমার্জিত ও শিল্পশ্রীময় নয়। হয়ত তিনি ততটা শিক্ষিতা নন, বিদেশী ভাবচুরিও তাঁর কম নয়। ভুবনমোহিনী সরল, অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ যাকে বলে sincere। সুতরাং তার অস্ফুট কবিতাগুলির জন্য কবি তাকে খুব প্রশংসা করেছেন। অবশ্য এই আলোচনা পড়ে আসল আসামী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভুবনমোহিনী দেবীর অন্তরালে বসে মৃদু হাস্য করেছিলেন বোধ হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ হেরিকের *The Wounded Cupid* এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মধুমক্ষিকাদংশন' এবং মুরের *Irish Melodies*-এর অন্তর্গত তটিনীবিষয়ক কবিতা ও রাজকৃষ্ণের 'প্রবাহে চালয়া যাও আয় লো তটিনী'র তুলনা করে বলেছেন যে, এই “কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!” অবশ্য এ প্রশংসার পিছনে একটি মারাত্মক হুল আছে—“কু-কবিরা প্রায় যেখানে অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন…।” অর্থাৎ 'কুকবি' রাজকৃষ্ণ যেখানে নিজের কথা বলতে গেছেন সেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, যেখানে ইংরেজী কবিতার অনুবাদ করেছেন, সেখানে খানিকটা সফল হয়েছেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ 'অবসরসরোজিনী'র কবিকে চূড়ান্তভাবে আক্রমণ করে লেখেন, “তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে, কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই।…সরোজিনীর মধ্যে রূপকতুলনার

কৌশল-বাক্যের আড়ম্বর আছে কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না।" অপর দিকে "ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বদ্ধ রচনা অনেক আছে, তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, যে-কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে, যা অকৃত্রিম হৃদয় থেকে জন্মলাভ করে, তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ না হলে বা তাতে রচনাগত ভুলচুক থাকলেও তাকে যথার্থ গীতিকবিতা বলতে হবে। অবশ্য ভুবনমোহিনী স্ত্রীজাতীয়া বলে (অন্ততঃ প্রবন্ধ লেখার সময় কবির তাই ধারণা ছিল) তাঁর কবিতা সমালোচনা করতে গেলে তাঁর প্রতি কিছু পক্ষপাতিত্ব ঘটা স্বাভাবিক—"যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভাব চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি, তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না।" এখানে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' কোন পুরুষের রচিত কাব্য হলে এর দোষগুণ আরও নিস্পৃহভাবে বিচার করা যেত। "আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়।" এই মন্তব্যের পর তিনি এ কাব্যে উদ্ভটরসের গুটিকয়েক পংক্তি উদ্ধার করে বলেন যে, এগুলি হাস্যকর, অসঙ্গত ও উদ্ভট হলেও স্ত্রীলোকের লেখা বলে আমরা কিছু সহৃদয়তার সঙ্গে কবির অক্ষম রচনাগুলিকেও মেনে নিই। এই সমস্ত কবিতা, যার মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই, প্রাসঙ্গিকতার পারম্পর্যও যেখানে অনুপস্থিত এবং দুর্বোধ্য ব্যাপার অস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়, তাকে উচ্চস্তরের কবিতা ও সূক্ষ্ম দর্শনচিন্তা বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট —"অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে, তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির

উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না।" 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'য় এই দোষ অতি প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই দোষগুলি না থাকলে, কবির মতে, "কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, এই প্রবন্ধ সমালোচনাকালে, 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা' যে স্ত্রীলোকের লেখা এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহই জাগে নি। কারণ তিনি বলেছেন যে, এটি স্ত্রীলোকের লেখা বলে, অনেক সময় নিস্পৃহভাবে এর বিচার চলে না। সে-যুগে স্ত্রীলোকেরা কাব্য-ক্ষেত্রে দলে দলে আসতে আরম্ভ করেন নি। যাঁরা আসছিলেন তাঁরাও খুব সঙ্কুচিতভাবে বঙ্গবাণীর প্রাঙ্গণে অবস্থান করছিলেন। তাই মহিলাজাতির রচনার গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে সমালোচকেরা কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ও সহৃদয়তাব বশীভূত হয়ে পড়তেন, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে সে-ভাবের দ্বারা খানিকটা আবিষ্ট হয়েছিলেন তা স্বীকার করতে হবে। তা সে যাই হোক, বাল্যকালে তাঁর সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি যে কতটা সদাজাগ্রত ছিল, তা বোঝা যাবে ভুবনমোহিনীর দোষগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে। অবশ্য আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস, 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এঁকে স্ত্রীজাতীয়া বলেই মনে করেছিলেন। তাঁকে ছদ্মবেশী পুরুষলেখক বলে মনে করলে কখনই প্রশংসার সুর এতটা চড়িয়ে দিতেন না।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ও 'অবসরসরোজিনী'র কবিতাগুলির তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, একজনকে প্রশংসা এবং অপর-জনকে নিন্দা করার কোন কারণই নেই। দোষ-গুণ-ত্রুটি দুখানি কাব্যেই প্রায় একরকম। কৃত্রিমতা, ভাবাবেগের অসংযত বন্যা, ভারত, যবন প্রভৃতি স্বদেশভাবোদ্দীপক শব্দের বাড়াবাড়ি, প্রেম-প্রণয়ের নামে হাস্যকর আবেগ-উচ্ছ্বাস—দুখানি কাব্যেরই মৌলিক ত্রুটি। ভুবনমোহিনীকে 'সাধারণী'র অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং এডুকেশন গেজেটের ভূদেব যে এত প্রশংসা করেছিলেন, তার কারণ এটি

স্ত্রীলোকের লেখা বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল, অন্ততঃ ভূদেব কাব্যটিকে পুরোপুরি স্ত্রীলোকের লেখা বলে বিশ্বাস করতেন।

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র (প্রথম ভাগ) গোড়ার দিকে কিছু লীরিকভাবের রচনা আছে। 'অকৃতজ্ঞ শুক' কবিতায়

হায় অকৃতজ্ঞ শুক, কি বলিব তোরে ?
বেড়াতিস বনে বনে
বনজ বিহঙ্গ সনে,
কে তোরে ধরিল,—কে পুষিল আদরে ?

কিংবা 'জন্মভূমি' কবিতায় বিধবার বিষণ্ণ প্রতীকমূর্তি :

ঐ যে মলিন মুখে,
- দ্বাদশ বর্ষের ওটি বিধবা বালিকা '
'পিপাসাকাতরা অতি .
মাটিতে অঞ্চল পাতি,
শুয়েছে দুঃখিনী যেন, (শুখান নলিকা) ।
হায় রে, তুমুল ঝড়ে,—
ফুলদল ছিন্ন করে
পথে ফেলায়েছে শূন্য করি বৃক্ষশাখা,
(কেউ দেখেনাক' ওটি নিতান্ত বালিকা ।)

'আর্যসঙ্গীতে'র এই কয় পংক্তি :

কে আমি ? আমি কি সেই আর্যবংশধর ?
পশিয়া দানব সনে অতুল তুমুল রণে
কাড়ি বৈজয়ন্ত হারি মর্ত্যে অধিষ্ঠান—
হইয়া যাঁদের স্থানে সশঙ্ক কম্পিত প্রাণে
আশ্রয় লইয়া তবে রেখেছে সম্মান
... ...
কে আমি ? আমি কি সেই আর্যের সন্তান ?

কিংবা 'বাঙালীর জ্ঞানালোক' কবিতার কয় ছত্র :

পতঙ্গ উড়িতেছিল আপনার মনে,
ঈষৎ বাতাস ঘায় ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা যায়
উঠে ক্ষণে, পুনরায় উধাও গগনে।

এগুলির রচনাভঙ্গিমা যত কাঁচাই হোক, এর আবেগের মধ্যে কিছু আন্তরিকতা আছে। কিন্তু কবি অনেক স্থলে এমন হাস্যকর উক্তি করেছেন, কৃত্রিম আবেগ-আস্ফালনের বাড়াবাড়ি করেছেন যে, এ কাব্য স্ত্রীলোকের রচনা বলে প্রতীতি হলেও কবিকে অতি অল্পস্থলেই সহ্য করা যায়। এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী' থেকেই সেই ত্রুটির শুরু হয়েছে। পিঞ্জরবন্দিনী বিহঙ্গিনীর কথা বলতে বলতে পরাধীন ভারতের কথা কবির মনে পড়ে গেছে এবং তৎক্ষণাৎ বীররসে মত্ত হয়ে লিখেছেন :

উন্মত্তা উলঙ্গী, ভয়দা ভীমাঙ্গা খর্পরে রুধির করিছে পান।
বদনে না ধরে   ধারা বেয়ে পড়ে,
কপোল হৃদয়ে যেতেছে বান।

কিংবা 'উন্মাদিনী' কবিতায় :

খুলে দে চিকুর খোল্ অসিধার!
খোল্ খড়্গ চণ্ড খোল্ তলওয়ার!
দে দে দগ্ধ মাংস   ঢাল্ সুরা ঢাল্!
ঢাল্ ঢাল্ ঢাল   ঢাল পুনঃ ঢাল্!
কাট্-কাট্-কাট   ধর্ পুনঃ ধর্।
ওই পলাইছে   ধর্ ধর্ ধর্!
ছিঁড়ি হৃদ্‌পিণ্ড   অসুরের মুণ্ড,
দে দে মুণ্ডমালা   মেখলা কাটির
দে-দে-দে রুধির   খর্পরে নাচি রে।

ইত্যাদি অংশে মুণ্ড নিয়ে যেরকম লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে তাতে কাব্য-প্রতিভা যথার্থই উন্মাদিনী হয়ে পড়েছে।[৩৬] এই ধরনের উৎকট ভাব

৩৬. পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে ভুবনমোহিনীর ভাব ও ভাষার মধ্যে যে ধরনের অসংযম লক্ষ্য করে এ কাব্যকে স্ত্রীলোকের রচনা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত হন নি, বোধ হয় এই ধরনের রচনাই সে মন্তব্যের লক্ষ্য। উক্ত প্রবন্ধেও এই কবিতাকে ('উন্মাদিনী') লক্ষ্য করে কবি লিখেছিলেন —"যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে, তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি!…একজনকে (বোধ হয় কবির

স্বদেশিয়ানা যে কত হাস্যকর হতে পারে, তা নবীনচন্দ্রের 'ভাবতে গোলাপ' থেকে বোঝা যাবে :

কি ওটা? গোলাপ। ছি, ছি, ছুঁও না, ছুঁও না ভাই
ছুঁও না, ছুঁও না।
দেখিতে সুন্দর হোক সুগন্ধ যদিও বোক,
অস্পৃশ্য। উদ্যানে উহা রাখা হইবে না ভাই।
রাখা হইবে না।
... .
ছুঁতে না কদাপি তুমি যদ্যপি জানিতে ভাই
যদ্যপি জানিতে।
যবনের অসিঘাতে আর্যদের রক্তস্রোতে
ভাসিয়া এসেছে উহা দেশান্তর হতে হায়
দেশান্তর হতে।
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডুবেছে সুখের তরী
দুর্দশাসাগরে।

কাব্যটি পুরুষের রচনা বলে রবীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিত হলে এ সমস্ত পংক্তি তুলে রাজকৃষ্ণের মতোই 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র কবিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করতে পারতেন। অবশ্য দুটি-একটি কবিতায় বিশুদ্ধ গীতিরসের ব্যঞ্জনা আছে, যার প্রশংসা করা চলত। যেমন 'শারদীয় প্রদোষ' কবিতাটি :

শারদী পূর্ণিমা প্রদোষ মাধুরী
হেরিয়া মজিল প্রাণ মোর।
উথলিল হৃদে নব প্রবাহ
ধর ধর প্রেমে হয়েছি ভোর।

বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু প্রবোধ ঘোষ) উন্মাদিনী কবিতার অর্থ বুঝাইতে বলি, তিনি কহিলেন, আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারিব না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি মাধুর্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্ভব প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে।" (পৃ. ১১১)

স্থখে টলমল ঢল ঢল ঢল,
বলিতে পারি না ভাবের ভরে,
বলিতে পারি না কি হল সহসা
কে বুঝে, কে শোনে, কে ধরে মোরে।
দেখে যা রে তোরা, দেখে যা, দেখে যা
কি ছিনু, কি হনু, কি হল মোর,
শোকতাপ জরা মরণ ভুলেছি
এ স্থখের বুঝি নাহিক ওর।

এতে আমরা 'প্রভাতসঙ্গীতে'রই যেন অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছি। ভাবের তারল্য এবং ভাষার ঢিলেমি সত্ত্বেও এটি বিশুদ্ধ গীতিকবিতার পর্যায়ে খানিকটা পৌছে গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথেব 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র রীতিটি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'র প্রথম কবিতা "পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী"র প্রভাবে পরিকল্পিত।[৩৭] এ ধরনের বাহ্যসাদৃশ্য আবিষ্কার কিছু দুরূহ নয়। সত্যই 'ভুবনমোহিনী'র কোন কোন কবিতার আবেগ ও ভাববস্তু 'প্রভাতসঙ্গীত', কোথাও-বা 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র দোসর বলে মনে হবে। এইজন্যই বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও এ কাব্য রবীন্দ্রনাথকে কিছু আনন্দ দিয়েছিল। এ কাব্যের নানা স্থানে হাস্যকর আতিশয্য থাকলেও শুধু এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কবিকে একটি মূল্যবান সুপারিশপত্র দিয়েছেন—"ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত…।" এর গূঢ় কারণ, একই সময়ে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' রবীন্দ্রনাথের যে 'বনফুল' আখ্যান-কাব্য এবং 'প্রলাপ' নামে কবিতা-গুচ্ছ প্রকাশিত হচ্ছিল, তাতে কিশোর কবির হৃদয়াবেগ কতকটা এই পথই নিয়েছিল। তাঁর 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছের :

গিরির উরসে নবীন নিঝর।
ছুটে ছুটে ওই হতেছে সারা।

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা) পুস্তিকার ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে
পাগল তটিনী পাগল পারা।

... ...

আয় কল্পনা আয় লো দুজনে
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগৎ ফিরিয়া
হরষপুলকে দিবসরাতি।

('জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' অগ্রহায়ণ ১২৮২)

কিংবা—

ঢাল্ ঢাল্ চাঁদ আরো আরো ঢাল্
সুনীল আকাশে রজতধারা।
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগল পারা।

'বনফুলে'র অনেক স্তবকে অনাবৃত প্রাণের অনলঙ্কৃত ভাষায় কিশোর কবি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, ভুবনমোহিনীর দু'চারটি কবিতার কোন কোন অংশে তার কিছু পূর্বসূচনা আছে বলে সহধর্মিতার জন্য কাব্যটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ ততটা নির্মম হতে পারেন নি, যতটা হয়েছেন রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসরসরোজিনী'র প্রতি।

'অবসরসরোজিনী'র প্রথম ভাগ[৩৮] প্রকাশের পূর্ব থেকেই রাজকৃষ্ণ রায় কবি বলে কলকাতার সাহিত্যসমাজে কিছু পরিচিত হয়েছিলেন। এ কাব্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে (১২৮৩) বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছিলেন, "কবিতাগুলি অবসরক্রমে লিখিত বলিয়া এই পুস্তকখানির উল্লিখিত নাম দেওয়া গেল।...অবসর-সরোজিনী আমার নিতান্ত আদরের ও যত্নের ধন।..."

কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই স্বাদেশিক ভাবে বিভোর হয়ে লেখা। 'অশনিপতন', 'ভারতবিলাপ', 'একটি কুসুম', 'কালের

৩৮. নামটি বোধ হয় নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী'র (১ম ভাগ-১৮৭১, ২য় ভাগ-১৮৭৮) আদর্শে পরিকল্পিত।

শৃঙ্গবাদন', 'শুক-পক্ষী' প্রভৃতি কবিতায় বাচনভঙ্গিমা ও ছন্দ অনেকটা সংযত হলেও স্বদেশিয়ানা অতি উগ্র হয়ে কবিত্ব মাটি করেছে :

ধীরে ধীরে যায় ফিরি ফিরি চায়,
কে রে ও রমণী ধূলিমাখা গায়,
কাঁপে থর থর ব্যাকুল ক্ষুধায়
দু'পা না যাইতে বসিয়া পড়ে।

কিংবা—

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল।
ভারতবাসীর সকলি টুটিল।
দৈবের বিপাকে ভারতমাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হল।

কিংবা—

তারপর পুণ্যভূমি ভারতে যবন
যবে প্রবেশিল হয়ে লোভের অধীন,
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
(কোথা স্বর্গসুখ তার কাছে সমীচীন ?)

ইত্যাদি উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে, এঁর ছন্দ ও বাক্‌রীতি 'ভুবন-মোহিনী'র কবির চেয়ে কিছু পরিপক্বতা লাভ করেছে, কিন্তু ভাবের ও আবেগের দিক থেকে সেই একই ধরনের দুর্বলতা রয়ে গেছে। এমন কি দু'একটি ভালো কবিতাতেও স্বদেশপ্রেমের অনাবশ্যক উত্তাপ বা হতাশা সঞ্চার করতে গিয়ে কবি তার জাত মেরেছেন। 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি নিতান্ত মন্দ নয় :

কে লো অয়ি বিজনবাসিনী ?
সে কথাটি কহি আমি সে কথাটি কেন তুমি
জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভাষিণী,
কে লো অয়ি বিজনবাসিনী ?

গীতিকবিতার বিষয় ও প্রকাশের দিক থেকে এটি রসোত্তীর্ণ হতে পারত। কিন্তু এর শেষাংশে তিনি পরাধীন ভারতের হতাশের সুর

সংযোজিত করে এর রস একেবারে নষ্ট করে ফেলেছেন। জড়িত-ভাষিণী প্রতিধ্বনি কবির প্রশ্নের উত্তরে বলল,

'আমায় হৃদয় ব্যথা মিলিত দুখের কথা
(নবজীবনের হায়, বিষাদের খনি।)
কহিলেক জড়িতভাষিণী ;
মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখশশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চিরতরে, ভারত সেদিন ধরে
স্বর্গচ্যুত হয়ে মগ্ন নরক ভিতরে।'

এর পর রাজকৃষ্ণ পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দুর্যোগের বৃত্তান্ত একে একে তুলে ধরেছেন। ফলে কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। এটি সে-যুগের গীতিকবিতার একটা সাধারণ ত্রুটি তথা লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে।[৩৯] হেমচন্দ্রের 'পদ্মের মৃণাল' 'কুহুস্বর' ('কবিতাবলী'—১৮৮০) প্রভৃতি কবিতার লীরিকগুণ পরাধীন জাতির মর্মবেদনার ভারে অনাবশ্যক পীড়িত হয়েছে। রাজকৃষ্ণের কাব্যের অনেক কবিতা এই মারাত্মক ত্রুটির জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য এ ধরনের দুটি-একটি কবিতা নিতান্ত মন্দ হয় নি। যেমন :

অমল কমল দুটি ঐ যে রয়েছে ফুটি
ও দুটির রূপে আজি রূপবতী সরসী,
যাই, লো, সাঁতার দিয়া ওই দুটি আনি গিয়া,
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি এইখানে প্রেয়সি।

৩৯. অবশ্য দু'এক স্থলে রাজকৃষ্ণের স্বদেশীভাব কবিতার মধ্যে ভালই হয়েছে :

রবির কিরণে চাঁদের কিরণে
আঁধারে জ্বালায়ে মোমের বাতি,
সবে উচ্চরবে যারে তারে কবে,
ভূতলে বাঙালী অধম জাতি।

'অবসরসরোজিনী'র এরকম স্বদেশীকবিতা নিতান্ত মন্দ হয় নি।

কিংবা

প্রণয়পূরিত হরিণনয়নে
চেওনা চেওনা আমার পানে,
আঘাত, কি জানি, আমার জীবনে
লাগিবে এখনি চাহনি বাণে।

বিধাতার তুমি মানসস্থজন
রমণীরতন ভুবনসার,
উজল শরতশশীর মতন—
তুমি লো, তুমি লো, কমলহার।

এর প্রথম চার-পংক্তি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের অনুবাদ-কবিতা 'হরিণ-গর্বমোচনলোচনে কাজল দিও না সরলে' স্মরণ করিয়ে দেবে এবং দ্বিতীয় চার-পংক্তিতে 'সারদামঙ্গলে'র কবির প্রভাব ('সারদামঙ্গল আর্য-দর্শনপত্রে ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়) লক্ষ্য করা যাবে। যাই হোক, এ রকম দু'চারটি স্নিগ্ধ লীরিক পংক্তি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। রাজকৃষ্ণের কবিতাবিষয়ক মতামত যতই অপরিপক্ক হোক না কেন[৪০] এবং কোন কোন কবিতায় তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে যতই "ভারত, একতা, যবন" বলে চিৎকার করুন না কেন, তাঁর প্রেম ও বিষণ্ণতার কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'কৃত্রিমতা' ও 'আড়ম্বর' দেখলেও সেগুলি কিন্তু মোটামুটি রসোত্তীর্ণই হয়েছে। কিশোর সমালোচক যাই বলুন, দু'একটি কবিতায় "অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই"—একথা পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। অবশ্য ইংরেজী কবিতার ভাববস্তু নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে, এবং "বাঙ্গালী ভায়ারা করি নিবেদন" প্রভৃতি অপদার্থ ছড়া লিখে রাজকৃষ্ণ কিশোর

৪০. 'অবসরসরোজিনী'র "খুল্লনা" কবিতাব পাদটীকায় রাজকৃষ্ণ এই মন্তব্য সংযোজিত করেছেন, "মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রকৃত কাব্যরসামোদীদের নিকট বঙ্গদেশের সেক্ষপীর (Shakespeare)।" এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, রাজকৃষ্ণের সাহিত্য-বিচারবোধ কত অপরিণত ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিকূল করে তুলেছিলেন। তাই তাঁর কোন কোন কবিতায় যে কিছু কবিত্বরস ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে নি। বোধ হয় পয়ার ও মাত্রাছন্দের কৃত্রিম বাঁধাবাঁধির জন্য ছন্দের মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের মন রাজকৃষ্ণের 'অবসরসরোজিনী'র প্রতি বিমুখ হয়েছিল। 'ভুবনমোহিনী'র অক্ষমতা-জনিত ভাঙা ছন্দকে ছন্দের মুক্তি মনে করে কবি তাঁর প্রতি প্রচুর প্রশংসা বর্ষণ করেছিলেন।

প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আর একখানি কাব্যের নিন্দা-প্রশংসা না করে শুধু স্তুতিবাদ করে উক্ত কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ইনি হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী। তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'দুঃখসঙ্গিনী' ১৮৭৫ সালে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর কাব্যখানি 'বান্ধব' (পৌষ, ১২৮১) ও 'আর্যদর্শনে' (ফাল্গুন, ১২৮৩) সবিস্তারে আলোচিত হয়, কবি প্রশংসাও লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "সরোজিনী ও প্রতিভা পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। 'দুঃখসঙ্গিনী'তে আর্যসঙ্গীত নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই।" (পৃ. ১১৩) হরিশ্চন্দ্র নিছক প্রেমের কবিতা লিখেছেন বলে যাঁরা ('বান্ধব' ও 'আর্যদর্শন') তাঁর কবিতার প্রতি কিছু বক্র কটাক্ষ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হরিশ্চন্দ্রের পক্ষ নিয়ে সেই সমস্ত সমালোচকের নিন্দা করেছেন, "এমন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে, প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না।" অর্থাৎ কবির মতে, 'দুঃখসঙ্গিনী'র অধিকাংশ কবিতাই যদি প্রেমের কবিতা হয় এবং সে প্রেমের কবিতা যদি "নৈরাশ্যবিষাদজনিত অশ্রুজল" হয়, তা হলে কিশোর সমালোচক সে কবিতাকে শিরোধার্য করিতে রাজী আছেন,

এবং সেইজন্যই তিনি হরিশ্চন্দ্রের 'দুঃখসঙ্গিনী'কে এত প্রশংসা করেছেন। দুঃখের বিষয় কাব্যটির কোন কপি এদেশে সন্ধান করে পাওয়া যায় নি, এর এক কপি লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ছিল বলে শোনা যায়। সে-যুগের পত্রপত্রিকায় এ কাব্য সমালোচনা-কালে যে সমস্ত উদ্ধৃতি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিই আমাদের সম্বল। অবশ্য ১৩০৫ সালে তাঁর 'বিনোদমালা'র যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে 'বিনোদমালা'র প্রথম সংস্করণের কিছু এবং 'দুঃখসঙ্গিনী'র কিছু কবিতা একত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের অনেক কবিতার নাম ও ছত্র এমন বদলে গেছে যে, তাদের অনেক সময়েই পূর্বের বলে চেনা যায় না।

'দুঃখসঙ্গিনী'র ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে প্রশংসা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন, "দুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি—তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে।" উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধে তিনি হরিশ্চন্দ্রের সুন্দর, স্নিগ্ধ, বেদনানিষণ্ণ কবিতার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলে ভালো করতেন। কিন্তু পত্রিকার পৃষ্ঠা-স্বল্পতার জন্য তিনি তা পারেন নি।[৪১]

এই কাব্য আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ স্থানাভাববশতঃ স্বল্পকথায় সেরেছেন। মাত্র উপসংহারে একটি অনুচ্ছেদে তিনি 'দুঃখসঙ্গিনী' সম্বন্ধে সপ্রশংস উক্তি করেছেন। প্রবন্ধটির এক-তৃতীয়াংশ গীতি-কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা, কিছুটা 'ভুবনমোহিনী'র প্রশংসা ও সমালোচনা এবং রচনার অনেকটা অংশ রাজকৃষ্ণের কাব্যের তীক্ষ্ণ আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে। মাসিকপত্রের ক্ষীণকায়া স্মরণ করে কবিকে 'দুঃখসঙ্গিনী' প্রসঙ্গে রাস টানতে হয়েছে। ফলে ভালো করে

৪১. রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য,—"এই পুস্তকের মধ্য হইতে আমরা অনেক সুন্দর পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে পারিলাম না।"

বিশ্লেষণ করতে পারেন নি, একটিও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নি। কিন্তু কাব্যটির সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যপূর্ণ প্রেমের আন্তরিক আবেগ ও সংযত চিত্র এবং হরিশ্চন্দ্রের উচ্ছ্বাসবর্জিত সংহত বাক্‌রীতি তাঁর যে চিত্তহরণ করেছিল, তা তিনি মুক্তকণ্ঠেই উক্ত প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ হরিশ্চন্দ্রের এ কাব্য স্নিগ্ধ দাম্পত্যরসের বেদনামাধুরীপূর্ণ গীতিকবিতা হিসেবে কিছু সার্থক হয়েছে। সমসাময়িক সমালোচনায় উদাহৃত দৃষ্টান্ত থেকে এখানে কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

সে দিন প্রাণাধিক! ভুলিব কি আর!
ভুলিব কি সে প্রতিমা বিষাদমণ্ডিত—
সেই বেশ বিষাদিনী—
মনোদুঃখে পাগলিনী,
হৃদয়ের পটে মম থাকিবে অঙ্কিত।
সেই যে আমার পানে রহিলে চাহিয়া।
নীরবে সতৃষ্ণ আঁখি স্থাপিত আননে,
যাতনাবিকাশিনী
পতিহারা বরাঙ্গনী
সজল নয়নে চায় সুন্দর বদনে।

এখানে প্রেমের যে স্নিগ্ধ আবেগের রূপটি ফুটেছে, তাকে প্রশংসা করতেই হবে। তার দু'টি কবিতায় ঈষৎ উগ্র প্যাসনের স্পর্শও আছে:

অযত্নে বসনখানি পড়েছে খসিয়া,
বিবসনা পয়োধর[৩২], চারু বক্ষঃস্থলে,
মন্থর গমন ভরে
কাঁপিতেছে থরে থরে
খেলাইছে সমীরণ সলিল অঞ্চলে।

৩২ 'বান্ধবে'র রুচিবাগীশ সমালোচক এই স্তবকটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে 'বিবসনা' ও 'পয়োধর' শব্দ দু'টি উহ্য রেখে তারকাচিহ্ন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন।

কিংবা

যখন তোমায় ধরে প্রণয়ে চুম্বন করে
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলে রে,
যবে করে কর ধরি কহিতাম, প্রাণেশ্বরি !
আমার মতন সুখী নাহি ধরাতলে রে,
তখন জানি না হায় প্রণয় যে বিষময়
প্রণয়-অমৃতসাথে আছে হলাহল রে।

প্রভৃতি ছত্রগুলিতে প্রেমের ভোগ ও বিষণ্ণতা দুই-ই আছে, এবং এ বিষণ্ণতা লেফাফাদুরস্ত conventional নয়। এই বিষণ্ণতার বেদনারস, যা কবির নিজস্ব সামগ্রী হয়ে পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছে, তার সম্পর্কে 'আর্যদর্শনে'র সমালোচক যথার্থ বলেছেন, "আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বিষণ্ণতায় যদি কিছু সুখ থাকে, আমাদিগের কবি সে সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন। তিনি যে কেবল নিজে সেই সম্ভোগ করিয়াছেন এমত নহে, তাঁহার পাঠকগণকেও সেই সুখে সুখী করিয়াছেন।"[৪৩] অবশ্য "এই প্রণয়কবিতাগুলির প্রধান দোষ এই, ইহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয়সুখপর আদিরসে পরিপূর্ণ" বলে উক্ত সমালোচক হরিশ্চন্দ্রের কিছু নিন্দাও করেছেন। রচনার অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খল ভাবের জন্য সমালোচক কবির কোন কোন কবিতার ঈষৎ সমালোচনা করলেও প্রশংসা করেই উপসংহার করেছেন, "দুঃখসঙ্গিনীর যেখানেই পড়, ইহার রচনার এরূপ লালিত্য আছে যে, ইহার সেই স্থানই পড়িতে অতি মধুর লাগে।"

হরিশ্চন্দ্র প্রেমকে একাধারে passion ও গার্হস্থ্যরূপের মধ্যে দেখেছিলেন, ভাষার মধ্যে ক্লাসিক সংযম ছিল এবং বাক্‌রীতিটি যেমন অনাবশ্যক আবেগবাহুল্যবর্জিত, তেমনি আবার পরিমিত বাঁধাধরা। অবশ্য যুগধর্মের প্রভাবে তাঁর কবিতায় স্বদেশিয়ানা কিছু ছিল তাও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তার সংখ্যাও অল্প, উচ্ছ্বাস-আবেগও

৪৩. আর্যদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৩

মন্দীভূত। দু' একটি ঈশ্বরাভিমুখী কবিতা অন্তরের নিষ্ঠার দিক থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য :

তোমার কৃপায় নাথ
আসে মনোহরা উষা ত্রিদিবসুন্দরী,
শ্রীঅঙ্গে কুসুম পরি হেমথালা করে ধরি
গলে মৃদু চারুতম লাবণ্য লহরী।

তোমার কৃপায় সেই
বরষার কালে ঘন গরজে মধুর,
নব কাদম্বিনী মাঝে চারু সৌদামিনী সাজে
আবার বিপিনে নাচে প্রমত্ত ময়ূর।

এ রচনার আবেগ অনুচ্ছ্বসিত, রচনারীতিও আতিশয্যবর্জিত। সুতরাং কিশোর রবীন্দ্রনাথ যে 'দুঃখসঙ্গিনী'র প্রেম ও বিষণ্ণতার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত এই সমালোচনাটি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সমালোচনাক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করলেন। বস্তুতঃ এটি তাঁর প্রথম স্বাধীন নিবন্ধ। 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত গ্রহনক্ষত্রবিষয়ক প্রবন্ধটি তাঁর আরও আগের রচনা বটে, কিন্তু সেটিতে তাঁর নিজস্ব ভ.।-ভাঙ্গমা বিশেষ নেই, তাতে মহর্ষির কোন অনুচরের বা 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদকের হস্তক্ষেপ কিছু গাঢ়তররূপে ঘটেছিল বলে বিশ্বাস করি। যে যাই হোক, আমবা 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্য রচনা বলে ধরে নিলাম।

এই প্রথম রচনায় কবিকিশোর কিশোর-সমালোচক রূপে আবির্ভূত হয়ে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তাঁর বন্ধু তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন, "একজন বি. এ. তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন।" এই সম্পর্কে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে অনেক পরিহাস করেছেন, এবং উক্ত প্রবন্ধে যে বালসুলভ অতিরেক আছে তা

তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন—"খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ড কাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত।" প্রবীণ প্রসন্ন জীবনের মধ্যে বাস করে বাল্যকৈশোরের অপরিণত রচনার প্রতি কবির মৃদু পরিহাস উপভোগ্য। কিন্তু এর মধ্যে যে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী পরিপক্বতা আছে, বিচক্ষণ বুদ্ধির বিস্ময়কর বিশ্লেষণশক্তি আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সান্নিধ্যে[৪৪] কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনাবৃত্তিকে গঠিত করতে সাহায্য করেছিল। কৃত্রিম মহাকাব্যের তুলনায় কবি অকৃত্রিম গীতিকবিতার অনেক বেশী প্রশংসা করেছেন এবং সে গীতিকাব্যের লক্ষণ হিসেবে আবেগ ও প্রকাশের সারল্য এবং স্বাভাবিকতার ওপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তদানীন্তন কবিরা যেখানে আলঙ্কারিক বাহুল্য ও আবেগের কৃত্রিমতার আশ্রয়ে অসাথক দেশপ্রেমেব জন্য কখনও বিলাপ করেছেন, কখনও-বা হুঙ্কার দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই এই সমস্ত অতিরেককে তীব্রভাষায় নিন্দা করেছেন। অবশ্য সে দোষ তার বাল্যকবিতাতেও কিছু কিছু দেখা যাবে। দ্বাদশবর্ষীয় বালকরচিত 'অভিলাষ' এবং 'হিন্দুমেলার উপহারে' স্বদেশী ভাবের ব্যঞ্জনা আছে—বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতায় হেমচন্দ্রের স্বদেশী কবিতার স্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়বে। এমন কি

৪৪. রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত —"ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু তথ্য সংগ্রহ করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নিকট হইতে। অক্ষয়চন্দ্রই তাহাকে নানা কবির কাব্য অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম, পৃ. ৬৮)

তাঁর দ্বিতীয় কবিতা 'প্রকৃতির খেদে'ও প্রকৃতির জবানীতে ভারতের দুঃখদুর্দশাই বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] তবে এই সময় থেকে তাঁর বাল্যকাব্যপর্ব ক্রমে কৈশোরে উদ্বর্তিত হয়েছিল, এবং ভারতপ্রেম ও স্বদেশিয়ানার সুলভ উচ্ছ্বাসের স্থলে বিরহমিলন, স্নেহপ্রীতির সহজ রস ও বেদনার আবেগ কবির কাব্যতরণীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তার প্রথম পরিচয় ঐ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রেই পাওয়া যাবে। এই পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই (১২৮১) 'বনফুল' নামে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক আখ্যানকাব্যের প্রথম সর্গ এবং 'প্রলাপ' নামে কবিতাগুচ্ছ (এতে কবির নাম ছিল না) প্রকাশিত হয়। যে সংখ্যায় 'বনফুল' সমাপ্ত হয় (১২৮৩, আশ্বিন কার্তিক) সেই সংখ্যাতেই 'ভুবনমোহিনী' ইত্যাদি প্রবন্ধটি পুস্তক-পরিচয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। 'বনফুল' কাব্য একটি ব্যর্থ প্রেমকাহিনী এবং ত্রিভুজ প্রেমকাহিনী। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' আখ্যানকাব্য ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটি টমাস পার্নেলের (১৬৭৯-১৭১৮) *Hermit* কাব্যের ছায়াবলম্বনে রচিত। বাল্যকৈশোরে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর দ্বারা সা...য়

৪৫. 'প্রলাপ' ...র ... নর্মদাবর্ণনায় মুখর হয়েছে। কিন্তু সরস্বতীদেবী যথারীতি পরাধীন ভারতের কথা স্মরণ করে এইভাবে শোক করতে লাগলেন:

> আয় রে প্রলয় ঝড় গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
> ধূর্জটি! সংহার-শৃঙ্গ বাজাও তোমার॥
> প্রভঞ্জন ভীমবল খুলে দাও বায়ুদল,
> ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
> ভারতসাগর শুষি উঠুক বালুকারাশি,
> মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ॥

এমন কি বালক-কবি হিন্দুর দুঃখদুর্দশার কথাও ভেবেছেন:

> কে নিভাল সেই ভাতি, ভারতে আঁধার রাতি
> হাতড়ি় বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।

('তত্ত্বোধিনী', আষাঢ়, ১৭৯৭ শক)

প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেকথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। 'উদাসিনী'র কিছু কিছু প্রভাব 'বনফুলে'ও আছে, এমন কি দু'চার পংক্তির আক্ষরিক সাদৃশ্যও চোখে পড়বে। যাই হোক 'বনফুলে' যে নিসর্গচেতনা ও সরল জীবনযাপনের pastoral চিত্র ফুটে উঠেছে এবং রোমান্টিক প্রেমের ভাবাবেগে-উচ্ছল অথচ passion বর্জিত যে চিত্র আছে, 'ভুবনমোহিনী' ইত্যাদি আলোচনার সময়, কাব্যরচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সেই ভাবধারাগুলি তাঁকে তখন আচ্ছন্ন করে ছিল। প্রকৃতির বুকে মানুষের আশ্রয়, স্নেহপ্রেমের সারল্য ও তারল্য, প্রেম-প্রণয়ের স্নিগ্ধতা ও বিষাক্ততা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যখন তিনি 'বনফুল' লিখে চলেছেন, তখন তারই সঙ্গে রচিত হচ্ছে 'প্রলাপ' গুচ্ছের কবিতা, যেখানে কবি আর আখ্যানকাব্যের কৃত্রিম ও পোশাকী প্রেম-প্রণয়ের মান-অভিমান সহ্য করতে পারছেন না, বিশুদ্ধ গীতিকবিতার দিকে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। যে গীতিকবিতা এখনও তাঁর রচনায় ততটা স্পষ্ট-ভাবে ফুটে ওঠে নি, সেই গীতিকবিতার মূল বৈশিষ্ট্য কি, সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই তাঁর চিন্তাপ্রণালী সুগঠিত হয়েছে। রসোত্তীর্ণ গীতিকবিতা রচনার পূর্বেই গীতিকবিতার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন হয়েছেন—এটাই বিস্ময়কর। উক্ত সমালোচনা-প্রবন্ধটিতে বালকোচিত উচ্ছ্বাস, অতিকথনের প্রগল্‌ভতা এবং বিষয়বহির্ভূত অপ্রাসঙ্গিকতা থাকলেও সাহিত্যবিচারের জন্য মনকে যে সবদা সচেতন রাখতে হয়, আবেগের জলাজমি ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগার একরোখামি থেকে বুদ্ধিকে নির্মুক্ত করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটিতে তার পূর্বাভাস দেখা গেছে বলেই তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসার প্রথম সোপান হিসেবে এটির ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসা এবং সাহিত্যবিচারের মূল্যমান হিসেবে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি অনাবৃত হৃদয়ের অবারিত উৎসার ও ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের একনিষ্ঠ ঐকান্তিকতার ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একেই গীতিকাব্যের প্রধান উপাদান বলেছেন। তাঁর বালককালের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী

কালের জটিলতর পরিবেশ ও গভীরতর সমালোচনার ক্ষেত্রে আরও বৈচিত্র্যময় ও সুগঠিত হয়েছে, কিন্তু এখানে যে মূল বীজটি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, সেই প্রায় অলক্ষ্যীভূত বীজটি পরবর্তীকালে শতশাখা-বিস্তারী বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। বনস্পতির পরিচয় তার শাখাপ্রশাখা ও পত্রপল্লবে যতটা আছে, তার বীজাঙ্কুরে তার চেয়ে আছে অনেক বেশী। কিন্তু তা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই তাকে আমরা ভুলে থাকতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বাল্যরচনাটির মধ্য দিয়েই অনাগতকালের সাহিত্যজিজ্ঞাসা তাঁর মনে বীজাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এইজন্য এ বিষয়ে ঈষৎ বিস্তারিত আকারে আলোচনা করতে হল।

তৃতীয় অধ্যায়

মেঘনাদবধ কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ : ভারতী পর্ব

১

কৈশোরের সমাপ্তিকালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ধৃতাস্ত্র সমালোচকের বেশে আবির্ভূত হলেন। ইতিপূর্বে তিনি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে যে সমালোচনাটি লিখেছিলেন, তাতে কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণতা থাকলেও আক্রমণের পাত্রেরা তখনও সাহিত্যসমাজে ততটা খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। সুতরাং সে আক্রমণ কিছুটা বাজে খরচ হয়ে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়সে কিশোরকবি 'ভারতী' পত্রের প্রথম সংখ্যা থেকেই গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকিয়ে চললেন (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৪)। 'ভারতী'র ১২৮৪ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ এবং ফাল্গুন--মোট ছয় কিস্তির পত্রে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সংক্রান্ত তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ বছর পরে ১২৮৯ সালের ভাদ্র মাসের 'ভারতী'-তে (১৮৮২) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যুবক সমালোচক আবার একটি তীব্রতর প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশ। এই প্রবন্ধ দুটি থেকে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর ও যৌবন-কালের চিন্তাধারা ও সাহিত্যবিচারের মূল্যমান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা অনেকটা সহজ হবে।

ইতিপূর্বে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে তিনকবির মধ্যে দুজনের বিরুদ্ধে তীরন্দাজি করেছিলেন, তখন তাঁর সেই বালসুলভ সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দু'একটি প্রবন্ধ প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে ছায়া বিস্তার করেছিল। ভাব, আবেগ, সরলতা ইত্যাদি লক্ষণ ধরে কাব্য-বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েও কিশোর সমালোচক সাহিত্য বিচারের মূল মাপকাঠি কী হবে, সে বিষয়ে তখন বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে

পৌঁছাতে পারেন নি, পারা সম্ভবও ছিল না। 'হৃদয়তাপের ভাবে ভরা ফানুস' বালকচিত্ত তখনও মননের শিলাপথে নেমে আসতে পারে নি, উপরন্তু ভাবাবেগ ও বাষ্পীয় রোমান্টিকতা তাঁর বিচারবুদ্ধিকে অনেক স্থলে কুহেলিকাচ্ছন্ন করেছিল। মোটামুটি ভাবে, তাঁর চিন্তাপ্রণালী হৃদয়াবেগের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। তাই 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা', 'অবসরসরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনীকে' নিয়ে কবি ধূম্রসলিল-মরুৎপূর্ণ অনেক মেঘমালার সঞ্চার করলেও তখনও তা থেকে বর্ষণ শুরু হয় নি। কিন্তু 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র অল্প পরেই যখন 'ভারতী' প্রকাশিত হল, তখন মাত্র ষোল বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ একেবারে খোদ মাইকেলকে নিয়ে পড়লেন এবং প্রতি সর্গ ধরে, চরিত্র বিশ্লেষণ করে এবং ভাষা প্রয়োগের অসংখ্য দোষ দেখিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে এমন সমস্ত ত্রুটি আবিষ্কার করলেন এবং ছিদ্রের প্রতি নির্মম অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন যে, লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরের মধ্যে বোধ হয় মৃত মাইকেল চমকে উঠেছিলেন।

২

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (১৮৬১) প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর থেকেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী আলোচিত কবি হয়ে পড়লেন ; এর থেকেই তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব বোঝা যাবে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কোন কবি-লেখকই মধুসূদনের মতো একই সঙ্গে এত নিন্দা ও খ্যাতি পান নি। তিনি যে অভিনব মৌলিকতার অজস্র প্রবাহে বাঙালীর দীর্ঘ-কালপ্রসূত ভারতীয় হিন্দুসংস্কারকে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তার স্থানে পশ্চিমসমুদ্রতরঙ্গবাহী অদ্ভুত জীবনরসকে সঞ্চারিত করতে গিয়েছিলেন, সে যুগে তার যথার্থ স্বরূপ অনেকেই ধরতে পারেন নি, এবং তার ফলে অত্যন্ত কাছ থেকে নিস্পৃহভাবে সাহিত্যের যথার্থ মূল্য বুঝতেও পারেন নি। বিশেষতঃ উনিশ শতকের শেষার্ধে

জাতীয়ভাব ও স্বদেশিয়ানার আধারে যে জাগরণ হচ্ছিল, তাতে আর্য- ও হিন্দুসংস্কৃতিবিরোধী বলে অনুমিত কোন ব্যাপারই অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করতে পারে নি। সেই জন্য হিন্দুয়ানির একটি কল্পিত আদর্শ, যাকে নব্য হিন্দুসংস্কৃতি বলা যেতে পারে, তারই নিরিখে অনেকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রসপরিণাম বিচার করতে গেছেন এবং এসম্পর্কে এমন সমস্ত মন্তব্য করেছেন যে, কাব্যবিচারে তার অনেকটাই অযুক্তিযুক্ত ও অপ্রাসঙ্গিক। সে-যুগে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অব্যবহিত পরে দুজনে এর প্রথম আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিচার করেন। মধুসূদনের সতীর্থ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করে কবিকে ইংরেজীতে লেখা একটি সুদীর্ঘ পত্রে এর সমালোচনা পাঠিয়ে দেন।[১] পরে সেটি বাংলাতে প্রবন্ধাকারে তাঁর 'বিবিধপ্রবন্ধে' (প্রথমখণ্ড—১২৮৯) সংযোজিত হয়েছিল।[২] যে-বৎসর উক্ত ইংরেজী পত্র ক্ষুদ্র বাংলা

১. মধুসূদন রাজনারায়ণকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একখণ্ড পাঠিয়ে লিখেছিলেন, "I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours are equally anxious with me to hear what the great Midnapore-school master (তখন রাজনারায়ণ মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) has got to say about the first poem in the language." বোধ হয় এর পর রাজনারায়ণ 'মেঘনাদবধে'র দীর্ঘ সমালোচনা করে একখানি ইংরেজী চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এতে প্রশংসা ছিল যথেষ্ট, ত্রুটিগুলিও নিপুণভাবে দেখান হয়েছিল। চিঠি পেয়ে মধুসূদন লেখেন, "I could not help laughing when I first read your letter, and yet it pained me to think that my carelessness should cause such anxiety in a dear valued friend. I am not at all offended, old gentleman, with you. Your critique would make any man proud." ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী'-র ১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. এটি ১৮৭৭ সনে (১২৮৪) 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধের আকারে প্রচারিত হয়, সেই বৎসরই 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় লেখকের নাম গোপন করে কিশোর রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারই বৎসরখানিক পূর্বে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম খণ্ড (১৮৭৫, জানুয়ারি) এবং আরও কিছু পরে দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৭৭, সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়।

'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের পরেই কবির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর দলাদলি হয়েছিল। নব্যশিক্ষিতের একটা বড় অংশ মধুসূদনকে হোমর, মিল্টন ও গায়টের সমকক্ষ মনে করে 'মেঘনাদবধে'র উচ্চ প্রশংসা করতেন, কেউ-বা কাব্যের নানা দিক আলোচনা করে কেবল নিন্দাও করেছিলেন। তবে নানা আপত্তি সত্ত্বেও অনেকে কবিকে প্রশংসাই করেছিলেন। সেই প্রশংসা শুরু হয় 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হবার অল্প দিন পর থেকেই। এ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশের (১৮৬১ জানুয়ারি, ১২৭৬, ২২এ পৌষ) দিন কয়েকের মধ্যে (১৮৬১, ১২ই ফেব্রুয়ারি : ১২৬৭, ২রা ফাল্গুন) কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধিত করা হয়। বোধ হয় আধুনিক যুগে গুণগ্রাহী বিদ্বজ্জনের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে এই প্রথম কবি-সংবর্ধনা। সেই সংবর্ধনায় কালীপ্রসন্ন কবিকে প্রশংসা করে যে মানপত্র পাঠ করেছিলেন, তাতে সাধারণভাবে তিনি কবির রচনার বিস্তৃত গুণকীর্তন করেছিলেন। মধুসূদন যে "অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা" লিখেছেন এবং বাংলা ভাষাকে "অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত" করেছেন, এটি কালীপ্রসন্নের কাছে "অলৌকিক" ও "অসামান্য কার্য" বলে মনে হয়েছিল। এর জন্য কবিকে যুবক কালীপ্রসন্ন "বঙ্গভাষার আদি কবি" বলে সম্মান করেছেন। এই মহাকাব্যের দ্বারা "একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা-ভাষায়" আবিষ্কৃত হল, এবং "পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা-ভাষা প্রচলিত থাকিবেক, তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে"—কালীপ্রসন্ন এই ভাবে ও ভাষায় কবিকে সংবর্ধিত করেছিলেন। অবশ্য অভিনন্দনে

সমালোচনা আশা করা যায় না। তবু দেখা যাচ্ছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কাব্য থেকেই যে বাংলা সাহিত্যের নবযুগ শুরু হল এবং যেজন্য তিনি মধুসূদনকে "বাঙ্গালা ভাষার আদিকবি" অর্থাৎ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি বলেছেন, তাতে তাঁর রসগ্রাহিতাই প্রমাণিত হয়েছে। এরপর হেমচন্দ্র ('মেঘনাদবধের' দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক), রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে দীর্ঘ সমালোচনা করেন। সেই সমস্ত সমালোচনায় মধুসূদনের বিচিত্র প্রতিভার প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি আবার জাতীয় ভাব বা হিন্দুভাবের হানি হয়েছে বলে অনেকে তাঁর রচনার তীক্ষ্ণ সমালোচনাও করেছিলেন। মধুসূদনের প্রথম সমালোচক তাঁরই বন্ধু ও সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণ বসু—সে-যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি, যিনি ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় সমাজেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন—তাঁর সমালোচনা ও সাহিত্যবিচারশক্তির ওপর মধুসূদনের বরাবর খুব বিশ্বাস ছিল। 'মেঘনাদবধে'র এক-একটি সর্গ রচনা করে মতামতের জন্য তা রাজনারায়ণকেই কবি পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁর মন্তব্যের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন। রাজনারায়ণ তিনবার 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনা করেছিলেন। প্রথমবার 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হলেই ইংরেজীতে সুদীর্ঘ পত্রাকারে কাব্যের দোষগুণ বিচার করে মধুসূদনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এটি বন্ধুমহলে প্রচারিতও হয়েছিল। পরে এটি বাংলায় 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা' নামে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (১৮৭৭) ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। তার পর তাঁর 'বিবিধপ্রবন্ধে'র (প্রথমখণ্ড, ১৮৮২) অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় (১৮৭৮) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'আত্মচরিতে'[৩] ('রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত'

৩ এই আত্মচরিতের ভূমিকায় প্রকাশক বলেছেন, "এই আত্মচরিতের যতদূর পর্যন্ত লিখিত হইয়াছিল, তাহার পরও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু ২৪।২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।" ১৮৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁর আত্মজীবনীতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাকাহিনী বিবৃত হয়েছে।

—১৯০৯) 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশিত হয়। এই তিনটি আলোচনা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮১ অব্দের মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। রচনা তিনটি বিভিন্ন সময়ের হলেও এর মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এ আলোচনায় প্রথমে তিনি 'মেঘনাদবধে'র ভাষা, ছন্দ, মৌলিকতা, কল্পনার উচ্চতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে মাইকেলের কবি-প্রতিভাকে উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত করেছেন।

> "বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার নির্বাচনশক্তি ও প্রয়োগনৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাহার 'মেঘনাদ বধ' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

এই হল তার স্থির সিদ্ধান্ত। মিল্টন ও বাল্মীকিকে কবি অনেকটা কৃতিত্বের সঙ্গে অনুসরণ করতে পেরেছেন বলে সমালোচক কবির প্রশংসা করেছেন। এর পর রাজনারায়ণ প্রত্যেকটি সর্গ ধরে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রশংসা কিছু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। মধুসূদনের এই কাব্যকে তিনি ইলিয়াদ, প্যারাডাইজ লস্ট্[৪] এবং স্থলবিশেষে বাল্মীকির মহাকাব্যের সমকক্ষ বলেছেন, কোথাও বা তাকে "বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে" আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি কবির কতকগুলি দোষ প্রদর্শনেও সঙ্কুচিত হন নি। রামের ভীরুতা ও কোমলতা, লক্ষ্মণের তস্করবৃত্তি, তার জন্য ফাঁকা দম্ভ এবং মিল্টনের শয়তানের সাক্ষাৎ প্রভাবে মাইকেল রাবণবংশাদির গৌরবময় চরিত্র অঙ্কিত করেছেন বলে রাজনারায়ণ তার প্রতিবাদ করেছেন।[৫] এরপর 'বাংলা ভাষা ও

৪. অবশ্য 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'তে তার মনোভাব একটু বদলে গিয়েছিল। সেখানে তিনি মিল্টনের তুলনায় মধুসূদনকে কিছু নিকৃষ্ট বলেছেন—"মিল্টনের যেরূপ ভাবের গম্ভীরতা, শব্দ বিন্যাসের রাজ-গাম্ভীর্য ও রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।"

৫. "কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি

সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় বলেছেন যে, প্রথমে মধুসূদনের অদ্ভুত প্রতিভায় হতচকিত হয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু "এক্ষণে নব প্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষসকল স্পষ্ট-রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।" সেই জন্য এই প্রবন্ধে প্রশংসার বহর কিছু কমিয়ে দিয়েছেন,

> "তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

সেই অসাধারণত্বের বৈশিষ্ট্য হল "ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য, কারুণ্য-রসের উদ্দীপন।" প্রধান দোষ—জাতীয় ভাবের অভাব, পাশ্চাত্য প্রভাবে হিন্দু আদর্শের হানি।

> "তিনি তাহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়।"

তাঁর এই উক্তি একদা খুব চলতি ছিল। মধুসূদন আর্যকুলরবি রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করে রাক্ষসদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ ও পক্ষপাত দেখিয়েছেন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুর শ্রদ্ধাস্পদ লক্ষ্মণকে দিয়ে নিতান্ত কাপুরুষের আচরণ করিয়েছেন, "ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে খর ও দূষণের মৃত্যু হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন"—প্রভৃতি বিজাতীয় ভাবের প্রতি রাজনারায়ণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমন কি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে অধিকতর জাতীয় ভাবাপন্ন কবি বলে রাজনারায়ণ তাঁকে মধুসূদনের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম সমালোচনার উচ্ছ্বসিত ভাব তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি তাঁর স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি খানিকটা খর হয়েছে তা অস্বীকার

যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইস্ট অপেক্ষা সেটান নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন।"

করা যায় না। তা না হলে খর-দূষণ সংক্রান্ত হাস্যকর মন্তব্য করবেন কেন? তাঁর মতে কবির পক্ষে তাদের সাক্ষাৎ স্বর্গবাস দেখান উচিত ছিল। এ ধরনের মন্তব্য রামগতি ন্যায়রত্নের লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করলে আমরা বিস্মিত হতাম না। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যে অতিশয় অভিজ্ঞ রাজনারায়ণের হিন্দুধর্মঘেঁষা এ ধরনের মন্তব্য আমাদের বিস্মিত করে। আসল কথা, সেকালে নব্য হিন্দুধর্মের বাড়াবাড়ির ফলে কাব্যসাহিত্যকে হিন্দুধর্ম নামক গজকাঠি দিয়ে মাপবার 'প্রক্রান্তিয়' নীতির প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল।[৬] 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩) এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'র (১৮৮৭)[৭] মনীষী রাজনারায়ণ 'মেঘনাদবধ' সংক্রান্ত দ্বিতীয় বারের আলোচনায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক হিন্দু সংস্কারের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে সঙ্কীর্ণ হিন্দুয়ানির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে মধুসূদনের রামরাবণাদি চরিত্র বিচার করতে গিয়ে আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

সাময়িক পত্রে 'মেঘনাদবধে'র প্রথম সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'। লেখক ছিলেন, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। সোচ্ছ্বাসে তিনি লিখেছিলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয় সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।" বিদ্যোৎসাহিনী সভায় তিনি যে মানপত্র পাঠ করেছিলেন

৬. 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনায় যেখানে যেখানে রাজনারায়ণ হিন্দুভাব পেয়েছেন সেখানে কাব্যটির বিশেষ প্রশংসা করেছেন—"এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু আচার প্রায় সকল স্থলে রক্ষিত হইয়াছে ।"

৭. এতে তিনি জাতির উন্নতির জন্য মহাহিন্দু সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন, "মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Eurasian And Anglo-Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপে হিন্দুদিগের একটি জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়।"

তার মাস তিনেক পরে এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তখন অনেকে মধুসূদনের এ কাব্য যথাযথভাবে পড়তেই পারতেন না, রসগ্রহণ তো দূরের কথা। অধিকাংশ পাঠকই এ কাব্যের নিন্দা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সেই সমস্ত নিন্দাকে লক্ষ্য করেই[৮] তিনি মধুসূদনের প্রতিভাকে হোমর, ভার্জিল ও মিল্টনের সমকক্ষ—কোথাও কোথাও তাঁদের চেয়েও উৎকৃষ্ট বলতে কুণ্ঠিত হন নি। বলা বাহুল্য এ-ও রাজনারায়ণের প্রথম সমালোচনার মতো 'নব প্রেমের মুগ্ধতা'বশে লেখা। তাঁর এই অতি-প্রশংসা নিয়ে সমকালীন *Indian Reformer* (খ্রীস্টান পাদ্রী লালবিহারী দে সম্পাদিত) এবং *Hindu Patriot*-এর মধ্যে কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের মাইকেল-প্রশস্তিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে *Indian Reformer*-এ মধুসূদনের নিন্দাবাদ প্রচারিত হয়।[৯] অবশ্য হরিশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Hindu Patriot*-এ *Indian Reformer*-এর

৮ "হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয়বন্ধুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে, তখন আমরা মনে মনে অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি।"

৯ "The Editors of the *Vividartha Sangraha*, in their blind admiration of Mr Dutt, prefer his poetry to that of Homer, Virgil and Milton We can only account for this singular perversity of taste by supposing that the gentlemen who have set themselves up as Judges on the Bengali republic of letters have never read intelligently a line of the Greek or Latin or English Bard." *Indian Reformer*-এর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যের জবাবে *Hindu Patriot* লিখেছিলেন, "Being neither Greeks nor Romans nor believers in the Mosaic account of creation, the Editors of the *Vividartha* need not blush if a Hindoo legend stirs up their feelings more than the poetry of Homer, Virgil and Milton"

অনুদার মন্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় এবং মধুসূদনের উচ্চ প্রশংসা করার জন্য 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'কে সমর্থন করা হয়। পরে এই নিন্দা-প্রশংসার সুর ক্রমেই চড়তে থাকে। মাইকেলকে তখন কেউ কেউ বাংলার মিল্টন বলতেন বলে সমালোচক তার নিন্দা করেছেন। মধুসূদনের সাহিত্যরচনা এত উচ্ছৃঙ্খল যে তিনি কাব্যসাহিত্যের কোন নিয়মকানুনই মেনে চলেন না। এরূপ উৎকট স্বেচ্ছাচারিতা শুধু গ্যয়টে-শেক্সপিয়রের ক্ষেত্রেই মানায়। কিন্তু "in a poetaster like Mr. Dutt, is simply intolerable." এই সমস্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যাঁরা মধুসূদনের দোষ দেখাতেন, তারা কবির বেপরোয়া স্বভাব এবং তাঁর রচনায় হিন্দু ও জাতীয় সংস্কৃতির অভাব এই দুটি ব্যাপারকে বরদাস্ত করতে পারতেন না।

১৮৬২ সালে নবীন কবি হেমচন্দ্রের উপর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনার ভার অর্পিত হয়। এ সংবাদে মাইকেলও খুব আত্মগৌরব বোধ করেছিলেন।[১০] উক্ত ভূমিকায় তরুণ-কবি হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রশংসা প্রসঙ্গে প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং মধুসূদনের কবিত্বশক্তির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—ওজস্বিতা ও উদ্ভাবনক্ষমতা অর্থাৎ বিচিত্র কল্পনার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য 'মেঘনাদবধে'র সঙ্গে "মহাত্মা মিল্টনের রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের" তুলনা চলতে পারে না। তার তুলনায় 'মেঘনাদবধ' "শতযোজন অন্তরে অবস্থিতি

১০ ১৮৬২ সালের ৪ঠা জুন এক পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে লেখেন. "Meghnad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A., has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language." সে-যুগে এই 'real' B. A.-দের প্রতি কতটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'র কৌতুককর বিবরণী পড়লেই বোঝা যাবে। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ যখন কিশোরসমালোচককে বললেন যে, একজন বি. এ. তাঁর প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখছে তখন কবির বিপন্ন মনোভাব 'জীবনস্মৃতি'তে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে "বি. এ. শুনিয়া আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। বি. এ. !… ."

করিতে পারে কিনা সন্দেহ।" ভারতচন্দ্রকে হেমচন্দ্র অতিশয় শ্রদ্ধা করলেও (তাঁকে তিনি "অদ্বিতীয় লেখক" বলেছেন) মধুসূদনকে 'মধ্যবিৎ' অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর উর্ধ্বে স্থান দিতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মতে কবি মাইকেল যেরূপ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হতেন "তবে আর তো তার কথাই ছিল না।" এখানে তরুণবয়স্ক হেমচন্দ্রের একটা বড় রকমের ভুল হয়েছে। কবিত্বশক্তি ও সুলেখক হবার শক্তি—এ দুটো কি পৃথক বৃত্তি? যাঁর কবিত্বশক্তি আছে অথচ তিনি সুলেখক নন, এ ধরনের মন্তব্য স্ববিরোধী। ভারতচন্দ্রের অদ্ভুত সরস রচনার তুলনায় মাইকেলের ভাষা প্রভৃতি নীরস ও কঠিন বলে মনে হলেও হেমচন্দ্র এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, "বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" এর পর 'মেঘনাদবধে'র চতুর্থ সংস্করণে (১৮৭৪) এই ভূমিকাটিকে হেমচন্দ্র ঢেলে সেজেছিলেন এবং কবির ভাষা ও ছন্দগত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখালেও আরও উচ্ছ্বসিতভাবে মধুসূদনের কাব্যরস ব্যাখ্যা করেছিলেন। তখন তিনি বুঝেছিলেন, বিদ্যাসুন্দরের মঞ্জুভাষা যতই কর্ণতৃপ্তিকর হোক না কেন, "বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিবচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু তরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোদ্ধাগণের উৎসাহবর্ধন জন্য তূরীভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক। ধনুষ্টংকারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না।" সমস্ত দিক বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না।" একাব্য কেন তাঁর কাছে অদ্বিতীয় বলে মনে হয়েছে সেই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র মধুসূদনের অসামান্য কবিত্বশক্তির বিস্তর প্রশংসা করেছেন। মধুসূদন এতে নানা রসের সমাবেশ করেছেন। তার মধ্যে বীর ও রৌদ্ররসে এই কাব্য অতুলনীয়। এর দ্বারা বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচিত্র কল্পনাশক্তির সাহায্যে কবি "স্বর্গমর্ত্যপাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহকে" একত্র করতে পেরেছেন। এ কাব্য পাঠে মনে যুগপৎ বিস্ময়-ক্রোধ-করুণ ভাব

উদ্রিক্ত হয় এবং তার ফলে মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। কবি-গুরু বাল্মীকির কাব্যোদ্যান থেকে পুষ্প চয়ন করে মধুসূদন অপূর্ব মাল্য গ্রন্থন করেছেন। হেমচন্দ্র এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার দ্বিতীয়বারের ভূমিকাটি অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। কাব্যটির সমগ্র রসমূর্তি তখনও হেমচন্দ্রের কাছে উদ্‌ঘাটিত না হলেও তিনি রাজনারায়ণের মতো হিন্দু মনোভাবের দ্বারা ততটা প্রভাবিত হন নি এটাই প্রশংসার কথা। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের মধুসূদন-বিষয়ক মতামতের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

The Calcutta Review পত্রে (1871, Vol. 52, No. 104) 'Bengali Literature' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-যুগে ঐ পত্রিকার লেখকদের নাম থাকত না। সুতরাং উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধলেখকের নাম নির্ধারণ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু কাগজের কর্তৃপক্ষ পরে 'Selections from The Calcutta Review' নামে যে প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং যার একটি তালিকা পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন, তাতে এই প্রবন্ধের লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে।* এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত, যুক্তিপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। মধুসূদন সম্বন্ধেও তার অভিমত অত্যন্ত পরিমিত। যাঁরা মধুসূদনকে কালিদাসের সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে চান এবং যারা কবিকে নিতান্তই poetaster বলে নিন্দা করতে ইচ্ছুক, বঙ্কিম এই দুই মতেরই প্রতিবাদ করেছেন।

> "For ourselves we agree with neither, and while admitting his considerable merits, we are not prepared to rank him among great poets." [১১]

*এই সংকলন কোন কারণে প্রকাশিত হয় নি।

১১. *Essays and Letters*—Bankim Centenary Edition, P 34

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির সমপর্যায়ের না হলেও বাংলা সাহিত্যে যে তাঁর প্রতিভা সর্বশ্রেষ্ঠ ("His rightful place in Bengali Literature is perhaps the highest."), সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। বাল্মীকি প্রভৃতি থেকে কিছু কিছু নিলেও, "The poem is his own work from begining to end"– একথা ঘোষণা করতে বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হন নি। পাশ্চাত্য থেকেও কবি প্রচুর উপাদান নিয়েছেন বটে, কিন্তু সব কিছুকে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন ("Assimilated and made his own most of his ideas which he has taken,") এবং এটি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ ("This poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali literature.") তাতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। কাব্যপরিকল্পনা, লৌকিক ও অলৌকিক বর্ণনা, চিত্রকল্প, গম্ভীরছন্দ এবং শব্দ সন্নিবেশের যাথার্থ্য—সর্বোপরি অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুরুত্ব বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য মাইকেলের রচনার ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি নীরব নন। বিনা কারণে আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যব্যবহার, একই চিত্রকল্পের বিরক্তিজনক পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি দোষ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অধিকতর ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে হোমর, বাল্মীকি, কালিদাস, মিল্টনের কাছ থেকে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন বলে মাইকেল সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একটু কঠোর অভিমত প্রকাশ করেছেন– "Nor is he altogether innocent of plagiarism." তাঁর এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। কবিরা পূর্বসূরীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলে তাঁদের কি 'কুম্ভিলক' বলা যায়? মধুসূদনের চিঠিপত্র থেকেই দেখা যায়, নিজের কাব্যকে পূর্ণতর করার অভিলাষে মধুসূদন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কাব্য থেকে প্রয়োজনমতো উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি-ব্যাস-হোমরকে বাদ দিলে পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কবিই কি কুম্ভিলক বৃত্তির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন না? অবশ্য মাইকেলের মৃত্যুর পর

অভিভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন, বোধ করি বাংলাদেশের কোন কবিমনীষী সম্বন্ধে তিনি সেরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন (১২৮০ সন, আষাঢ়) মধুসূদনের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সনের ভাদ্রের 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, "যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য-গর্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কী? বাঙ্গালীদের মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকদের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।" তার এ মন্তব্য শুধু ভক্তির উচ্ছ্বাস নয়, অতিশয় যুক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্যময়। বস্তুতঃ বাংলার শিল্পবোধ ও রসানুভূতিকে জয়দেব ও মধুসূদন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন -অবশ্য দুজনে ছিলেন দুই বিপরীত মেরুপথের যাত্রী। উক্ত আলোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন. "কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" অবশ্য কবির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দের ততটা অনুরাগী ছিলেন না। সমস্ত কাব্যটি একধরনের ছন্দে রচিত হওয়ায় এটি কিছু একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে, অন্ততঃ এ ধরনের ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (প্রথম খণ্ড) সমালোচনা প্রসঙ্গে ('বঙ্গদর্শন', ১২৮১) উক্তকাব্য প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে অর্থাৎ নানা ছন্দে লেখা হয়েছে বলে তিনি তাঁর বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছেন[১১] এবং

১১ "ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে, একটি ছন্দে এক-একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রের শ্রান্তিকর বোধ হয়। [illegible] আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। দেশী প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছেন।" (বঙ্গদর্শন, ১২৮১, মাঘ-ফাল্গুন)

মধুসূদন পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে শুধু একপ্রকার ছন্দে 'মেঘনাদবধ' লিখেছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রথা অনুমোদন করেন নি।[১২] নবীনচন্দ্রকেও 'রৈবতক' রচনাকালে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সাহিত্যরস ও তত্ত্ববিশ্লেষণে অতিশয় অভিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছন্দের বৈশিষ্ট্য ধরতে পারেন নি। তাঁর ধারণা, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে Blank verse-এর ব্যবহারের জন্য *Paradise Lost* এবং একমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দকে বাহন করার জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' শ্রুতিসুখকর হয় নি। বিভিন্ন ছন্দ, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর ছন্দ (নবীনচন্দ্রকে তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছিলেন) ব্যবহার না করলে মহাকাব্য নাকি ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। তাঁর এ অভিমত যে কোনওক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়, তা পাঠককে আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। মিল্টন ও মধুসূদনের কাব্যদুটি একই প্রকার ছন্দের জন্য সুখপাঠ্য হতে পারে নি, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকার ছন্দের কোনও প্রয়োজন নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়ে রচনাবৈচিত্র্যের দ্বারাই রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক স্থলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র আলোচনা করেছেন এবং বিশ্লেষণী রীতির দ্বারা তার গুণাগুণ পৃথগ্‌ভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। তবে এ মহাকাব্যের মূল রস ও গূঢ় তাৎপর্য তিনিও ধরতে পারেন নি, অন্ততঃ তাঁর মন্তব্য ও আলোচনার মধ্যে তার কোন ইঙ্গিত নেই।

সে যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং জ্ঞানভূমিষ্ঠ চিন্তার দ্বারা যৌবনেই যিনি প্রবীণত্বের গৌরব লাভ

---

১২. নবীনচন্দ্রকে প্রদত্ত তাঁর উপদেশ, "Blank verse is recognised as proper to Epic poetry in English—but it is, certainly very unsuited to Bengali epics. M. S. Dutt alone has been able to make something of it—but even his success has been achieved at a lamentable sacrifice of grammar, idiom and perspicuity." নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, সা. প. সংস্করণ. ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩

করেছিলেন তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর *The Literature of Bengal* গ্রন্থে[১৩] মধুসূদন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

> "Nothing in the entire range of the Bengali Literature can approach the sublimity of the *Meghnad-vad Kobya* which is a masterpiece of epic poetry. The reader, who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of his great work with mixed sensations of veneration and awe with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and greatest that have ever lived like Vyas, Valmiki and Kalidas, Homer, Dante or Shakespeare."

এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে মধুসূদনের প্রতি রমেশচন্দ্রের কতটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তাঁকে তিনি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, হোমর, দান্তে ও শেক্সপিয়রের পরেই স্থান দিয়েছেন। কিন্তু মিল্টনের কোন উল্লেখ করেন নি। এতে মনে হচ্ছে তিনি মাইকেলকে বোধ হয় মিল্টনের সমতুল্য মনে করতেন। তাঁর এ অভিমত সে-যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায়-মার্জিতরুচি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে-বিশ্বাসী যুবসম্প্রদায়ের মনের কথা বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সংস্কৃতি ও দার্শনিকতার দৃষ্টিকোণ, বিশেষতঃ হেগেলীয় তত্ত্বের আদর্শে 'মেঘনাদবধে'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। মিল্টনের আদর্শে লেখা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তিনি বিপরীত ও বিচিত্র অন্তঃপ্রেরণার সংঘাত প্রত্যক্ষ করেছিলেন — যাকে তিনি মানবজীবন-ভাবের শিল্পপ্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ঠিক এই ধরনের মননধর্মী

১৩. *The Literature of Bengal*—From the earliest time to the present day with copious extracts from the best writers. By Ar Cy Dae Calcutta; 1877 (রমেশচন্দ্রের এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তাঁর নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর সহ প্রকাশিত হয়।)

দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা সে-যুগে বা পরের যুগেও বড় কেউ আলোচনা করেন নি। আচার্য শীলের মতে :

> "The *Meghnadbadha* of Michael Madhusudan Dutt is classic both in style and conception, though the grand work of the plot is derived form strictly oriental sources.···With Michael Madhusudan Dutt, the conflict of force which is constitutive of the epic poem has already raised itself in Miltonic fashion from the physical plane to the moral platform, herein transcending the classic conception,—though of course, the *deus ex machina* is there still in full working, the commingling of the supernatural with the natural, of the superhuman with the human, of the miraculous, the mythical and the improbable with the historical and the actual, being a distinctive trait of the epic symbolism or *vorstallung*" (নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' থেকে উদ্ধৃত।)

বলাই বাহুল্য, এখানে দার্শনিকসুলভ মননবৃত্তির ওপর অধিকতর ঝোঁক দিয়ে তত্ত্বদর্শনের পটভূমিকায় কাব্য বিচার করা হয়েছে। তা হলেও দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ এ কাব্য ও কবিহৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত প্রজ্ঞার আলোক নিক্ষেপ করেছেন।

মাইকেল সম্পর্কে আর একজন পুরাতনপন্থী লেখকের কথা উল্লেখ করে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যাব। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহচ্ছায়াতলেই তাঁর বিদ্যা ও রচনাশক্তির বিকাশ হয়েছে। বস্তুতঃ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১২[illegible] বাংলা।

১৪. এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ ১৮৭২ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি থেকে রামপ্রসাদ সেন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। পরে দ্বিতীয় ভাগের কিছু খণ্ডাকারে প্রকাশের পর ১৮৭৩ সালের শ্রাবণ মাসে প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ একসঙ্গে মুদ্রিত হয়।

সাহিত্যের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে'র আদর্শে ন্যায়রত্ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এতে তিনি ঈষৎ প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মধুসূদনের সমগ্র কবিপ্রতিভা, বিশেষতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলেন। তখন বাংলার শিক্ষিত মহলে মধুসূদনকে নিয়ে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল—ন্যায়রত্নের উক্তিতেই প্রকাশ।[১৫] এঁদের মধ্যে একদল হলেন "মেঘনাদবধের অতিপ্রশংসাকারী"। "আর একদল না বুঝিয়া অনর্থক নিন্দা করেন।" রামগতি এই দু'দলকে যথাক্রমে 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' নামে অভিহিত করেছেন। পুরাতনপন্থী সমালোচক রামগতি মুক্তকণ্ঠে 'মেঘনাদবধে'র প্রশংসা করে লিখেছেন :

> "মেঘনাদবধ মাইকেল-সাগরের সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ...বাঙ্গালার বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সদ্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদবধ দ্বারা অনেক অংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইঁনি সেরূপ হন নাই; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ক্রটি করেন নাই। ইঁনি এই কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসটিকে যে বীরপুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদ স্বরূপ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে[১৬]।"

এখানে লক্ষণীয় রামগতি প্রাচীনপন্থী হয়েও ঔদার্যের মনোভাব নিয়ে 'মেঘনাদবধ' বিচার করেছেন। এ কাব্যে বাল্মীকি-বিরোধিতা বা

১৫. 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (৩য় সংস্করণ) পৃঃ ২৬৪

১৬. ঐ, পৃঃ ২৬৪-২৬৫

রসাভাস বা সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে তিনি কবির প্রতি খড়্গহস্ত হন নি।[১৭]

মধুসূদনের দূরারোহী কল্পনার উচ্চতা ও মৌলিকতা, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-পরিব্যাপ্ত অসাধারণ বর্ণনাশক্তি, বীররস এবং ওজস্বিনী ভাষার তিনি বিস্তর প্রশংসা করেছেন। অবশ্য এ ধরনের টুকরো-টুকরো করে রসবিচার অনেকটা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুগত এবং যথার্থ রস-বিচারের পরিপন্থী। এখানেও দেখা যাচ্ছে মধুসূদনের এই অভিনব মহাকাব্যের মূল কেন্দ্রটি তিনিও ধরতে পারেন নি; গাছের মূলকে লক্ষ্য না করে তিনি শাখাপ্রশাখা-পত্রপুষ্পের প্রশংসা করেছেন। অবশ্য এ কাব্যের উৎকট ভাষাভঙ্গী, বিশেষতঃ নামধাতুর অযথা প্রয়োগ, কোন কোন কৃত্রিম অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি, আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সর্বোপরি অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ন্যায়বত্ব স্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর মতে—"কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষর রচনা করিয়াও বীররস বর্ণনে অসমর্থ হন নাই, তখন ইনিও চেষ্টা করিলে যে অসমর্থ হইতেন তাহা বোধ হয় না" (পৃঃ ২৬৫)। তাঁর ধারণা নতুন কিছু করবার উৎসাহেই মধুসূদন মিল্টনের ছন্দের অনুকরণ করেছিলেন। রামগতির এই মত যতই যুক্তিহীন মনে হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি মধুসূদনকে বিচারবিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সুলভ কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি। সে ধরনের কোন রক্ষণশীলতা থাকলে তিনি মধুসূদনের বাল্মীকি-বিচ্যুতিকে কখনও ক্ষমা করতেন না। 'মেঘনাদবধে' দেবদেবীর তথাকথিত অহিন্দু চরিত্র, তৃতীয় সর্গে প্রমীলাদি সম্পর্কে রামচন্দ্রের ভীকতাব্যঞ্জক উক্তি এবং মেঘনাদ-হত্যায়

১৭ এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূর্ণতা সম্পাদনার্থ প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের বহুল অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে, সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে, কবিতাজননীর অসাধারণ কল্পনাশক্তি-বলে কবি শত শত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন।"—ঐ, পৃঃ ২৬৪

লক্ষ্মণের তস্করবৃত্তি অবলম্বনকে তিনি নিন্দাবাণে বিদ্ধ করতে পারতেন। তা তিনি করেন নি, বা রাজনারায়ণের মতো হিন্দুয়ানি বা পরবর্তী-কালের যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতো নীতিধর্মের অতি-আসক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। তাঁর বিচারপদ্ধতি পুরাতন সংস্কৃত কাব্যবিচারের অনুসরণ বলে হয়তো আমরা তাকে আধুনিক সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড বলে মেনে নিতে পারব না, কিন্তু তাঁর মানসিক ঔদার্য যে প্রশংসার যোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩

'মেঘনাদবধ'-সংক্রান্ত আলোচনার এই পটভূমিকায় 'ভারতী' পত্রে দু'বার লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্ত কাব্যের সমালোচনা বিশ্লেষণ করব। ঐ প্রবন্ধ দুটির রচনাকালের মধ্যে ঠিক পাঁচ বছরের ব্যবধান। প্রথম প্রবন্ধ প্রথম বর্ষের 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায় (১২৮৪ শ্রাবণ) 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই নামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে রচনাকারের নাম ছিল না। প্রবন্ধ সমাপ্তির পর শুধু 'ভ' অক্ষরটি ছিল : মনে হয় 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ভণিতায় গান লিখবার কিছু পূর্বে কবি নিজ নামের বিকল্প হিসেবে 'ভানু' শব্দ[১৮] ব্যবহারে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা (১২৮৪ শ্রাবণ থেকে পর পর চার সংখ্যা (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যা),

১৮. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪) ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে ছাপা হলেও ১২৮৪-৮৮ এবং ১২৯০ সালের 'ভারতী'তে এর তেরটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালের (শ্রাবণ) 'নবজীবন' পত্রিকায় কবি রঙ্গ করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে একটি বেনামী রচনায় সুকৌশলে এবং সরস-ভাবে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিককে ব্যঙ্গ করে নিজের কথা লিখেছিলেন। এর কিছু পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি বালক-কবি চ্যাটার্টনের গল্প শুনেছিলেন। সেই আদর্শে ভানুসিংহ ঠাকুর নাম নিয়ে কিশোরকবি বিদ্যাপতির ধাঁচে ব্রজবুলিতে পদ লিখতে শুরু করেন।

তার পর পৌষ ও ফাল্গুন—মোট ছয় সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এটি কখনও পুনর্মুদ্রিত হয় নি। এর ঠিক পাঁচ বৎসর পরে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে আর একটি প্রবন্ধ 'ভারতী'তে (১২৮৯ ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'সমালোচনা' শীর্ষক গ্রন্থে (১৮৮৮) গৃহীত হয়েছিল। 'সমালোচনা'র আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হয় নি, না এই প্রবন্ধটি তাঁর গদ্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিরুদ্ধে তরুণ বয়সোচিত অবিনয় প্রকাশের জন্য পরবর্তীকালে কিছু লজ্জিত হয়েছিলেন এবং পরিণত বয়সে 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং মধুসূদনের কবিমানসের অন্তর্গূঢ় ভাবের ব্যাখ্যা করে যেন মৃত মহাকবির প্রতি কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন। প্রথম প্রবন্ধটি যখন 'ভারতী'তে [illegible] প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তার তীব্র, তীক্ষ্ণ নিন্দা, [illegible] মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতিকে নিকৃষ্ট প্রমাণের [illegible] সে-যুগের মধু-ভক্তদের মনে কতটা জ্বালা ধরিয়েছিল [illegible] আজ [illegible] উপায় নেই, এবং প্রবন্ধটি বাংলা [illegible] উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল কিনা তাও জানা [illegible]। কিশোরকাল (তখন তার বয়স ষোল বছরের কয়েক মাস বেশি) অতিক্রম করে কবি যৌবনে (দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনার সময় তার বয়স একুশ বছর পার হয়ে গেছে) পৌঁছে 'ভারতী'তে যে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখলেন, সেটিকে তিনি সাতাশ-আটাশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত 'সমালোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। হয়তো পরিণত যুবক রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধটির অত্যুক্তি ও বাচালতাকে স্বীকৃতি দিতে চান নি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধটি, 'মেঘনাদবধে'র তীক্ষ্ণ ও সহানুভূতি-হীন সমালোচনা হলেও অত্যুক্তি বর্জিত বলে তিনি এটিকে কিছু দিন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। উক্ত দুটি প্রবন্ধেই দেখা যাচ্ছে কিশোর ও নবীন যুবক রবীন্দ্রনাথ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখলেন তাতেও তিনি এ কাব্যের প্রতি

প্রতিকূলতা গোপন করলেন না। বরং মনে হচ্ছে, এ কাব্যের ওপর তাঁর বীতরাগ যেন কিছু অকারণে তীব্র। মধুসূদনের প্রতিভাকে তিনি যেন ধৈর্য, যৌক্তিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতেই চান নি। মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'র তুলনায় তিনি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'কে মহাকাব্য হিসেবে প্রশংসার ফুলচন্দনে এমন হাস্যকরভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন যে, তাঁর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকের কিশোরকালের রচনা থেকেও তা আশা করা যায় না। কারণ এই যুগে 'ভারতী'তে প্রকাশিত তার সমালোচনা ও অন্যান্য গদ্যনিবন্ধের মধ্যে এর চেয়ে অনেক বেশী পরিপক্ব বিশ্লেষণশক্তি ও স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ মধুসূদনের মহাকাব্যের প্রতি এবং মধুসূদনের প্রতিও তাঁর মন কৈশোর ও যৌবনে এতটা বিষিয়ে উঠল কেন, তার কারণ স্বয়ং কবি একাধিকবার বলেছেন এবং এই উদ্ধত রচনার জন্য পরবর্তী কালে কিছু বিব্রতও হয়েছিলেন।

ঘরের পড়ার যুগে বাল্যকাল থেকে তাদের যে সমস্ত গুরুতর বাংলা বই পড়তে হত তার মধ্যে দুরূহতম ছিল বোধ হয় 'মেঘনাদবধ কাব্য'। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল "ক্ষীণ শরীর, শুষ্ক ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর" সহ যখন সকাল ছটা-নটা পর্যন্ত বালকদের অক্ষয় দত্তের 'চারু-পাঠ', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত' পড়াতেন, তখন স্নিগ্ধ প্রভাতে তিনঘণ্টা যে বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে কী দুঃসহ মনে হত তা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক কল্পনা করতে পারেন। তারপর পণ্ডিত মহাশয় 'মেঘনাদবধ' পড়াতে শুরু করতেন। অনুমান করি, তিনি এ কাব্যের শুধু দোষই দেখাতেন, কদাচিদ্-বা আর্য-ধর্ম-সংস্কারবিরোধী মধুসূদনের যথেষ্ট সমালোচনা করতেন। তখন এই কাব্যের প্রতি ন বছরের বালক [১৯] রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী হত তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ভোর হতে না হতেই

১৯ "আমরা যখন মেঘনাদবধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ করি নয় বছর হইবে।"—জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি, 'জীবনস্মৃতি', ১৩৬৮ সালের সংস্করণ, তথ্যপঞ্জী, পৃঃ ২৪২

বালকদের কুস্তি ইত্যাদির শরীর চর্চার পর যখন তাঁদের জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' শিখতে হত, তখন স্বয়ং মাইকেল তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেও তাঁরা কবির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা রাখতে পারতেন না। কারণ নর্মাল স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বোধহয় ভর্তৃহরির মতো কাব্য পড়ানর ছলে ব্যাকরণ শেখাতেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, "যে-জিনিষটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য কাব্য পড়াইলে" কাব্যেরও জাত যায়, ভাষাশিক্ষাও বাধা পায়। এ বিষয়ে তিনি যথার্থ বলেছেন, "কাব্য জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে" (জী-স্মৃ)। 'মেঘনাদবধে'র প্রতি ন-দশ বছরের বালকের এই বিরূপতা ষোল বছর বয়সের কবিকে লেখনী শাণাতে প্রেরণা দিল। অবশ্য পরবর্তী কালে এই সম্পর্কে বলেছেন, "ইতিপূর্বেই[20] আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ বয়সে কবি বাল্যরচনাটির দোষ দেখালেও ষোল বছর বয়সের সমালোচনাটির জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বা

২০. 'ইতিপূর্বে' শব্দটিতে মনে হচ্ছে 'ভারতী' প্রকাশের পূর্বেই কবি 'মেঘনাদবধে'র সমালোচনা লিখেছিলেন। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা থেকে যখন প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তার বেশ কিছু আগেই এটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সঙ্কোচ বোধ করেন নি। প্রথম সমালোচনাটিতে অল্প বয়সের স্পর্ধাই ছিল প্রধান। সেই স্পর্ধার বশে তিনি এই অমর মহাকাব্যের ওপর নখরাঘাত করে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন, প্রতিভার ঔদ্ধত্যে বিচারবুদ্ধি তখন আবিষ্ট থাকে" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, পৃঃ ৬০)। তাঁর মতে—উদ্ধত প্রতিভা, আবিষ্ট বিচারবুদ্ধি এবং নিজেকে সহজে লোকচক্ষুতে পরিচিত করবার উৎসাহে নবীন লেখকেরা প্রথমেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের খোঁচা দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অন্ততঃ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতি-বিম্বে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সমালোচনা থেকে তাই মনে হচ্ছে। আর একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন, "ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, এই সদ্য-উদ্গত-শৃঙ্গ মৃগশিশু অরণ্যের সর্বাপেক্ষা মজবুত বৃক্ষকাণ্ডের উপরেই তাহার অচিরলব্ধ অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করিয়াছে।"[২১] এঁদের এ মন্তব্য তথ্যসঙ্গত বটে। কারণ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ এই 'ভারতী'তেই নাম গোপন রেখে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয় সরকারকেও আক্রমণ করেন।[২২] 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধটির

---

২১. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রসমীক্ষা, পৃঃ ২২২

২২. ১২৮৫ সনের ভাদ্রের 'ভারতী'তে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত 'কবিতাপুস্তকে'র তীক্ষ্ণ সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের বলে স্থির হয়েছে (দ্রঃ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬)। ১২৮৭ সনের 'ভারতী'তে (ভাদ্র-আশ্বিন) 'বাঙ্গালী কবি নয়' এবং 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' প্রবন্ধ দুটি বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮২, পৌষ) প্রকাশিত 'বাঙ্গালী কবি কেন' প্রবন্ধের সমালোচনা। পরে 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ দুটি "নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি" নামে মুদ্রিত হয়। ১২৮৮ সালের শ্রাবণ

বিষয়ে উত্তরকালের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-জীবনীকার এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত মতামতগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে —রবীন্দ্রনাথের মতে, এই মহাকাব্য বাল্যকালে নীরসভাবে পড়ানো হত বলে তাঁর মনে এর বিরুদ্ধে বিরূপতা সঞ্চারিত হয়েছিল —যার ফলে উক্ত উদ্ধৃত সমালোচনার জন্ম। রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে আর একটি কারণ হল, সহজে নিজেকে জাহির করবার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত কবিখ্যাতিতে ছিদ্র আবিষ্কারের চেষ্টা। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শুধু নবোদ্গত শৃঙ্গের ধার পরীক্ষার জন্যই কিশোরকবি সাহিত্যারণ্যের সর্বাপেক্ষা সুগঠিত বৃক্ষকাণ্ডে কিঞ্চিৎ আঘাত দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মন্তব্য, রবীন্দ্র-জীবনীকারের উক্তি এবং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত থেকে এই উপসংহারে আসতে হয় যে, ষোল বছর বয়সে লেখা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি দিয়ে মাইকেল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। মধুসূদনের প্রতি এই সাময়িক অশ্রদ্ধা (যে কোন কারণেই হোক) পরে কবির মন থেকে মুছে গিয়েছিল— এই রকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমালোচকেরা যাই বলুন না কেন, মাইকেলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল ধারণা তার পরেও ছিল। তা নইলে তিনি কুড়ি-একুশ বছর বয়সে আবার নতুন করে 'ভারতী'তে (১২৮৯) 'মেঘনাদবধে'র দোষ প্রদর্শনে প্রস্তুত হলেন কেন এবং তারও ছ'বছর পরে (তখন তাঁর বয়স সাতাশ) এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'সমালোচনা' (১৮৮২) গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশ করলেন কেন? রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ'-

মাসের 'ভারতী'-তে 'চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়' প্রবন্ধেও বঙ্কিমগ্রন্থের সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে অকারণনিন্দা ছিল না। 'ভারতী'র এই সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের'ও রবীন্দ্রনাথ কোন কোন স্থান, বিশেষতঃ সম্পাদকের সম্পাদনারীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। 'ভারতী'র ঐ একই সংখ্যায় উক্ত পদাবলীর অর্থ নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ রায়ের বাদানুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল।

সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটির জন্য লজ্জিত হয়েছেন, সমালোচকেরাও কবি-প্রদর্শিত কারণই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ, যার তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা প্রথম প্রবন্ধের তুলনায় অনেক বেশী, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছুই বলেন নি, বা তার জন্য লজ্জা বোধ করেন নি। সমালোচকেরাও এ বিষয়ে প্রায় নির্বাক। তাহলে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধুসূদন-সংক্রান্ত মতের পরিবর্তন হয় নি বলেই মেনে নিতে হয়। এখন প্রবন্ধ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে ও বিশ্লেষণ করে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করা যাক।

আমরা আগেই বলেছি 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা (১২৮৪ শ্রাবণ) থেকেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকিয়ে চলেছিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি প্রবল কণ্ঠে তীব্র মন্তব্য নিক্ষেপ করে 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র গুণাগুণ আলোচনা এবং বিশ্রুতকীর্তি কবি মধুসূদনের কবিখ্যাতি বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চাইলেন। মধুসূদনের মৃত্যু চার বৎসর পরে ষোল বৎসরের রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র ছয় সংখ্যায় মধুসূদনের কাব্যকৃতির, বিশেষতঃ 'মেঘনাদবধে'র যে আলোচনা করেন, তাতে গুণগ্রাহিতার চেয়ে দোষদর্শিতাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে এবং কবিকিশোর সেই উদ্দেশ্যেই লেখনী শাণিয়ে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। ইতিপূর্বে রাজনারায়ণ বসুর 'মেঘনাদবধে'র ওপর লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রও মধুসূদনের রচনার ছোটখাট ত্রুটি উল্লেখ করলেও কবিকে মহাকবির পর্যায়ে রেখে তাকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল-বিরোধিতা থেমে আসছিল। ঠিক সেই সময়ে মধু-খ্যাতিতে লোষ্ট্রপাত করে কিশোর রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করলেন। অবশ্য প্রবন্ধটিতে তার নাম ছিল না। [illegible], তার অন্তরঙ্গমণ্ডল ছাড়া আর কেউ লেখকের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে নি। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা

কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না।"[২৩]

এর একটু পরেই রাবণাদি চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই।" এখানে লক্ষ্য করা যাবে, এই আলোচনায় কবি মূলতঃ নিজস্ব বুদ্ধিবিবেচনার ওপরই বেশী নির্ভর করেছেন। অবশ্য এই বাক্যটিতে যে স্ববিরোধিতা আছে, তা কিশোর সমালোচক তলিয়ে দেখেন নি। যে চরিত্রগুলি সুচিত্রিত হয় নি, সেগুলির প্রতি তাঁর প্রতিকূলতার কারণ বোঝা যায়। কিন্তু কতকগুলি চরিত্র তাঁর মনোমতো হয় নি কেন তার কোন কারণ দেখান নি। আসল কথা, বাল্যকাল থেকে মাইকেলের প্রতি তাঁর মনে কিছু বিদ্বেষ জন্মিয়ে গিয়েছিল। 'ভারতী'র আসরে যখন তাঁর রচনার নিরঙ্কুশ প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন তিনি একদিকে তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন, অন্য দিকে যুক্তিতর্কের নিস্পৃহতা ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক পন্থায় (judicious criticism), অথবা বিষয়গত যাথার্থ্যের (objective criticism) রীতি অনুসরণ করে সাহিত্যবিচার রবীন্দ্রনাথের ধাতুপ্রকৃতির অনুকূল নয়। নিজস্ব ভাবানুষঙ্গের রঞ্জনে আলোচ্য শিল্পবস্তুকে রঞ্জিত করে তাকে আস্বাদ করা—যাকে একপ্রকার নতুন সৃষ্টি বলা যায়, যাকে একাধারে impressionistic, expressionitic এবং intuitive সমালোচনার বিচিত্র সমাহার বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারপদ্ধতি তারই সার্থক দৃষ্টান্ত এবং 'সাধনা' পর্ব থেকেই তিনি এই রীতিটিকে নিজস্ব বিচারপদ্ধতি বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রথম সূচনা এই

---

২৩. 'ভারতী'তে মুদ্রিত উক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) পঞ্চদশ খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে।

'ভারতী' পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই হয়েছে—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনায়।

কবি প্রথমেই তদানীন্তন ভীরু সমালোচক ও অলস পাঠক, যাঁরা অবুঝভাবে মাইকেল-তোষণে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করেছেন, ইংরেজী শিক্ষার কুফলে যাঁরা ইংরেজী গিলটি-করা বাংলা সাহিত্যে মোহমুগ্ধ, তাঁদের মানসিক জড়তাকে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করেছেন এবং "সৌন্দর্য অর্পণ করা" যে সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ক'টি কথা প্রারম্ভে বলে নিয়ে তিনি 'মেঘনাদবধ' সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে যদিও কিশোর সমালোচক ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন তবু অনেক সময়ে বিশ্লেষণী পদ্ধতিরও অনুকরণ করেছেন। অবশ্য সব সময় নিস্পৃহতা বজায় রাখতে পারেন নি। মূলতঃ লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী ও লক্ষ্মী—এই চরিত্রগুলি বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে কবিকল্পনার খর্বতা, যৌক্তিকতার অভাব, অস্বাভাবিকতা, অপ্রাসঙ্গিকতা এবং পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশে চরিত্র সৃষ্টির ব্যর্থতার বিষয়ে তিনি সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। চরিত্র বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাপ্রয়োগ, বাক্‌রীতি প্রভৃতির ব্যাকরণগত ও আলঙ্কারিকসুলভ সূক্ষ্ম বিচারেও অগ্রসর হন। কোন কোন স্থলে তিনি অনতিপূর্বে-লোকান্তরিত মধুসূদনকে ব্যঙ্গ করেছেন, কোথাও বা 'সাহিত্যদর্পণকারে'র দোহাই দিয়ে মধুসূদন-ব্যবহৃত উপমাদির হাস্যকর দুর্বলতা ধরিয়ে দিয়েছেন[২৪], এবং প্রসঙ্গক্রমে 'বৃত্রসংহারে'র তুলনা

২৪. মধুসূদনের কোন কোন অনবদ্য উক্তিকেও তিনি নিন্দা করেছেন। 'মেঘনাদবধে' "বরজে সজাক পশি যথা ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ মজাইছে লঙ্কা মোর"—দৃষ্টান্তটি উদ্ধৃত করে কবি বলেছেন, "এই উদাহরণটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকতেন তবে দোষপরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপিকপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত।" 'সাহিত্যদর্পণে'র প্রচলিত সংস্করণে এ প্রসঙ্গ নেই।

দিয়ে হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তির উচ্চ প্রশংসা করে মধুসূদনকে পদে পদে উপহাস করেছেন। 'ভারতীর' পরের সংখ্যাগুলিতেও তিনি এই রীতি ব্যবহার করেছেন। কৈশোরের চপলতা ও কিঞ্চিৎ দম্ভবশতঃ তিনি ইলিয়াদ, প্যারাডাইজ লস্ট, ম্যাকবেথ, কেটো ও মূল রামায়ণ থেকে প্রচুর উদ্ধৃত দিয়ে মধুসূদনকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের চিঠিখানি [২২] পর্যন্ত দলিল স্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথম কিস্তিতে ('ভারতী'র প্রথম সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথ রাবণ চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। রাবণের আকার-প্রকার, সভার ঐশ্বর্য বর্ণনা—সর্বোপরি পুত্রহারা রাবণের অতিরিক্ত বিলাপ রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ লেখনীকে তীক্ষ্ণতর আয়ুধে পরিণত করেছে। দু'টি কিস্তির মধ্যে প্রথমটিতেই আক্রমণের তীব্রতা যেন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। 'মেঘনাদ-বধে'র রাবণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ, মধুসূদন পুত্রশোকাতুর ও বেদনায়-বিবশ রাবণের যে চরিত্র এঁকেছেন, সে চরিত্র আদৌ বীর-চরিত্র হয় নি—বাল্মীকির রাবণের একটি দুর্বলতম হাস্যকর অনুকৃতি হয়েছে। বস্তুতঃ বীরবাহু ও মেঘনাদের অকাল-অবসানে রাবণ যে ভেঙে পড়েছিলেন এ-দৃশ্য নবীন সমালোচককে আরও প্রতিকূল করে তুলেছিল। তিনি বিবিধ ক্লাসিক সাহিত্য (এমন কি 'বৃত্রসংহার'কেও তুলনাস্থলে এনেছেন) থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বীর-নায়কেরা ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু, হত্যাকাণ্ডকে তুচ্ছ করে নিজেদের অপ্রতিহত বীরত্ব, অনমনীয় পৌরুষ ও অনাহত হৃদয়কে রুদ্ররসেই ভরিয়ে তোলেন। কিন্তু মধুসূদন এই "মন্দোদরী-মনোহর" রাবণকে নারীর অধম করে এঁকেছেন। শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর সভাসদ প্রভৃতিকেও এই একইভাবে নাকালেশে অবশ-অদ্ভুত করে বর্ণনা করেছেন। পুত্রশোকাতুর রাবণের বিলাপকে স্বকণ্ঠের ভাষায়

২২. "I despise Ram and his rabble, but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow." ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', পৃঃ ১৫৩

আক্রমণ করে কবি 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যাতেই মল্লবেশী হুংকার দিয়েছেন। রাবণের বিলাপ[২৬] সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তীক্ষ্ণ কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে অতিশয় যুক্তিযুক্ত মনে হবে :

> "রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং এতবড় দর্প পরিপূর্ণ চিন যে, তাহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালা জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত।'

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ রাবণের সঙ্গে 'বৃত্রসংহারে'র বৃত্রের তুলনা দিয়ে বলেছেন :

> "রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহানভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রচণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।"

এখানে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি—'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাক্ষসরাজ রাবণকে ঘৃণ্য বর্বর রাক্ষসরূপেই চিত্রিত করা উচিত ছিল। পুত্র-শোকাতুর, স্নেহপ্রবণ, অশ্রুকলুষিত এবং প্রত্যাসন্ন নিয়তিনির্দেশে অবসন্ন রাবণচরিত্র মহাকাব্যের রস-মাতাল কিশোর-সমালোচকের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারে নি। তাই তিনি এই ভীরু, দুর্বলচেতা, মানবধর্মী রাবণকে সমালোচনার অগ্নিবাণে দগ্ধ করতে চেয়েছেন।

---

২৬. "এহেন সভায় বসে রক্ষঃ কুলপতি, বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে, অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে"।

যে-সব মাইকেল-প্রেমিক পাঠক-সমালোচক "কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন—" তাঁদেরও তিনি সেই উত্তাপের অংশভাগী করেছেন।

এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হলে বোধহয় কোন মাইকেল-ভক্ত রাবণের বিলাপ-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের কঠোর মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় কিস্তির ('ভারতী'—ভাদ্র) প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী বীরসাহিত্য, স্পার্টার বীরমাতা এবং রাজস্থানের বীরপুরুষদের সঙ্গে রাবণের তুলনা দিয়ে দেখিয়েছেন, এই চরিত্রে বীরপুরুষ বা বীরনায়কসুলভ কোন গুণই রক্ষিত হয় নি। এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধে'র বিষয়বস্তু ও চরিত্রকে সর্বদা প্রাচীন ক্লাসিক মহাকাব্য, বিশেষতঃ বাল্মীকির মহাকাব্যের আদর্শে বিচার করতে চেয়েছেন এবং 'মেঘনাদবধে'র মতো আধুনিক যুগে লেখা মহাকাব্যের নায়ক রাবণের মধ্যে প্রাচীন রামায়ণের সংক্ষুব্ধ, প্রচণ্ড, ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন, কামুক, স্নেহাদি কোমলবৃত্তিবর্জিত, নরভোজী রাক্ষসরাজের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। এইটি তাঁর প্রধান ভ্রান্তি। হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহারে'র বৃত্রকে দৈত্য করেই সৃষ্টি করেছেন। সে দৈত্য আধুনিক কালের কেউ নয়, পৌরাণিক ভাবকল্পনা থেকেই তার জন্ম হয়েছে—যার ভিত্তিমূলে ভারতীয় সংস্কার, ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্মবোধ ক্রিয়াশীল হয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ ক্লাসিক উপাদান থেকে কায়া গ্রহণ করলেও তার প্রাণ সে-যুগের নয়। তার পিছনে আছে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রভাব-জনিত নিয়তির অনিবার্য পরিণাম, স্নেহমায়া-গৃহসুখবিজড়িত এ-যুগের মানুষের মর্মচ্ছেদী নিষ্ফল আর্তনাদ। মধুসূদনের রাবণ পরিচ্ছদে পুরাণ-মহাকাব্যের চরিত্র, কিন্তু হৃদয়াবেগে ও আচরণে রোমান্টিক ও আধুনিক। এ চরিত্র কবির অজ্ঞাতসারে উনিশ শতকের জীবনরস এবং স্বয়ং মধুসূদনের অনন্ত আশা ও আশাভঙ্গের বেদনার রক্তশতদলে স্থাপিত হয়েছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' আর্য মহাকাব্যের আদর্শে বিচার্য নয়—এটি পরবর্তী কালের সারস্বত মহাকাব্য, যা রেনেসাঁস ও উত্তর-রেনেসাঁসের

আলোয়, আবেগে, উল্লাসে, বেদনায় মানবীয় আকৃতি লাভ করেছে, তারই নিরিখে আলোচিতব্য। এই সত্যটি সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে পুত্রশোকাতুর রাবণকে কিশোর রবীন্দ্রনাথের অভিমতের মতো বিরক্তিকর মনে হবে। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ Epic of growth-এর পৌরাণিক আদর্শ ও সে-যুগের ভাবকল্পনার দ্বারা আধুনিক বিড়ম্বিত ব্যর্থ নায়ককে বিচার করতে গেছেন। মধুসূদনকে বুঝবার পক্ষে এই হল প্রধান অন্তরায়। এ ভুল সে-যুগের অনেকেই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও মধুসূদন সম্বন্ধে একসময়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছিটেগুলি নিক্ষেপ করতে ত্রুটি করেন নি।[২৭] জ্যোতিরিন্দ্রনাথও 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে[২৮] সনাতন মহাকাব্যের আদর্শে মধুসূদনকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অনুরূপভাবে বিচারভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য কিশোর রবীন্দ্রনাথ সদ্য-পড়া ক্লাসিক মহাকাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের রাবণচরিত্রের কোন সঙ্গতি দেখতে না পেলেও উত্তরকালে তিনিই

২৭ ১২৮৬ সালের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী'তে (পৃ ৪৮০, পাদটীকা) 'শকুন্তলার সমালোচনার সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধের (প্রবন্ধটি অন্যের লেখা) পাদটীকায় সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ অকারণে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই মন্তব্য জুড়ে দেন —"মিল্টন, ডান্টে প্রভৃতির নানাবর্ণের ত্যক্ত-পরিচ্ছদ-পরিহিতা মাইকেল মধুসূদনের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ জোড়া-তাড়া-লাগানো ভাষা অপেক্ষা কবিকঙ্কণের টাটকা টাটকা হৃদয়প্রসূত খাঁটি বাঙ্‌লা ভাষা যে কত উৎকৃষ্ট তাহা তুলনা করিয়া দেখিলেই জানা যাইতে পারে। অনভিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে (অর্থাৎ মধুসূদনকে) জানেন যে, তিনি পৃথিবীর মহাকবিদের মধ্যে একজন, কালিদাসকে তিনি পরাস্ত করিয়াছেন, ইহাতে আর লেশমাত্র সংশয় নাই—কে এমন সাহসী পুরুষ যিনি এরূপ কথা অকুতোভয়ে বলেন? আর কে? মাইকেল মধুসূদন স্বয়ং।"

২৮. রাম-রাবণকে নিজের কাব্যে ইচ্ছামতো এঁকেছেন বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে মাইকেলকে মৃদুভাবে আক্রমণ করে লেখেন, "আপনার ছাগকে কেহ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক, কিম্বা লেজের দিক দিয়াই

সর্বপ্রথম 'মেঘনাদবধ' ও রাবণচরিত্রের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং তার পর থেকে তাঁরই পথ ধরে রাবণচরিত্রের আলোচনা ও বিশ্লেষণ চলে আসছে। কিশোরকালের এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ রাবণচরিত্রের যথার্থ মূল্যাবধারণ করতে পারেন নি তা ঠিক বটে, কিন্তু মধুসূদনের অতিদ্রুত রচনার যে দুটি-একটি ত্রুটি ধরেছিলেন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। শব্দপ্রয়োগে মাইকেলী মুদ্রাদোষ, 'সুকনকাসন', 'সুসিন্দুর', 'সুসমীরণ' 'সু-আরাধনা', 'সুকবচ', 'সুউচ্চ', 'সুমনোহর' শব্দগুলির অতিপ্রয়োগ যে সুপ্রযুক্ত হয় নি, সে সম্বন্ধে কিশোর-সমালোচক অতিশয় সচেতন ছিলেন। এর পর তিনি লক্ষ্মীচরিত্রের অসঙ্গতি দোষের উল্লেখ করে মেঘনাদ-রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রের কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মেঘনাদচরিত্রের বীরত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রমীলার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য আলাপবর্ণনার কৃত্রিমতার প্রতি কবি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরই সঙ্গে একটি অনাবিল স্বভাবকবির সহজ হৃদয়-ভাবের গান, অর্থাৎ হরুঠাকুরের একটি গানের ("রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ···হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকায় হৃদে বজ্র হানি চলিলে?") তুলনা দিয়ে দেখিয়েছেন, অশিক্ষিতপটুত্ব থেকে উৎসরিত কবিওয়ালাদের গানে কৌশল নেই, বাক্‌চাতুরী নেই, কৃত্রিমতা নেই --কিন্তু আন্তরিকতা আছে। তাঁর এ অভিযোগ যে নিতান্ত অসার তা নয়। প্রথম সর্গে মেঘনাদ লঙ্কায় প্রবেশে প্রস্তুত হলে প্রমীলা যে-ভাষায় মিনতি জানিয়ে তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছিল তা যে খানিকটা প্রাণহীন ও কৃত্রিম হয়ে গেছে তা স্বীকার করতে হবে।

কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি—তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন?" ঐ প্রবন্ধের আর এক স্থল, "বলিতে কি, মেঘনাদবধ কাব্যে সাজসরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা, চরিত্রের মহত্ত্ববিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ, তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?" —ভারতী, আশ্বিন, ১২৮৯

এ ধরনের কৃত্রিম কাব্যকলা মধুসূদন পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতচন্দ্রাদির হানিকর আদর্শ থেকেই পেয়েছিলেন, এবং হয়তো সংস্কৃতপড়া পুরাতনপন্থীদের কিঞ্চিৎ মনোরঞ্জনের চেষ্টাও তাঁর ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের চেয়ে বরং ভারতচন্দ্রের প্রতি অধিকতর প্রশংসাবাক্য ব্যয় করেছেন—"সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু "জানি আমি কেন তুই" ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না।"

মেঘনাদপ্রসঙ্গে প্রমীলার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে "তেজস্বিনী প্রমীলার চক্ষে 'অনলের ন্যায়' অগ্নিজ্বালা প্রত্যক্ষ করে তিনি এ চরিত্রের প্রশংসাই করেছেন, এবং তার "জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্রমূর্তি" দেখে কবিকল্পনার প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রমীলার মুখে মধুসূদন এমন সমস্ত উক্তি আরোপ করেছেন (যথা—"অধরে ধরিলো মধু গরল লোচনে/ আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে? চল সবে রাঘবের হেরি বীরপণা, দেখিব যেরূপ দেখি সূর্পনখা পিসী/ মাতিলা মদনমদে পঞ্চবটী বনে।"), যা কবিকে অতিশয় বিরস করে তুলেছে। প্রমীলার উক্ত অমার্জিত সংলাপ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "প্রমীলা লঙ্কায় যাউন না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন না কেন, তাহাতে তো আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সূর্পনখা পিসীর মদনদেবের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ারকি দেওয়াটা কেন?" মাইকেল এ প্রশ্নের কি জবাব দিতেন জানি না। সে যাই হোক, 'ভারতী'র প্রথম কিস্তিতে রাবণচরিত্র বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের বিশালতার স্বরূপ ঠিকই ধরেছিলেন এবং মধুসূদনের রচনা, শব্দপ্রয়োগ, সঙ্গতিবোধ ও চরিত্রের আচার-আচরণ সম্বন্ধে যে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন, অনেক স্থলেই তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পুরাতনী আর্ষ মহাকাব্য এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে লেখা সারস্বত মহাকাব্যের মধ্যে যে

মূলতঃ কতকগুলি পার্থক্য আছে, সে সম্বন্ধে এই কিশোর-সমালোচক তখনও অবহিত হন নি বলেই মনে হয়।

এর পরের কিস্তিগুলিতে তিনি এই একই রীতির সাহায্যে 'মেঘনাদবধে'র চরিত্র ও ভাষা প্রভৃতিকে ভেঙে ভেঙে বিচার করেছেন, মনের অনুকূল বা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে না হলে কঠোর শাণিত ভাষায়, কোথাও-বা ব্যঙ্গের সুরে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। ইন্দ্র, দুর্গা, লক্ষ্মী চরিত্রগুলিও তাঁর বিধ্বংসী আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি এবং কোন কোন স্থলে সে প্রতিবাদের অন্তরালে এই কিশোর-সমালোচকের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি বিস্ময়করভাবে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছে। চতুর্থ কিস্তির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের রামচরিত্র বিশ্লেষণ করে তাতে অধৈর্য, ভীরুতা, শোকাবেগ, চিত্তচাঞ্চল্য ও নারীসুলভ দুর্বলতার লক্ষ্য করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে রামের বিলাপের সঙ্গে ইলিয়াদের অ্যাকিলিসের তুলনা দিয়েছেন। অবশ্য এদিক দিয়ে তিনি বাল্মীকির রামের সঙ্গে মধুসূদনের রামের বিলাপের তুলনা করলে মধুসূদনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ কিছু প্রশমিত হত বোধ হয়। আসল কথা, মধুসূদন রামচরিত্র অঙ্কন করে বহুকালাশ্রিত আদর্শের হানি ঘটিয়েছেন—আলঙ্কারিকের ভাষায় 'সিদ্ধরসে'র ব্যতিক্রম করেছেন, যার ফলে অসাধারণ গুণবিশিষ্ট কাব্যও পাঠকচিত্তের মজ্জাগত সংস্কারের বিপরীতে গেলে, আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই তিনি রামচরিত্রে মাইকেলকৃত বিকৃতির উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন :

> "বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।"

তার পর তিনি শক্তিশেলে-মূর্ছিত লক্ষ্মণকে দেখে রামচন্দ্রের বিলাপের সঙ্গে মূল মহাকাব্যের অনুরূপ দৃশ্যের তুলনা দিয়ে কোনটি অধিকতর স্পৃহণীয় সে-বিষয়ে বিচার-বিবেচনার ভার পাঠকদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, "এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভাল হইত

কিনা,[২৯] আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।" এই সমস্ত মতামত ও মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সে-যুগে মধুসূদন সম্বন্ধে যে-ধরনের অভিমত প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ এখানে তা ছাড়িয়ে বেশী দূর যেতে পারেন নি। রামচরিত্রে সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম হয়েছে, হিন্দুয়ানি ও আর্যমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে —রাজনারায়ণ বসু থেকে শুরু করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্যন্ত --নবীন-প্রবীণ সমস্ত সমালোচকই এই অভিযোগ সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ। অনেকেই বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের রেখায় রেখায় তুলনা করে আদিকবির পাশে রেখে নবীন কবিকে নস্যাৎ করার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে যেতে পারেন নি। সর্বোপরি যে-সহানুভূতি থাকলে যথার্থ সমালোচক হওয়া যায়, নানা কারণে মধুসূদনের প্রতি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের সে-সহানুভূতি ছিল না। খানিকটা ঠাকুরবাড়ির সংস্কার (দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সকলেই 'ভারতী'তে মাইকেলের রচনাশক্তির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন এবং দোষ দেখিয়েছিলেন।),[৩০] খানিকটা মহাকাব্যের ঘনঘটা ও শব্দাড়ম্বরের প্রতি গীতিকবিসুলভ অনীহা, খানিকটা বাল্মীকির আদর্শ পরিত্যাগ ও পাশ্চাত্য অনুকরণ এবং

২৯ মধুসূদন ইচ্ছে করেই কোনো কোন প্রসঙ্গে বাল্মীকির আদর্শ অনুসরণ করেন নি। কোন স্থলে গ্রীক পুরাণকে অনুসরণ করে, কোথাও নিজের কল্পনাকে অবাধ মুক্তি দিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাল্মীকির আদর্শ পরিত্যাগ করে তিনি নতুন মহাকাব্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উক্তিই তার প্রমাণ—"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki." (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', পৃঃ ১৩৮)

৩০. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় মধুসূদনের ততটা বিরোধী ছিলেন না। কারণ মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "Your friend

বাকিটা মজ্জাগত ভারতীয় হিন্দুসংস্কারের তথাকথিত প্রতিকূলতার জন্য মধুসূদনের প্রতি প্রথমদিকে তাঁর মন বিমুখ হয়েছিল। বাল্যকালে এ-কাব্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল বলেই যে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, 'জীবনস্মৃতি'তে যার সমর্থন পাওয়া যাবে -সেটা অন্যতম কারণ হতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

'ভারতী'র (১২৮৪ ফাল্গুন) শেষ কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে লক্ষ্মণপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং মূল মহাকাব্য থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে, মধুসূদনের লক্ষ্মণও যে সার্থক হয় নি এমনি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেই ছেদ টেনেছেন। বস্তুতঃ এই কিস্তিতে মূল রামায়ণের অনুবাদের উদ্ধৃতিই অনেক জায়গা জুড়ে বসেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্মণকে বিশ্লেষণ না করে, শুধু বাল্মীকি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি মনে করেছেন, এর পর নতুন ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। সর্বশেষে উপসংহারের মুখে এসে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন, সে-কথাই তিনি নানা দিক দিয়ে 'ভারতী'র ছটি সংখ্যা ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

> "এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু কাপুরুষরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়।"

এই তীব্র মন্তব্য, নিস্পৃহভাবে ভেবে দেখলে, অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত

Baboo Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it, S—(মহর্ষির জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়) told me the other day that he (Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man" meaning your fat friend of No 6 Lower Chitpore Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go." (ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৭)

বলে মনে হবে। তবে আমরা আগেই বলেছি সে-যুগের অন্যান্য সমালোচকের মতো কিশোর রবীন্দ্রনাথও পদে পদে বাল্মীকির আদর্শের নিরিখে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বিচার করতে গেছেন, এবং প্রাচীন বা সনাতন মহাকাব্যের মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন। কাজে-কাজেই রাবণের শোকার্ত হৃদয়, রামের স্নেহব্যাকুলতা প্রভৃতি কোমল ভাব তাঁর কাছে বিরক্তিজনক এবং মহাকাব্যরসবিরোধী মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যথার্থ মহিমা বুঝতে পেরেছিলেন (দ্রঃ 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "সাহিত্যসৃষ্টি" প্রবন্ধ)। সেজন্য কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ঔদ্ধত্যের বশে লেখা সমালোচনা ত্রুটির জন্য তার লজ্জার সীমা ছিল না।

৪

১২৯৯ সনের 'নব্যভারতে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ক্রমাগত কয়েক সংখ্যা ধরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু "মেঘনাদবধ চিত্র" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে মধুসূদনের চরিত্রচিত্রণ-শক্তি ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে 'ভারতী'তে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ' বিষয়ক প্রথম সমালোচনাটি উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা সমালোচকের বহু ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে মাইকেলকে সমর্থন করেন। ঐ সনের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যার 'সাধনা'য় "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা"য় রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জবাবদিহি করেছেন, "বহুকাল হইল প্রথম বয়সে ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে (অর্থাৎ 'নব্যভারতে'র প্রবন্ধে) তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন” (সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯, পৃঃ ৪৪২)। বত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন। বত্রিশ বছরের পরিণতবয়স্ক কবি পনের বছরের বালকের লেখা সমালোচনাটির জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেছেন। উপরন্তু এটি "লোকবিস্মৃত সমালোচনা", তাও তিনি বলেছেন। দেখা যাচ্ছে এই সমালোচনাটি একদা খুব ঘটা করে লিখলেও পরবর্তীকালে এটিকে যেন মুছে ফেলতে পারলেই তিনি খুশি হতেন। ‘জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে’ “অবসরসরোজিনী”-কে নিন্দা করলেও ‘জীবনস্মৃতি’তে এর জন্য তিনি লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন নি, বরং বাল্যবয়সের আতিশয্যোক্তিপূর্ণ অকালপরিপক্ব উক্তির জন্য কিছু কৌতুক বোধ করেছেন। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধটি লিখে পরবর্তীকালে তার জন্য বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রবন্ধটি লেখার পাঁচ বছর পরে কুড়ি-একুশ বছরের তরুণ কবি ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র প্রতি যে আর একটি তীক্ষ্ণতর অব্যর্থলক্ষ্য শর নিক্ষেপ করেছিলেন তা বোঝা যাবে ১২৮৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা ‘ভারতী’তে প্রকাশিত ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ প্রবন্ধে। এটিতে তাঁর নাম ছিল। সুতরাং একুশ বৎসর বয়সে আরও সুদৃঢ় যুক্তি ও বিবেচনা সহ তিনি মধুসূদনকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেছেন। এর পাঁচ বছর পরে ১২৯৪ সালে (১৮৮৮) প্রকাশিত তাঁর ‘সমালোচনা’ প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে এটি গৃহীত হয়। লোকে ‘ভারতী’র প্রথম সমালোচনাটি ভুলে গেলেও, এই দ্বিতীয় আলোচনা দীর্ঘকাল মনে রেখেছিল। ‘সমালোচনা’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি, ফলে এ প্রবন্ধটির আর পুনঃপ্রকাশ ঘটে নি। অবশ্য এই সঙ্কলনের দু’একটি প্রবন্ধ[৩১] কিছু মার্জিত হয়ে

---

৩১. ‘সমালোচনা’র “চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি”র কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়ে ‘আধুনিক সাহিত্যের “বিদ্যাপতির রাধিকা”য় পরিণত হয়েছে। ‘সমালোচনা’র “ডি-প্রোফাণ্ডিস” সংক্ষিপ্তাকারে ‘আধুনিক সাহিত্যে’র মধ্যে গৃহীত হয়েছে।

পরবর্তী প্রবন্ধগ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে ১২৮৪ সাল ('ভারতী'র প্রথম বর্ষ) থেকে ১২৮৯ সাল ('ভারতী'তে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ) পর্যন্ত এবং তারও পাঁচ-ছ বছর পরে প্রকাশিত 'সমালোচনা' গ্রন্থের প্রকাশ কাল পর্যন্ত মধুসূদন-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল ধারণার কোন পরিবর্তন হয় নি, বরং দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে ধারণা আরও তীব্র হয়েছে।

এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক ছিলেন না। তখন তিনি যুবক। 'সমালোচনা' গ্রন্থে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় তাঁর বয়স আরও বেড়েছে। প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে কিছু কিন্তু-কিন্তু বোধ করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে তিনি কোথাও সঙ্কোচ প্রকাশ করেন নি। সুতরাং মনে হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত প্রতিকূল অভিমতে দীর্ঘ দিন তিনি দৃঢ় হয়ে ছিলেন। এই প্রবন্ধটি পূর্বের চেয়ে অনেক ছোট, যত ছোট তত তীব্র ও তীক্ষ্ণ। পূর্ব প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধে'র অনেক ত্রুটি দেখালেও কিছু কিছু প্রশংসাও করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধটি নির্জলা নিন্দা। এই সময়ে তিনি 'ভারতী'তে নানা গুরুতর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন — বিশেষতঃ কলকাতার সাহিত্যিকদের কাছে, ঠাকুরবাড়ির অনুরাগী মহলে এবং ব্রাহ্মসমাজে যুবক রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল। তখন তাঁর মতামতের প্রতি বিদ্বজ্জন নিতান্ত অবহেলা দেখাতে পারেন নি। এই প্রবন্ধ লেখার দু'বছর পরে (১৮৮৪) তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সুতরাং সমস্ত আলোচনায় তিনি যথেষ্ট 'সিরিয়স' হয়ে উঠেছিলেন। সে-যুগে 'ভারতী' ও 'সাধনা'তে যে সমস্ত পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশিত হত, তার অধিকাংশই তাঁর লেখা। তখন সারস্বত সমাজে তার যথেষ্ট পরিচিতি-লাভ ঘটেছে। এমন কি নিতান্ত তরুণবয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তকে'র সুকঠোর সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি (ভারতী, ভাদ্র, ১৮৮৪)। সুতরাং মধুসূদনের

প্রতি পুরাতন বিরাগ, প্রথম প্রবন্ধ রচনার পাঁচ বছর পরে, আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

প্রথম সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কেন্দ্রীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, বোধ হয় ধরতেও পারেন নি। তাই শুধু চরিত্রের অসঙ্গতি এবং রচনার ত্রুটিকে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ বাদ দিয়ে তার মূল ভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখে একটি অতি-প্রধান ও পুরাতন প্রশ্নের পুনর্বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন :

> "আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া, তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৯)

এখন তাঁর এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, কোন্ মানদণ্ডের বিচারে তিনি পরিণত বয়সেও এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

প্রবন্ধটির অর্ধেকের মতো স্থান ভূমিকায় পূর্ণ, সাহিত্যের নানা আঙ্গিক, *motif* ও উপাদান নিয়ে আলোচনার পরে তিনি 'মেঘনাদ-বধে'র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রবন্ধের প্রথমে সৃজনকর্ম ও ছাচগড়ার মধ্যে কী পার্থক্য, তা বিশদভাবে আলোচনা করে বলেছেন যে, সৃজনকারী বা স্রষ্টা নিজের অনুভূতিকেই প্রকাশ করেন। বাইরের বস্তু তাঁর মনে গিয়ে যে মৌলিক ও নিজস্ব বস্তু হয়ে ওঠে, তাকে প্রকাশ করলে তা সৃষ্টির গৌরব পায়—যেমন বাল্মীকি প্রভৃতি মহাকবিরা। কিন্তু যারা মৌলিক জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না, নিজের মনের অনুভূতিকে মূর্তি দিতে পারে না, তারা শুধু কেরানীর মতো আসলের নকল করে এবং তার ফল—ব্যর্থতা। যথার্থ কবি ঈশ্বরের মতো স্রষ্টা। ঈশ্বর যেমন বিশ্বের মধ্যে নিজেকেই নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, তেমনি, "কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই।" বলা বাহুল্য এখানে তিনি সংস্কৃত

আলঙ্কারিকের "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি" এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন, যদিও তখন অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। সে যাই হোক, সৃষ্টিকর্ম কবিপ্রতিভার একমাত্র লক্ষণ। যারা কবি নয়, তারা শুধু রাশি রাশি নকল করে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি মহাভারত ও 'বিষবৃক্ষে'র দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। নকলকারীরা ছাচের বাঁধা ছক ছাড়া নিজের স্বাভাবিক মনের কথা বলতে পারে না। মহাভারতে 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' প্রমাণিত হলেও এটি আসলে একটি বিরাট ট্র্যাজেডি। 'বিষবৃক্ষে'র সমাপ্তিতে নায়ক-নায়িকা পুনর্মিলন বর্ণিত হয়েছে বলেই কি তাকে কমেডি বলতে হবে? এখানে এই সমালোচনায় তাঁর সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বুদ্ধি এবং সমগ্র রসদৃষ্টির অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যাবে। বোধ করি এর আগে কেউ মহাভারতকে ট্র্যাজেডি বলেন নি, বা 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের মধ্যেও যে "চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল"—ঠিক এভাবে তার পূর্বে কেউ আলোচনা করেন নি। তিনি বলতে চেয়েছেন, যারা নকল করে, তারা ছাঁচ থেকে তৈরি করে—জীবন থেকে নয়। তারা হয়তো মহাভারতের "জয়ের মধ্যেই পরাজয়ের রহস্য" বুঝতে পারবে না, বা চিরাচরিত প্রথামতো 'বিষবৃক্ষ'কে সুখান্ত উপন্যাস বলেই মনে করবে। কারণ অন্তিমে তো নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন দেখান হয়েছে। এখানে তিনি বোধ হয় ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন, বাল্মীকি-বেদব্যাসাদি মহাকবিরা ছাঁচ দেখে সৃষ্টি করেন নি, মহৎ ভাবের আবেগ সৃষ্টি করেছেন মধুসূদনের মতো ক্ষুদ্রপ্রতিভার কবিরা ছাঁচ দেখে নকল করেন।

এর পর রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য এপিক ও প্রাচ্য মহাকাব্যের তুলনা দিয়েছেন। এখানেও দেখিয়েছেন, নকলনবিশেরা মনে করেন, যুদ্ধ এবং কৃত্রিম বীবরসের লম্ফঝম্ফ না থাকলে বুঝি এপিক হয় না। তাঁরা মনে করেন, বুঝি একক ইচ্ছাকৃত চেষ্টার দ্বারা মহাকাব্য লেখা যায়। এপিক বা মহাকাব্য একটি মৌলিক সৃষ্টি, তাঁর ভাষায়—"সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া" এপিক লেখা যায় না। অতঃপর তিনি

দেখিয়েছেন, কীভাবে গীতিকাব্যের উৎপত্তি হয়, কীভাবেই বা মহাকাব্যের জন্ম হয়। "মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভবের উদয় হয়, তখন তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না।" এর তাৎপর্য—কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই গীতিকাব্যের একমাত্র নির্ঝর। অপরদিকে কোন উদারচরিত্র মহাপুরুষ বা বিরাট বীরপুরুষ অথবা দেশব্যাপী কোন বিশাল ঘটনা যখন কবিচেতনাকে বহির্মুখে আলোড়িত করে তখন মহাকাব্য রচনার পট প্রস্তুত হয়। এক-একটি দেশের মানসিক প্রবণতা অনুসারে এক-এক প্রকার মহা-কাব্যের সৃষ্টি হয়। হোমরের যুগে বাহুবলই ছিল বীরত্ব তথা মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়। এই জন্য তাঁর মহাকাব্যে বলদৃপ্ত ঘটনার প্রাধান্য। অপর দিকে ভারতীয় মহাকাব্যে যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা থাকলেও ধর্মবলই সেখানে মনুষ্যত্বের প্রধান নিয়ামক শক্তি। এরপর রবীন্দ্রনাথ সরাসরি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন।

প্রবন্ধটির গতি ও প্রবণতা দেখে একথা মনে করাই স্বাভাবিক যে, 'মেঘনাদবধে'র পুনরায় দোষকীর্তন করার জন্যই তিনি দ্বিতীয় বার প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন বোধ করেছেন এবং তার গৌরচন্দ্রিকাস্বরূপ নানা তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন। প্রথমেই তিনি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র পক্ষে ব্রিফ নিয়ে বলেছেন :

> "হেমচন্দ্রবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নামমাত্র-মহাকাব্য শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।[৩২]" (অচলিত সংগ্রহ, ২য়, পৃঃ ৭৮)

তাঁর আদর্শানুসারে মধুসূদনের মহাকাব্যের কেন্দ্রবিন্দু ও চরিত্রসৃষ্টিতে অনেক ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। কিন্তু সেই মানদণ্ডে বিচার করে তিনি কি করে হেমচন্দ্রের কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করলেন তা ভাববার বিষয়। মধুসূদনের প্রতি তিনি প্রতিকূল হয়েছিলেন বলে প্রবন্ধের

৩২. দ্বিতীয় প্রবন্ধের এই উদ্ধৃতিগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে।

বহু স্থলে যৌক্তিকতার পরিমাণসামঞ্জস্য ও অপক্ষপাতী মনোভাব বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁর মতে, 'মেঘনাদবধে' চরিত্রবিকাশ নেই, কিন্তু "অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে"—এরূপ পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যেরই-বা ভিত্তি কি? তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবিত্ব আছে, "কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়? কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে?" এখানে রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিচারের মূল কেন্দ্র থেকে সরে যান নি কি? যদি 'মেঘনাদবধে' "মহৎ চরিত্রের মহৎ কার্য" না থাকে, যদি চরিত্র-বিকাশ বাধা পেয়ে থাকে, তাহলে তাতে কবিত্ব আছে, একথার অর্থ কি? কবিত্ব-বস্তু কি কাব্যশরীরের অনিত্য ধর্ম? 'মেঘনাদবধে' যদি চরিত্রাদি না থাকে, তবে তার কবিত্বও নেই। গোটা কাব্যশরীরের রসপরিণামই কবিত্ব। কাব্য রসোত্তীর্ণ না হলেও তাতে কবিত্ব আছে, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিবিরোধী।

রামায়ণের তুলনায় 'মেঘনাদবধে' কোন মহৎ ভাব নেই—একথা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন। এ কাব্যের তুলনায় 'বৃত্রসংহার' যে অনেক শ্রেষ্ঠ এমন কথা বলতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর উক্তি:

> "রামায়ণ-মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়।"

তাঁর এ মন্তব্যটি বাজিয়ে দেখলেই এর শূন্যতা ধরা পড়বে। 'বৃত্র-সংহার' শুধু বিষয়গৌরবের জোরেই কি মহাকাব্য-পদবী লাভ করবে? অপরাধী বৃত্রাসুরের উচিত শাস্তি, দেবতাদের স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার, অধর্মের পতন ও ধর্মের জয়—এই সব রবিবাসরীয় নীতিকথা শোনবার জন্য কেউ মহাকাব্য পড়ে না, অন্ততঃ আধুনিক কালে তো নয়-ই। 'বৃত্রসংহারে'র কাহিনী মহাকাব্যের উপাদান হতে পারত। কিন্তু হেমচন্দ্রের অপরিণত কল্পনা, অসার্থক রচনাশক্তি এবং জীবনপ্রত্যয়ের

গতানুগতিকতা 'বৃত্রসংহার'কে মহাকাব্যের গৌরব লাভে বঞ্চিত করেছে। 'মেঘনাদবধে'র অধিকাংশ চরিত্রই প্রায় একই বেশভূষায় 'বৃত্রসংহারে' আবির্ভূত হয়েছে। কল্পনার দীনতা ও রচনাশক্তির দুর্বলতার ফলে এ কাব্য, মহাকাব্য তো দূরের কথা, সাদামাঠা পৌরাণিক কাব্য হিসেবেও রসোত্তীর্ণ হয় নি। 'মেঘনাদবধে'র বক্তব্যবিষয়, ভাবাদর্শ ও বাগ্মূর্তির বৈপ্লবিকতা শান্ত, সংযত ও নৈতিক সংস্কারে-লালিত রবীন্দ্রনাথের চিত্তস্থৈর্যকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এই জন্য অযৌক্তিক হলেও তিনি 'বৃত্রসংহার'কে 'মেঘনাদবধে'র ওপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বার বার অভিযোগ করেছেন, 'মেঘনাদবধে'র চরিত্রাদিতে কোন মহত্ত্ব নেই :

> "মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই, মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখদুঃখের সহচর হইতে পারে না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক-নিবর্তক হইতে পারে না।"

এখানে 'অমরতা,' 'প্রবর্তক', 'নিবর্তক' প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি মহাকাব্যের ফলশ্রুতি বলে মনে করেন, এবং যেগুলির অভাবের জন্য তাঁর মন 'মেঘনাদবধে'র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে তার ধারণা তখনও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। রামলক্ষ্মণ ও রাবণের মধ্যে অমরতা নেই। কিন্তু অমরতা বলতে তিনি কী নির্দেশ করেছেন—এবং তার অতি-প্রশংসিত 'বৃত্রসংহারে' সেই অমরতা কোথায় কতটুকু আছে তার কোন নির্দেশ দেন নি। বঙ্কিমের প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে 'মেঘনাদবধে'র চরিত্রের তুলনা দিয়ে তিনি বলেছেন :

> "পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদবধের রাবণরামলক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিররুদ্ধ সমাধিভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ-চন্দ্রশেখর হৃদয়ে বিরাজ করিবে।"

এখানেও তাঁর অমরতার ধারণা স্পষ্ট নয়। প্রতাপ-চন্দ্রশেখর মহৎ-ভাবের প্রতীক বলে আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন, আর মধুসূদনের চরিত্রগুলি অচিরে বিস্মৃত হয়ে যাবে, যেহেতু সেগুলি সদ্‌গুণের আধার নয়—তাঁর এ জাতীয় মন্তব্য যে যথার্থ কাব্যবিচার থেকে উদ্ভূত নয় তা বোধ হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্রয় না নিয়ে যদি তথ্য দিয়ে বিচার করা যায়, তা হলে কি মনে হবে, প্রতাপ-চন্দ্রশেখরই বাঙালীর হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছেন আর মধুসূদনের চরিত্রগুলি একেবারে হারিয়ে গেছে? মহৎ চরিত্র যেমন সাহিত্যে অমরতা পেতে পারে, তেমনি দুঃসহ, দুর্মদ, বর্বর শক্তিও সাহিত্যে স্থায়িত্বের গৌরব লাভ করতে পারে। সব কিছু নির্ভর করছে সৃষ্টিশক্তির ওপর। মিল্টনের শয়তান, শেক্সপিয়রের ইয়াগো যে হিসেবে অমরত্ব পাবে, 'মেঘনাদবধে'র কয়েকটি চরিত্র সেই ভাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এর পর রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধে' চিরপ্রচলিত সংস্কারের অর্থাৎ 'সিদ্ধরসে'র ব্যতিক্রম হয়েছে এই অভিযোগ তুলেছেন। এ অভিযোগ অলঙ্কারপ্রিয় পুরাতনপন্থী পণ্ডিতগণ তুললে আমরা বিস্মিত হতাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের মন্তব্য কিছু বিস্ময়কর। মাইকেল যদি আমাদের কাছে নতুন চরিত্রসৃষ্টির পরিচয় দিতে না পারেন, তবে তিনি সেই পরিমাণে কবিত্ব থেকে স্খলিত। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন—"এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দিকব্যাপী সেই কবিত্ব-জগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন?" মাইকেল জীবিত থাকলে বলতেন—রাবণ, মেঘনাদ, রাম-লক্ষ্মণ, সীতা-প্রমীলা প্রভৃতি। মহাকাব্যের সু-উচ্চ গিরিচূড়ায় অবস্থিত হলেও এঁরা নিজ নিজ মানবস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে অভিনব। সেই তুলনায় হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র চরিত্রগুলিকে কতটুকু "নূতন অধিবাসী" বলা যায়? তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই মোটামোটা দোষ বা গুণের প্রতীক মাত্র। তিনি স্থূল নৈতিক আদর্শ দ্বারা চরিত্রসৃষ্টি করতে গিয়েছেন। তাই চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব বহুস্থলে নিষ্প্রভ

হয়ে গেছে। এর পর রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি তুলে ধরে 'মেঘনাদবধে'র দোষ দেখিয়েছেন, তাও কম অযৌক্তিক নয়। মধুসূদনের অসতর্ক উক্তি "I despise Ram and his rabble"—এটি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ সক্ষোভে বলেছেন, যেহেতু মাইকেল রাম প্রভৃতিকে প্রাচীন সংস্কারানুযায়ী শ্রদ্ধা করেন নি, সেই হেতু "তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন।" "মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না", সেই জন্য হিন্দুর উপাস্য রাম-লক্ষ্মণ তাঁর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যও বোধহয় পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়। মধুসূদনের কল্পনা বিরাট শক্তি, প্রচণ্ড দম্ভ ও বিপুল বেদনার মধ্যে বিশালতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। রাবণ-চরিত্র সেদিক থেকে সৃষ্টির পূর্ণত্ব লাভ করেছে। মধুসূদন "রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" - এই নীতিবাক্য চরিত্রগুলিতে কেন ফুটিয়ে তুললেন না, এ প্রশ্নও অবাস্তব। এতাবৎকাল ধরে রাম-রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে বাঁধাধাঁধি ধারা চলে আসছিল, মধুসূদন সদম্ভে সে-সমস্ত মহাজন-খনিত পথ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করেছেন। সুতরাং পদে পদে তাঁর রচনা ও চরিত্রাদর্শের সঙ্গে প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সংঘর্ষ তো বাধবেই। কাজেই বাল্মীকির রামায়ণের অনুরূপ আদর্শ মধুসূদনে নেই বলে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে নস্যাৎ করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ এই প্রবন্ধের বারো আনা অংশে রবীন্দ্রনাথ সেই অভিযোগ পুনঃ পুনঃ তুলেছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, 'মেঘনাদবধে' মাঝে মাঝে চরিত্রগত ও রচনাগত অসঙ্গতি আছে। রচনাশক্তির অভাবনীয় মৌলিকতা সত্ত্বেও এ কাব্যের কোন কোন স্থলে নানা ধরনের ছোটবড়ো ত্রুটি আছে। অষ্টম সর্গের নরক-বর্ণনায় বিদেশী বিদ্যা জাহির করার উৎকট চেষ্টা দেখা যায়। তাই বলে তিনি "তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানাহেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়া-তাড়া লাগাইয়াছেন"—রবীন্দ্রনাথের এ প্রীতিহীন মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি মধুসূদনের "কৃত্রিম ও দুরূহ" ভাষাকে নিন্দা করেছেন—

তাও বোধ হয় পুরোপুরি সঙ্গত নয়। তিনি বলেছেন যে, বাল্মীকির কাব্য যেমন সহজ ভাষায় লেখা, মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধে’র ভাষা সেরকম নয়। তাতে বহুস্থলে কৃত্রিমতা ও দুরূহতা আছে। রবীন্দ্রনাথের এ অভিমত কিয়দংশে সত্য। কিন্তু Epic of Art-এর ভাষা ও বাণীভঙ্গিমা কিছু আভিধানিক ও দুরূহ হওয়াই সম্ভব। এই জাতীয় মহাকাব্য, যা পরবর্তী যুগে লেখা হয়েছে, তার রচনাভঙ্গিমা কিছু কৃত্রিম হয়েই থাকে। বাল্মীকির কাব্য গান বা সোচ্চারে পাঠ করবার জন্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু ‘মেঘনাদবধে’র মতো সারস্বত মহাকাব্য (Epic of Art) পড়ার জন্য রচিত হয়েছে। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, কলাকৃতি, আলঙ্কারিক কারুকাজ, ভাষার দুরূহতা সারস্বত মহাকাব্যের দোষ নয়, গুণই। রবীন্দ্রনাথ যাকে কৃত্রিমতা বলে নিন্দা করেছেন, পরবর্তীকালের আলঙ্কারিক মহাকাব্যের তাই হচ্ছে লক্ষণ। বাল্মীকি ও কালিদাস, ভারবি ও মাঘের সঙ্গে মাইকেলের রচনা তুলনা করলেই সে কথার সত্যতা বোঝা যাবে। কিন্তু শেষে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করে শেষ করেছেন :

> “এই বঙ্গমহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা, আমাদের ভাল লাগিবে না, লড়াই বর্ণনা তেমন ভালোরকম হোতে পারে না। তোমরা [illegible] আদর্শ [illegible] করিতে যাও, বাঙালীদের মানুষ হইতে শিখাও।”

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, লড়াই বর্ণনা ‘মেঘনাদবধে’ কিছু আছে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ বেশী নয় এবং ‘বৃত্রসংহারে’র তুলনায় সে বর্ণনা নিকৃষ্টও নয়। কবি তথাকথিত বাঙালী মহাকবিদের উপদেশ দিয়েছেন, তারা যেন কতকগুলো আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করেন, বাঙালীকে সেই আদর্শের আলোকে মানুষ হতে শেখান—এটি সাহিত্যের উপরি পাওনা। বঙ্কিমযুগে এবং উনিশ শতকের শেষভাগে দেশপ্রেম ও জাতিগঠনমূলক নব্যমানসিকতার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, উচ্চতর চরিতাদর্শ এবং তার দ্বারা বাঙালীর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—কাব্য-সাহিত্যের এই আদর্শ হওয়া উচিত। হেমচন্দ্রের

মোটা হাতের রচনা 'বৃত্রসংহারে' সেই ধরনের আদর্শ বেশী আছে বলে রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের অনাবশ্যক প্রশংসা করেছেন, যদিও তাঁর উচ্চ আদর্শের মাপকাঠিতে উক্ত মহাকাব্যটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে-বিষয়ে তিনি কাব্যলক্ষণ ও রসপরিণাম ধরে বিচার করেন নি। অপরদিকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে' চিরাচরিত ভারতীয় আদর্শ কিছু লঙ্ঘিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ খুব খোলা মন নিয়ে এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে পারেন নি। তা নইলে তাঁর মতো রসগ্রাহী ও বিচক্ষণ সমালোচক কীভাবে হেমচন্দ্রের ওপর এত প্রশংসাপূর্ণ বাক্যের অপব্যয় করলেন? এখানে দেখা যাচ্ছে, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য সম্বন্ধে তিনি ঠিককথা বললেও মহাকাব্য যে দু জাতের এবং প্রাচীন ক্লাসিক যুগের মহাকাব্যের সঙ্গে রেনেসাঁস ও উত্তর-রেনেসাঁস যুগের মহাকাব্যের যে অনেক পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে তখন তিনি ততটা সজাগ হতে পারেন নি। শেষোক্ত যুগের মহাকাব্যেরও গৌরব কিছু কম নয়। অনেক সময় প্রাচীন মৌলিক মহাকাব্যের তুলনায় অর্বাচীন কালের মহাকাব্য শুধু শিল্পাদর্শের দিক থেকে অধিকতর স্পৃহণীয় হয়ে থাকে। ভার্জিল থেকে মিল্টন পর্যন্ত—আলঙ্কারিক মহাকাব্যগুলি কি মৌলিক মহাকাব্যের তুলনায় নিষ্প্রভ? প্রাচীন মৌলিক মহাকাব্য এবং অর্বাচীন আলঙ্কারিক মহাকাব্যের মধ্যে গোত্রগত পার্থক্য আছে। হোমর এবং ভার্জিল-দান্তে-তাসো-মিল্টন এক আদর্শে বিচার্য নন। সে যুগের যাঁরা 'মেঘনাদবধে'র ত্রুটি ধরতে গিয়ে বার বার বাল্মীকি-রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, এবং 'মেঘনাদবধে' রামায়ণের আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে, মধুসূদনকে নিন্দা করেছেন তাঁরা authentic epic এবং ornate epic-এর যথার্থ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন না। 'মেঘনাদবধ'-সংক্রান্ত দুটো প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একই ভ্রান্তি হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি না হয় তাঁর পৌগণ্ড দশায় লেখা। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনাকালে তিনি নবীন যুবক, উক্ত প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি পরিণত যুবক—তখন তাঁর রসবোধ ও বিচারবুদ্ধি আরও পরিণতি

লাভ করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আলঙ্কারিক মহাকাব্যের প্রতি স্বাভাবিক অনীহার জন্য তিনি অকারণে হেমচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন এবং অনেক সময় অকারণেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নিন্দা করেছেন।

রচনা, বিষয়সন্নিবেশ এবং সঙ্গতি-অসঙ্গতি-সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করে রেখেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক অতি-দ্রুততার-বশে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে' অনেক ত্রুটি আছে। উপরন্তু গ্রীক অদৃষ্টতত্ত্ব ও ভারতীয় কর্মবাদের মধ্যে জট পাকিয়ে যাওয়ার ফলে 'মেঘনাদবধে'র ভাব-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু যে কিছু বিচলিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তার ফলে রাবণ চরিত্রেও কিছু স্ববিরোধী গুণের সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরিকল্পনাগত সেই দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন নি। কারণ প্রশ্নের সঙ্গে তিনি 'মেঘনাদবধে'র রসপরিণাম বুঝতেই চান নি। প্রথম প্রবন্ধে তিনি গাছের মূলকে বাদ দিয়ে পত্রপল্লব বিচার করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি মূলকে উদ্‌ঘাটিত করবেন বলে পণ করেছিলেন। কিন্তু এ কাব্যের মৌলিক ত্রুটি, গ্রীক 'নেমেসিস' তত্ত্ব ও ভারতীয় কর্মবাদের বিরোধের ফলে কাব্যবস্তু পূর্ণ রসলাভে আংশিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে—এ বিষয়ে তিনি আদৌ সচেতন ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেও তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ—যা নীতিবোধসিক্ত সমালোচকের স্বাভাবিক গুণ, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে স্থির বিশ্বাস, মহাকাব্যের চরিত্রে সদাসর্বদা মহৎ আদর্শ দর্শনের ইচ্ছা, জাতীয় জীবনের উত্থান প্রভৃতি নীতিমার্গীয় মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে।

'ভারতী'র যে-সংখ্যায় (১২৮৯, ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক তার পরের সংখ্যায় (আশ্বিন) তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন —এটি যেন অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেরই পরিপূরক। সে প্রবন্ধে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অ্যারিস্টটল, সাহিত্যদর্পণকার ও হ্যুগ ব্লেয়রের মহাকাব্য-সংক্রান্ত সূত্র উদ্ধার করে সেই আদর্শে 'মেঘনাদবধ' বিচার করেছেন। এ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের মতো appreciative নয়, অনেকটা academic। কিন্তু তিনিও বাল্মীকি-রামায়ণের আদর্শে মধুসূদনকে বিচার করেছেন এবং মধুসূদন প্রাচীন ভারতীয় রামলক্ষ্মণাদির মহৎ আদর্শকে লণ্ডভণ্ড করেছেন বলে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।[৩৩] তাঁর মতে এ কাব্যে রামলক্ষ্মণকে নায়ক না করে রাবণ-মেঘনাদকে নায়ক করে কবি মহা-অপরাধ করে ফেলেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতে এ কাব্যে বস্তু সাজসরঞ্জাম আছে, মহাকাব্যের প্রাণ অর্থাৎ চরিত্রের মহত্ত্ববিকাশ তাহা নাই বলে, এর ব্যর্থতা প্রতি পদেই লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য তাঁর প্রবন্ধটিতে কনিষ্ঠের উগ্র সমালোচনাকে কিছু কোমল করার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই রামায়ণের আদর্শে 'মেঘনাদবধ' বিচার করেছেন এবং এতে ভারতীয় হিন্দু আদর্শ রক্ষিত হয় নি বলে রবীন্দ্রনাথের মতোই মাইকেলের নিন্দা করেছেন, তবে বাম হাতের দাক্ষিণ্যের দান স্বরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ভাষার তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণের যৎকিঞ্চিৎ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু স্বল্প প্রশংসা অনেক স্থলেই ছদ্মবেশী নিন্দামাত্র। তাঁর এ মন্তব্য সে-কথাই প্রমাণ করে। "কাব্যটি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদ উচ্চদরের নহে, উহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না" (ভারতী, ১২৮৯ আশ্বিন)। এই দুটি প্রবন্ধ 'ভারতী'তে প্রকাশের দশ বছর পরে 'নব্যভারতে' (১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ) ধারাবাহিকভাবে যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মেঘনাদবধ চরিত্র' নামে যে সুদীর্ঘ চরিত্র-সমালোচনা করেন তাতে মাঝে মাঝে কিশোর রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধটির কোন উল্লেখ করেন নি কেন বোঝা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ তিনি ইচ্ছে করলে নিজ মত

৩৩. উদ্ধৃতি পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক মতের প্রতিবাদ করতে পারতেন। তবে যোগীন্দ্রনাথেরও নব্য হিন্দুয়ানি-সংক্রান্ত কিছু গোঁড়ামি ছিল। মধুসূদন বাল্মীকির প্রাচীন আদর্শ খানিকটা পরিত্যাগ করে অন্য পথে গেছেন, এজন্য তিনিও সব সময় কবির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।

৫

এখন দেখা যাক 'ভারতী' পর্বে রচিত মধুসূদন-সংক্রান্ত দুটি প্রবন্ধের সমকালে রবীন্দ্রনাথ অন্য যে সমস্ত গদ্য নিবন্ধ ও কবিতা লিখেছিলেন, তা থেকে তাঁর সমসাময়িক মনোভাব, বিশেষতঃ সাহিত্য-বিচারঘটিত মূল্যমানের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় কিনা। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮২ অর্থাৎ যোল থেকে একুশ বছর পর্যন্ত—এই পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করেছেন এবং ফিরেও এসেছেন। ফিরে আসবার পরে 'ভারতী' পত্রিকায় আসর জাকিয়ে বসেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বউঠাকুরানী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—এঁদের সাহায্যে ও উৎসাহে তাঁর খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, বিদেশী সাহিত্য চর্চা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি তীব্র প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। তখন তিনি কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপনীত। উপন্যাস ('করুণা'), বড় গল্প ('ভিখারিণী') ব্যক্তিগত নিবন্ধ ('বিবিধ প্রসঙ্গ'—১০৮১ সালে রচনারম্ভ, ১৮৮৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), 'ভারতী'র "সম্পাদকের বৈঠকে" সুইনবার্ন, রসেটি, শেলী, বায়রন, ভিক্টর হ্যুগো, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ম্যুর প্রভৃতি বিদেশী কবিদের অনুবাদ, তেইন অবলম্বনে ইংরেজী সাহিত্যের গোড়ার দিকের ইতিহাস সমালোচনা এবং দান্তে, পেত্রার্কা, ও গ্যয়টের প্রেমজীবন সম্বন্ধে নানা ছোটবড়ো প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'কবিকাহিনী' (প্রথম সর্গ ১২৮৪ সালের পৌষ মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত, কাব্যাকারে

প্রকাশিত ১৮৭৮), ভানুসিংহের ভণিতায় মুদ্রিত কবিতা সমূহ (প্রথম কবিতা ‘সজনী গো, আঁধার রজনী ঘোর ঘটা’— ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ‘ভারতী’তে প্রকাশিত, ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), ‘ভগ্নতরী’ (১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসের ‘ভারতী’তে ‘ভগ্নতরী’র প্রথম-পঞ্চম সর্গ প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত), ‘ভগ্নহৃদয়’ (১২৮৭ সালে কার্তিক-ফাল্গুন সংখ্যার ‘ভারতী’তে প্রকাশিত, ১৮৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), ‘রুদ্রচণ্ড’ (১৮৮১), ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ (১৮৮৬-৮৭ সালের ‘ভারতী’তে “য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র” নামে মুদ্রিত) ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ (১২৮৭-৮৯ সালের ‘ভারতী’তে প্রকাশিত, ১৮৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), ৫১তম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উৎসব উপলক্ষে রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতাদি (১৮০২ শক অর্থাৎ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ‘তত্ত্ব-বোধিনী’তে প্রকাশিত “তুমি কিগো পিতা আমাদের”, “মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ”, ১২৮৭ সালে কার্তিক মাসের ‘ভারতী’তে “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা” প্রভৃতি গান ১৮৮১ সালে প্রকাশিত ‘রবিচ্ছায়াতে’ সঙ্কলিত হয়), ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ গীতিনাট্য (১৮৮১ সালে প্রকাশিত) প্রভৃতি। এ ছাড়াও কয়েকটি গদ্যনিবন্ধ (বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কবিতাপুস্তকে’র সমালোচনা ভারতী, কার্তিক, ১২৮৫ ; বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৭ , ‘বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা’ ভারতী, বৈশাখ, ১২৮৮ , সঙ্গীত-সংক্রান্ত দুটি প্রবন্ধ— সঙ্গীত ও ভাব’, ‘সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা’—ভারতীর ১২৮৮ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ ; অক্ষচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে’র সমালোচনা-ভারতী, শ্রাবণ, ১২৮৮ ; এই বিষয়ে বিতর্ক—ভারতী, ভাদ্র ১ ৮৮ ; টেনিসনের ‘ডি প্রোফাণ্ডিস’ সম্পর্কে আলোচনা[৩৪]—‘ভারতী’, আশ্বিন-কার্তিক, ১২৮৮ ; ‘অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজি কবি’—-

৩৪. প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, এই প্রবন্ধে তিনি ‘প্যারাডাইজ লস্ট্’-এর তুলনায় ‘ডি-প্রোফাণ্ডিস’-কে অধিকতর উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলেছেন।

ভারতী অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ ; 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ব্যক্তিগত নিবন্ধ—১৮৮৩ সালের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) থেকে রবীন্দ্রনাথের চেতনাপ্রবাহের স্বরূপ মোটামুটি বোঝা যাবে। 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী', 'ভগ্নতরী', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'শৈশব সঙ্গীতে'র অন্তর্ভুক্ত দু'চারটি কবিতা এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিতাগুলিতে অকারণ-বিষণ্নতা, অহেতুক ব্যর্থতা ও অবাস্তব বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে। তার পশ্চাদ্‌পটে প্রাথমিক এবং অপরিপক্ব আবেগের অতিরেক, নিঃসঙ্গ কবিমানসের বিলাপ এবং জগৎ ও জনতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুলতা দেখা যায়। তার থেকে মনে হচ্ছে কিশোর কবি চিররোমান্সের সুদূর অলকাপুরীর দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। জীবনের অন্তর্লীন প্রেম, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার ভাবমূর্তি যখন ইন্দ্রিয়ময় বস্তুজগতের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছে না, তখন কবি মর্ত্যধরিত্রী পরিত্যাগ করে স্বপ্নস্বর্গের দূরাস্তৃত সীমায় স্বর্ণপক্ষ ঈগলের মতো যাত্রা করতে চাইছেন। যা আছে তার প্রতি অনীহা এবং যা নেই তার প্রতি অভীপ্সা -রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীতে'র (১৮৮৩) পূর্ববর্তী প্রায় অধিকাংশ গদ্য-পদ্য রচনায় লক্ষ্য করা যাবে। তখন তিনি যেমন মনে মনে 'সব পেয়েছি'র দেশের পথ খুঁজছিলেন, তেমনি সেই নিত্যসৌন্দর্য-জগতের যথার্থ সন্ধান করছিলেন অন্যের সাহিত্যে ও রচনায়। মধুসূদনের বহুবিঘোষিত মহাকাব্য মন্থন করে তিনি নিজের অন্তর্লোকের হারা-মণিটি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু "সমচক্রন্দসী নক্রভরা" 'মেঘনাদবধে'র তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রতলে স্বর্ণাভ বালুশয্যায়, যেখানে বারুণীর কেশসজ্জা করে দেন সখী মুরলা, সেই হিমস্তব্ধ তরল নীলিমার মধ্যেও কবি রসের যথার্থ সন্ধান পেলেন না। তারপর এ মহাকাব্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে সমগ্র লঙ্কা পরিক্রমণ করলেন ; কিন্তু বর্মচর্মপরিহিত যক্ষরক্ষের রণহুঙ্কার, রাম-রাবণের বিপরীত আদর্শ প্রভৃতির মধ্যেও তৃপ্তি পেলেন না। কারণ তাঁর ভোগবৈশিষ্ট্য হল একাকিত্বের রস, নিঃসঙ্গ বেদনা ও অবিকারী সৌন্দর্যবোধের রস। তাই তিনি বরং হরু ঠাকুরের গানের প্রশংসা করেছেন। কারণ সেই সমস্ত সরল রচনায় রাধার অন্তর্বেদনার

ব্যঞ্জনা আছে—হোক তা রচনা হিসেবে অসার্থক। কিন্তু মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তাঁর রসভোগের সমর্থন মেলে নি। তাঁর বেদনাবিদ্ধ রোমান্টিক হৃদয় 'মেঘনাদবধে'র মধ্যে যে শান্তি পাবে না তাতে আর আশ্চর্য কি? বাল্যকালে এ কাব্য তাঁর পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত ছিল বলে এর প্রতি তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল—এ কারণও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, এ কাব্যে ভারতের চিরাচরিত সংস্কার কোন কোন স্থানে লঙ্ঘিত হয়েছে, এ কারণেও তাঁর মন মধুসূদনের প্রতি বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু সকলের চেয়ে যে কারণটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে, গীতিরসে আকণ্ঠ-মগ্ন কবি বস্তুপ্রধান মহাকাব্যের উচ্চকিত কলরবে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। সেই বিরূপতাই তাঁকে মধুসূদনের দোষসন্ধানী করে তুলেছে। এ যুগে রচিত তাঁর কাব্যকবিতা, গীতিগুচ্ছ, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কয়েকটি নিবন্ধ এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত কয়েকটি গদ্য নিবন্ধে কবির এই উদাসীন ও হতাশ হৃদয়ের অস্ফুট স্বরটি কিছু ধরা পড়েছে। তাই 'মেঘনাদ-বধে'র জনতা ও কোলাহলের প্রতি তিনি মনে মনে কিছু বিরক্তি বোধ করেছিলেন—তারই প্রকাশ ঘটল দুটি তীব্র সমালোচনায়। অন্তরের স্বাভাবিক আবেগ, সরস রচনা এবং মানুষের অন্তর্জীবনের নিরাভরণ প্রকাশ—এগুলিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন। বলা বাহুল্য, এ লক্ষণগুলি 'মেঘনাদবধে' তিনি বিশেষ পান নি। 'মেঘনাদবধে'র প্রতি জমে-ওঠা ব্যক্তিগত বিরূপতাকে তিনি যুক্তিতর্কের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন, এবং বেছে বেছে অসঙ্গতি ও ত্রুটিগুলিকে ধরে ধরে সাজিয়ে দিয়েছেন। 'বৃত্রসংহারে'র প্রতি কিছু প্রসন্নতার কারণ, এ কাব্যের মোটা সুর অনুভূতির বাইরে আঘাত করে, মধুসূদনের সৃষ্টির মতো অন্তর্লোক পর্যন্ত ধাওয়া করে যুগযুগান্তসঞ্চিত মূল্যমান-গুলিকে বিপর্যস্ত করে দেয় না। ফলে মধুসূদনের চেয়ে হেমচন্দ্রের প্রতি তিনি কিছু বেশী সহানুভূতিশীল; কিন্তু 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রতি বর্ষিত প্রশংসাপুঞ্জে যৌক্তিকতার মান রক্ষিত হয় নি।[৩৫]

৩৫. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, "বালকের লিখিবার শক্তি

অবশ্য পরবর্তীকালে 'মেঘনাদবধে'র যথার্থ স্বরূপ বোধ হয় তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করেছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "সাহিত্যসৃষ্টি" প্রবন্ধে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য', বিশেষতঃ রাবণ চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, বোধ করি এখনও পর্যন্ত তার চেয়ে গভীর ও মৌলিক কথা বলা হয় নি। রাবণের রসপরিণাম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে চিরদিন সগৌরবে স্বীকৃত হবে। উত্তরকালে তিনি রাবণ চরিত্রের তৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার প্রাসাদচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব গজে পৃথিবী কম্পমান, ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এত দিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে

ছিল অসাধারণ, প্রকাশের বাধা ছিল সামান্য, সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড ছিল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম, পৃঃ ৫৯)। কিন্তু বালক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারবোধ খুব অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ছিল না। ব্যক্তিগত আবেগ-গভীরতা ও বেদনাবোধই যেন তাঁর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই বিষণ্ণতা ও বেদনাবোধের জন্যই তিনি সমসাময়িক কালে রচিত বস্তুপ্রধান এবং loud ধরনের উচ্চ নিনাদপূর্ণ মহাকাব্যের প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন নি।

চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

এর কারণ, নবীন য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, অপূর্ব পার্থিব ঐশ্বর্য ও প্রচণ্ড শক্তির ঘন ঘন বিদ্যুৎপ্রবাহ যখন আমাদের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনের নির্ভর নিরাপদ সুখবিলাস কেড়ে নিল, তখন, "এই শক্তির গুণগানের সঙ্গে আধুনিককালে রামায়ণকথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল।" কবির মতে, এটা কোন ছন্নছাড়া উদ্ভট কবির খেয়াল নয়। সমস্ত দেশের মন জুড়ে যে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলেছিল, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তারই একটি সাগ্নিক প্রতীক। উল্লিখিত আলোচনায় (১৩১৪, আষাঢ়) তিনি 'মেঘনাদবধে'র তাৎপর্যকে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে রেখে এর রস বিশ্লেষণ করেছেন এবং পাঠককেও তার অংশভাগী করেছেন। অবশ্য মধুসূদনের ছন্দ ও বাক্‌রীতি যে বাংলাভাষার ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে নি, তা রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শেষজীবনে স্পষ্টই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন, "মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলঙ্কৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব উপাদান-রূপে স্বীকৃত হল না।"[৩৬] এ ধরনের ঈষৎ ঊনার্থক মন্তব্য করলেও তিনি মধুসূদনের "অসামান্য কবিত্বশক্তিকে" অস্বীকার করতে পারেন নি। মাইকেলের ছন্দ ও শব্দপ্রকরণে যুক্তাক্ষরবহুল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতাও তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে স্বীকার করেছিলেন।[৩৭] মধুসূদনের কাব্যে 'ইরম্মদ', 'যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' প্রভৃতি গালভরা শব্দঝঙ্কারের দ্বারা "ধ্বনিটা

৩৬. পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ [illegible]৯২

৩৭ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছন্দ সম্পর্কে আলাপে রবীন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য—শ্রীযুক্ত সেনের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ১৮৫

আঘাতে আঘাতে যে তরঙ্গিত হয়ে উঠছে”—সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তিনিও মধুসূদনের মতো তৎসম শব্দের ধ্বনিঝঙ্কারের পন্থা অনুসরণ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে ষোল বছর বয়সে ‘ভারতী’র সেই সমালোচনার উল্লেখ করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি বলেছেন “অল্প বয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা করেছিলুম, পরবর্তীকালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই সমতলতা এই দুর্বলতা দূর করবার জন্য গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।” ৩৮

কিশোর বয়সে এবং যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ‘মেঘনাদবধে’র যে তীব্র মর্মঘাতী সমালোচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে প্রবন্ধের উল্লেখ করে একাধিক বার তরুণ বয়সের অবিনয়ের জন্য লজ্জিত হয়েছেন, সে প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতি, আবেগ ও রুচিবোধ সমালোচকের নিস্পৃহ সমদর্শিতাকে কিছু অতিক্রম করলেও, বয়সের অনুপাতে তিনি সাহিত্য-বিচারে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর প্রথম বয়সের প্রবন্ধ-নিবন্ধের এই জীবন্ত ভাবটি পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ ‘সাধনা’ পর্বে গিয়ে চাঞ্চল্য হারিয়ে অটল গাম্ভীর্য লাভ করে। এই শেষোক্ত রচনাসমূহে কবি ব্যক্তিগত আবেগ ও রুচিকে তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা যথাসম্ভব সংযত করে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা বক্তব্যবিষয়কে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছেন।

৩৮. শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’, পৃঃ ১৮৫

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যতত্ত্ব : ভারতী পর্ব

১

সমালোচনা, রসভোগ ও রসসৃষ্টি—মনের তিনটি বৃত্তি। এ যেন মন নামক দেবতার ত্রি-আনন। একমুখে রসসৃষ্টি, একমুখে সেই রসভোগ এবং আর একমুখে সেই রসের বিচার-বিশ্লেষণ। এ তিনটি বৃত্তি একই মনের স্বরূপ হলেও সব সময়ে এরা একই ব্যক্তির তাঁবেদার নাও হতে পাবে। নিছক কবি যে-হিসেবে রসস্রষ্টা, ঠিক সে-হিসেবে রসভোক্তা নন। তিনি যখন নিজ শিল্পের রসভোগ করেন, তখন স্রষ্টার গৌরবময় ভূমিকা ছেড়ে তাঁকেও পাঠকের সঙ্গে নিম্নাসনেই বসতে হবে। আর যখন রসবিচার-বিশ্লেষণ করবেন তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ হতে হবে। নিজের রচনাকে অপরের বলে মনে না করলে তিনি বিচার-বিশ্লেষণে সাথক হতে পারবেন না। তবে যিনি ভাগ্যবান, বাণীর কাছ থেকে দুর্লভ আশীর্বাদ পান, তিনি একে তিন, তিনে এক। সৃষ্টি, ভোগ ও বিশ্লেষণ এই তিন মণ্ডলে তিনি সহজেই মণ্ডলাধিপতি হতে পারেন। সৃষ্টিতে শুধু ভাবাবেগ, ভোগে ভাবাবেগের সঙ্গে বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণে নিছক বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য এ তিনটি মনঃপ্রবৃত্তি, যাকে বলে water-tight compartment বা পাঁচিলতোলা মন-মহল তা নয়। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আদান-প্রদান ও স্বজনসম্পর্কের সংযোগ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়স থেকে কীভাবে রসসৃষ্টি, রসভোগ ও রসবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ববর্তী দুটি আলোচনায় বোঝাতে চেয়েছি। প্রতিভার ব্যাপকতা, তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা অনেক সময়ে বয়োধর্ম মেনে চলে না—রবীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। বাল্য-কৈশোরে তিনি সাহিত্য-বিশ্লেষণে যে-ভাবে

নৈয়ায়িক কুশলতা দেখিয়েছেন, যেরকম ভেঙে ভেঙে সারস্বত বোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে তাঁকে একটি জাতিস্মর প্রতিভার বিচিত্র দৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য এ সমস্ত বাল্যরচনায় এখনও যুক্তিবুদ্ধির প্রাধান্য তত্টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কবি এখনও ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের একপেশে যুক্তি ছাড়তে পারেন নি, বা চান নি। কোথাও কোথাও নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগার চড়া সুর তাঁর বিচারবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, বিভ্রান্তও করেছে। ফলে বুদ্ধিগ্রাহ্য সাহিত্যবিচার আবেগের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। বাল্য-কৈশোরের ভাবাবেগ-আবিষ্ট মুহূর্তে সাহিত্যবিচারে নিস্পৃহতা রক্ষা করাও দুরূহ। বাল্যরচনার এই সব ত্রুটির জন্য উত্তরকালে কবি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করেছেন। 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত এই সমস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ সম্পর্কে কুণ্ঠিত হয়ে তিনি বলেছেন, "কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা" ('জীবনস্মৃতি')। হয়তো একথাও তাঁর সত্য যে, "নিশ্চয়ই অনেক সময়ে লেখার বিষয়টাকে ছাপাইয়া নিজের কণ্ঠটাই সমুচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই ফাঁকিটা কালের নিকট একদিন ধরা পড়িবে" (জীবনস্মৃতি)। বয়োগুণে স্বল্প-বয়সের মানুষ ভাবের জগতে কিছু উচ্চভাবা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে অতিরঞ্জন ও অতিকথনকে স্বাভাবিকতার সিংহাসনে স্থাপন করতে চায়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় সেই লক্ষণটি একটু বেশী প্রকট হয়েছে, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'ভারতী' পর্বের গোড়ার দিকেও, বিশেষতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমালোচনায় তার "উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা" একটু-আধটু ফুটে উঠলেও বুদ্ধির প্রখরতা, বিশ্লেষণের তির্যকতা এবং রসপরিণামের সমগ্রতা বালককবির বিশ্লেষণশক্তিকে ধীরে ধীরে স্ফুটতর করে তুলছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এবার আমরা 'ভারতী' পর্বের পরবর্তীকালের রচনা থেকে যুবক-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা ও রসবিচারপদ্ধতির গতিপ্রবণতা এবং তার

স্বরূপবৈশিষ্ট্য বুঝে নেবার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করব যে, 'সাধনা' পর্বে এবং পরিণত বয়সে সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও আদর্শ বহুল পরিমাণে এই 'ভারতী' পর্ব থেকেই রস সংগ্রহ করেছে।

আগেই বলেছি, 'ভারতী' পর্বের সাহিত্য-সমালোচনা ও অন্যান্য গদ্যনিবন্ধ সম্পর্কে পরবর্তীকালে কবির কুণ্ঠার সীমা ছিল না। 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর' অচলিত-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সুবৃদ্ধ কবি এই সমস্ত বাল্য-কৈশোরের রচনা সম্বন্ধে বলেছেন, "এক সময়ে বালক ছিলুম, তখনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, কিন্তু সাহিত্যসভায় তাকে প্রকাশ্যতা দিলে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্কের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্যকব, কেননা সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পবিণত বয়সের, যে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোসে হাস্যকর কবে তোলা তার ধর্ম নয় —অন্ততঃ আমি তাই অনুভব করি।" এই জন্য নিজের বাল্যকৈশোরের বিস্মৃত রচনাকে পাঠকের দরবারে উপস্থিত কবতে তাঁর এত অনিচ্ছা। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, "প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছায় নি তারও মূল্য আছে হয়তো ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।" অচলিত-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কালে তাঁর অনিচ্ছা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। এ যুগের কাব্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে মায়ামোহ বর্জিত। এই "অকালে উদ্‌গত কবিত্ব" এবং "বড়ো বয়সের যোগ্য বড়ো বড়ো কথা বলবার স্পর্ধা এই সব লেখার মধ্যে অত্যন্ত কাঁচা ভাষায়" দেখা দিলেও, একটা শুধু সান্ত্বনা. সেটা ছিল নকলের যুগ, বিলেতি কাব্যপ্রকরণকে বাংলায় নকল করাকে সে-যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে দ্বিধা বোধ করতেন না। কেউ কেউ ভিক্টোরীয় যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছিলেন বোধহয় এলিজাবেথীয় ইংরেজী

সাহিত্যের ইতিহাসের আদর্শে।* সেই নকলের যুগে, বাঙালী শেলী-বায়রনের দাপটে কবিও বাল্যকৈশোরের কাব্যকলায় নকল শেলীর কুজ্ঝটিকায় কিছুকাল আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।[১] কিন্তু একালে, যখন তাঁর মধ্যে বাষ্পীয় কল্পনা ও নকল আবেগ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করছিল, তখনও তাঁর চিদ্বৃত্তি যে অতিশয় সজাগ ছিল, তাঁর 'ভারতী' পর্বের শেষদিকের সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

১৮৮৩ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধের তিনটি সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—১. 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), ২. 'আলোচনা' (১৮৮৫) এবং ৩. 'সমালোচনা' (১৮৮৮)। এর অধিকাংশ প্রবন্ধই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। সমসাময়িক কোন গ্রন্থ. বা প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ ভোগ করতে গিয়ে প্রথম-যুবক রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মননপ্রণালী কাব্যতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিল। কাব্য-ভোগের ইচ্ছা থেকেই তাঁর মনে কাব্য বিশ্লেষণের ইচ্ছা উদিত হয় এবং কাব্যবিশ্লেষণের ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা-গ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম প্রবন্ধ "মনের বাগান বাড়ি" 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১২৮৮) এবং তাঁর তৃতীয় সমালোচনা-গ্রন্থ 'সমালোচনা'র সর্বশেষ প্রবন্ধ "বাউলের গান" ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে মুদ্রিত

* হারাণচন্দ্র রক্ষিত 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে' তারই প্রমাণ দিয়েছেন।

১. "তখন আমাদের যাঁরা প্রশংসা করেছেন তাঁরা নকল শেলি বায়রনরূপে আমাদের অভিহিত করে আমাদের গৌরবদান করেছেন। অর্থাৎ আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্যসম্পদ তখন স্বীকার করে নিতে পারি নি। সুতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাদের প্রভাব অক্ষম অনুকরণের পথে চালনা করে থাকে, তবে হয়তো সেই যুগের লজ্জার ভাগী আমরা সকলেই।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ (২য় খণ্ড), পৃঃ ১০

হয়। সুতরাং এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন কবির বয়স কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। এর পরেও 'ভারতী' ও 'ভারতী-বালকে' তাঁর নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। কিন্তু উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থেই তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক মূল প্রবন্ধগুলি গৃহীত হয়েছে বলে, এই প্রবন্ধগুলিকে 'ভারতী' পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার ধারা বিচারে গ্রহণ করা গেল।

রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের গদ্যরচনা, বিশেষতঃ সাহিত্যবিচারঘটিত প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "বাহিরের জগতের ছবি মনের দর্পণে পড়িয়া যে সুরের হিল্লোল জাগায়, ছন্দে তাহা রূপ পায় 'ছবি ও গানে'। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যরচনাকে বালকের রঙের বাক্স লইয়া খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন : আমরা তাঁহার গদ্যরচনাকেও সেই রকম রঙিন বাক্স লইয়া খেলা বলিতে চাহি" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম, পৃঃ ১৪৭)। অবশ্য তিনি এই পর্বের কোন কোন গদ্য রচনা, বিশেষতঃ সাহিত্যবিচারঘটিত রচনায়, "বয়স্ক চিন্তাশীল প্রায় দার্শনিকের রচনার ন্যায় গভীর গম্ভীর ও জটিল" ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখা যাচ্ছে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮১), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'শৈশবসঙ্গীত' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) প্রভৃতি কাব্য ; 'কালমৃগয়া' (১৮৮২), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) প্রভৃতি নাট্যকাব্য, 'রবিচ্ছায়া' নামে গানের সংগ্রহ (১৮৮৫),[২] 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) শীর্ষক গীতিনাট্য এবং 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) নামে দু'খানি উপন্যাস এবং কিছু গদ্য রচনা ('রামমোহন রায়'—১৮৮৫, 'চিঠিপত্র'

২. "১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই" (ভূমিকা) এতে মুদ্রিত হয়।

১৮৮৭) স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। কবির কুড়ি বৎসর থেকে ছাব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এতগুলি সাহিত্যের ফসল তাঁর ঘরে উঠেছিল। অবশ্য এ ছাড়াও বহু প্রবন্ধনিবন্ধ ও দু' একটি গল্প-আখ্যান ('ভিখারিণী' নামে বড়গল্প এবং 'করুণা' নামে অসমাপ্ত উপন্যাস) 'ভারতী'তে মাসে মাসে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু পরে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় নি।

এই পর্বে দেখা যাচ্ছে, তিনি আর ঠাকুরবাড়ির 'কাঁচা মিঠে' (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য) নন, বাংলা সাহিত্যের সুপক্ক রসাল ফলে পরিণত হয়েছেন এবং সাহিত্য-প্রাঙ্গণে নিজ প্রতিভার গুণেই স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন। তখন তিনি যে শুধু "কেবলই আপনার হৃদয়াগ্নিতে হাপর" (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম, পৃঃ ১০৭) টানছিলেন তা নয়, সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য বিচারবিশ্লেষণেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। 'ভারতী'র পুস্তক-পরিচয়ের অধিকাংশ গ্রন্থ-সমালোচক তিনি নিজে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা করতে বসে বঙ্কিম-চন্দ্র গ্রন্থবিচার পদ্ধতি নিরূপণে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ সমালোচনা ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্পর্কে নিজের মতামত জ্ঞাপন করতে গিয়ে সাহিত্যবিচার-প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। অবশ্য তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্গত কিছু কিছু প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল, এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারপদ্ধতি গঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু দান আছে তা স্বীকার করতে হবে। এই যুগের সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত। তাঁর মতে, "আমরা যে-যুগের কথা আলোচনা করিতেছি তখন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটা সুষ্ঠু মানসূচী সর্ববাদী স্বীকৃতি লাভ করে নাই। প্রাচীন কবিতা কী, নূতন কবিতা কী, যথার্থ কবিতার স্বরূপ কী, কবি কে, কাব্য বস্তুগত না ভাবগত প্রভৃতি বিচিত্র প্রশ্ন বাংলার সমসাময়িক লেখক ও পাঠকের চিত্তকে উত্তেজিত রাখিয়াছিল।" বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথও সে উত্তেজনার বাইরে

ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র অ্যাকাডেমিক ধরনের পাশ্চাত্য পদ্ধতির আদর্শে বাংলা সমালোচনাকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর পদ্ধতি বিশুদ্ধভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত, কোথাও তুলনামূলক, কোথাও বিশ্লেষণধর্মী। নৈয়ায়িকতা তাঁর সাহিত্যবিচারের প্রধান অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার প্রথম পর্ব এই রীতির দ্বারা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তার প্রমাণ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রকাশিত তিনখানি গীতিকাব্যের সমালোচনা এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিচারবিশ্লেষণ। কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মানসী'র পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চিত্তলোকে ব্যক্তিগত আবেগপ্রবণতা, অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজকে এবং জগৎকে খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষা আর তার সঙ্গে না পাওয়ার নৈরাশ্য এতই স্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, সমকালীন গদ্যরচনায়—বিশেষতঃ সাহিত্যরসম্ভোগ-সংক্রান্ত রচনায় এই আবেগমথিত ব্যক্তিত্ব, যা মাঝে মাঝে অস্মিতার ধার ঘেঁষে গেছে, তার অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য এই পবের সমস্ত রচনাতেই আবেগোন্মত্ততা নেই, কোন কোন স্থলে তাঁর বিচারবুদ্ধি যাকে নৈয়ায়িক বোধ বলতে পারি, এবং যে নৈয়ায়িক 'নেই-আঁকুড়ে' বুদ্ধির তিনি নিন্দা করেছেন (এ বিষয়ে তাঁর 'সমালোচনা' গ্রন্থেব অন্তর্গত "তার্কিক" নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে), সমকালীন রচনায় তার অস্তিত্ব দুর্লভ নয়, এবং তাঁর এই বয়সের কোন কোন সমালোচনায় যুক্তিনির্ভর বক্তব্যের সুগঠিত পারম্পর্যও লক্ষ্য করা যাবে।

প্রথম যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের গুরুদায়িত্ব নিজ মস্তকে তুলে নিয়েছিলেন এবং সে ব্যাপারে তাঁরও যে একটা কর্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' (বিদ্যাপতি) সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি অগ্রজ সাহিত্যরথীর সম্পাদনায় অনেক ত্রুটি দেখিয়েছিলেন এবং এমন কঠোর মন্তব্য করেছিলেন যে, অক্ষয়চন্দ্রের অনুরাগীরা তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ

হয়েছিলেন।[৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে ধরনের নীরস শুষ্ক মন্তব্য কর'র জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত হন নি।[৪] তিনি সাহিত্যসেবকের পক্ষ থেকে বলেছিলেন, "আমি সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য লইয়াই অক্ষয়-বাবুর সহিত বিবাদ করিয়াছি, তাহা আমার কর্তব্য কর্ম।...ব্যক্তিগত কোন কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার আক্রোশ প্রকাশ করি নাই" (ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৮)। সাহিত্যবিচার তাঁর সাহিত্যসেবার অন্তর্ভুক্ত ও অন্যতম, তা তিনি এখানে স্বীকার করেছেন, এবং এই গুরুদায়িত্ব স্মরণ করে তিনি একাধিকবার বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। ১২৮৫ সনের ভাদ্রের 'ভারতী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের সদ্য-প্রকাশিত 'কবিতা-পুস্তকে'র (১৮৭৮) স্বল্পের সমালোচনাটিও রবীন্দ্রনাথের। পুস্তক-পরিচয়ে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, "বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব স্বাদগন্ধহীন --কিছুই না হইবে --তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।" এই সামান্য আলোচনাতেই তিনি কাব্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে বলেছেন, "সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই প্রশস্তভাবে জ্ঞান কিম্বা আমোদ কিম্বা উভয়ের সমষ্টি।" বহুকাল আগেও তাসো (১৫৪৪-১৬০০) এই

৩ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় এবং সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলী অর্থাৎ প্রথম খণ্ড ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত হয়। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ তার সমালোচনা করেন এবং সম্পাদনরীতি ও পদের ব্যাখ্যা-বাখ্যানের অনেক ত্রুটি দেখিয়ে দেন। এর পর ভাদ্রসংখ্যার 'ভারতী'তে যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতিবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর একসঙ্গে মুদ্রিত হয়

৪. রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের একাংশ : "সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয় যে, কিয়দ্দূর পাঠ করিয়াই সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতা-বশতঃ ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনেকগুলি তাঁহার অনবধানতাবশতঃ ঘটিয়াছে।" ভারতী, শ্রাবণ, ১২৮৮

একই কথা বলেছিলেন, "By their singing of verse, of that which, being sung, either delights or instructs or delights and instructs at the same time."[৫] অবশ্য পরে রবীন্দ্রনাথ এ মত বহুলাংশে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের সাহিত্যবিচারের মধ্যে যে অযৌক্তিকতা ছিল না, অস্পষ্ট ভাবের কুহেলিকা ছিল না, তা এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। নিজের বিচারবুদ্ধির প্রতি বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীসাধকদের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি।[৬] সুতরাং 'ভারতী' পর্বে যখন তিনি ধৃতাস্ত্র যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁর শক্তিকে আর তুচ্ছ করা গেল না, তাঁর মত ও মন্তব্যকে অবহেলা করবারও উপায় রইল না। কারণ সাহিত্যবিচারের জন্য যে যুক্তিবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা প্রয়োজন, অতি অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথের তা আয়ত্ত হয়েছিল, আর তার সঙ্গে মিশেছিল অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ। এই সমস্ত প্রবন্ধে দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তিনি সাহিত্যবিচারের এমন একটি মানদণ্ড খুঁজছিলেন, যার দ্বারা সাহিত্যের বাস্তব-দৃষ্টান্তগুলির মূল্য বিচার করাও যাবে এবং যার থেকে সাহিত্যতত্ত্বের মূল আদর্শ ও তার রীতিপদ্ধতির একটা স্বরূপ আবিষ্কার করাও সম্ভব হবে। আমরা

৫. B. Croce—*Æsthetic*, The Noonday Press, New York, 1960, P. 442

৬. "বাঙ্গালী কবি নয় কেন" ('বঙ্গদর্শন,' পৌষ, '২৮২) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জিতবুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি!" বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধরনের যুক্তিবিরোধী লঘুধরনের মন্তব্য যুবক রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি 'ভারতী'র (১২৮৭) ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধে ("বাঙ্গালী কবি নয়", "বাঙ্গালী কবি নয় কেন?") বঙ্কিমচন্দ্রের এই "বাক্‌চাতুরী বা 'সফিস্ট্রি'র" (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম, পৃঃ ১০৭) সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন—যা প্রতিবাদেরই নামান্তর।

তাঁর প্রথম যৌবনের তিনখানি সমালোচনা-গ্রন্থ ('বিবিধ প্রসঙ্গ', 'আলোচনা', 'সমালোচনা') থেকেই তাঁর সাহিত্য-বিচারপ্রণালী ও সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত চিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

২

'বিবিধ প্রসঙ্গ' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স অনধিক কুড়ি বৎসর। ১২৮৮-৮৯ সনের 'ভারতী' পত্রে মুদ্রিত আটত্রিশটি নিবন্ধের সংগ্রহ এই গ্রন্থে প্রকাশিত সবশেষেরটি ('সমাপন') কোথাও প্রকাশিত হয় নি, গ্রন্থমুদ্রণের সময়ে সংযোজিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি ঠিক প্রবন্ধধর্মী নয়; বিভিন্ন সময়ে, নানা মুহূর্তে যে-সব কথা কবির মনে জেগেছে সেগুলিকে তিনি ছোটবড়ো নিবন্ধের আকারে সাজিয়ে দিয়েছেন অনেকটা ব্যক্তিগত নিবন্ধের ধাঁচে। এর অনেকগুলি সাহিত্য-সমালোচনার শ্রেণীতে পড়ে না। জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম নানা ব্যাপার অবলম্বন করে কবি যেন আপনার মনের সঙ্গে কথা বলছেন। পাঠকে যদি আড়ি পেতে শুনে নেয় তাহলে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু পাঠক-সম্বন্ধে তাঁর কোন কৌতূহলও নেই। প্রায় সব প্রবন্ধই রূপকের আবরণে লেখা, এবং প্রায় প্রত্যেকটিতেই কোন গভীর চিন্তা, আবেগ এবং মনের কোন নিগূঢ় ভাব ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও কোথাও কিছু অস্পষ্টতা, কিছু শিথিলতা আছে; কোথাও কোথাও পরিমাণসামঞ্জস্য নেই, কোথাও-বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র ঝাঁঝও আছে। কিন্তু প্রত্যেক নিবন্ধেই একটা বিশেষ বক্তব্য, কবিমানসের একটা বিশেষ ভাব-ভাবনা রূপ পাবার চেষ্টা করেছে। গ্রন্থটির মাত্র একটি সংস্করণ হয়েছিল, পরে আর মুদ্রিত হয় নি। পরিণত বয়সে পৌঁছে কৈশোর-যৌবনের এই সমস্ত অস্পষ্ট লেখার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র মমতা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন :

"গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম। সেও কোনো বাঁধা লেখা নহে; সেও একরকম যা-খুশি তাই লেখা।

ছেলেরা যেমন লীলাচ্ছলে পতঙ্গ ধরিয়া থাকে এ-ও সেই রকম। মনের রাজ্যে যখন বসন্ত আসে তখন ছোটো ছোটো স্বল্পায়ু রঙিন ভাবনা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কেহ লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেই গুলোকে ধরিয়া রাখিবার খেয়াল আসিয়াছিল। আসল কথা, তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়াছিলাম; মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব—কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এই মাত্র তাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা একসময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে, প্রথম সংস্করণের শেষেই তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে আর তাহাদিগকে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নাই।" ('জীবনস্মৃতি')

দেখা যাচ্ছে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র অস্পষ্ট ধূসর আকাশতলে বসে, বিষণ্ণতার অলিন্দ থেকে কবি মনের টুকরো টুকরো কথাগুলিকে গদ্য-নিবন্ধের আকারে সাজিয়েছেন। প্রবন্ধগুলির কোন কোনটিতে পরোক্ষ ভাবে সাহিত্য-সংক্রান্ত কথা, বিশেষতঃ সাহিত্যবিচারঘটিত কিছু কিছু মন্তব্য আছে যার দ্বারা এই সময়ে কবির চিত্তগহনের বিচারবিশ্লেষণ-মূলক ভাবের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করা যাবে। আর্ট বা শিল্পের লক্ষ্য, সাহিত্যস্রষ্টা, সাহিত্যসৃষ্টি এবং ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক, আইডিয়া বা ভাব কীভাবে শিল্পরূপ লাভ করে এবং সাহিত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে কী ধরনের আত্মীয়তা আছে—প্রধানতঃ এই কয়টি বিষয় তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আর একটা কথা, অনেকগুলি নিবন্ধেই এই সময়ের বিষণ্ণ বৈরাগ্য এবং হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনা আছে। তবে কবি এখানে সমালোচনা বা সাহিত্যবিচার করবেন বলেই কলম ধরেন নি, নিজের মনের কথাগুলিকে নিবন্ধ ও অনুচ্ছেদের আকারে সাজতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য—বিশেষতঃ সাহিত্যের জন্মস্থান যে মানুষের হৃদয়, সে সম্বন্ধে তাঁর মন উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে।

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধগুলিতে ভাবের জগৎ কীভাবে আর্টের

জগৎ ও সাহিত্যের জগৎ হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে কবি নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের বস্তু বা আইডিয়া বলতে ভালোমন্দ, পৃথিবীর যা কিছু ঘটে, সে-সমস্ত বস্তু-উপাদান সাহিত্যের সামগ্রী নয় ; নির্বাচন করা, বাছাই করা, প্যাটার্ন সৃষ্টি করা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "মনের বাগানবাড়ি" নিবন্ধে তিনি বলেছেন, প্রিয়জনকে যেমন মনের শুধু ভালোটুকুই দিই, তাকে মুক্ত হাওয়ার প্রাঙ্গণে আনি, পচাপুকুরের অন্ধকারে ঘুরিয়ে মারি না, তেমনি সাহিত্যের জগতেও আমরা যথেচ্ছা উপাদান সংগ্রহ করতে পারি না। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য আমরা বেছে বেছে শিল্পের উপাদান চয়ন করি। ঐ প্রবন্ধের আর একস্থানে বলেছেন যে, মনের মধ্যে সর্বদা নানা ভাবের আনাগোনা চলেছে—কোনটি বৃহৎ, কোনটি-বা চোখে পড়ে না। যথার্থ কবি-শিল্পী ছোট-বড়ো সমস্ত ভাবকেই শিল্পরূপ দিতে পারেন, সুন্দর-অসুন্দর—যে কোন উপাদান অবলম্বনেই তিনি মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু যিনি যথার্থ শিল্পী নন বা নীচু দরের শিল্পী, তিনি শুধু বড়ো বড়ো ভাব আর সৌন্দর্যময় উপাদান খুজে বেড়ান। তাঁর মতে, "ইহা নিঃসন্দেহ যে, আমাদের মনে যতপ্রকার ভাব উঠে সকলগুলিই লিখিবার উপযুক্ত। কিন্তু অতবড় লেখক হইবার উপযুক্ত প্রতিভা আমাদের নাই।"[৭] লেখক ও অলেখকের মধ্যে তফাত কোথায়? যিনি মনের ভাবকে যথার্থ শিল্পরূপ দিতে পারেন, তিনিই শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক; আর যিনি মনের ভাবকে বাইরে রূপ দিতে অক্ষম তিনি বড় জোর ভাবুক। অবশ্য বিভিন্ন লোক হিসেবে ভাবের জগৎও পৃথক ও নতুন হবে বৈ কি। ব্যক্তির চিত্তভেদে তাদের চিত্তলোকের আসমান-জমিনের রূপটাও পৃথক হবে। এক কথায়, প্রত্যেক ব্যক্তির আইডিয়ার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, একক ও নতুন। এই প্রসঙ্গে কবি একটু দার্শনিকতার মেঘলোক থেকে বলেছেন :

---

৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ১ম, পৃঃ ৩৮৩। আমাদের এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা'র উদ্ধৃতিগুলি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত-সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

"আমি কে? না, আমি যাহা কিছু দেখিতেছি—চন্দ্রসূর্য পৃথিবী ইত্যাদি—সমস্ত লইয়া একজন। তুমিও তাহাই। অতএব প্রতি-লোকের সঙ্গে সঙ্গে শত শত চন্দ্রসূর্য জন্মগ্রহণ করে ও শত শত চন্দ্রসূর্য মরিয়া যায়। অতএব দেখ, জগৎ যেমন অসংখ্য তেমনি বিচিত্র। কাহারো জগতে সূর্যোদয় আছে, আঁধারের অপগমন ও আলোকের আগমন আছে, কিন্তু প্রভাত নাই। সে ব্যক্তি সূর্যোদয়-রূপ একটা ঘটনা দেখিতে পায় বটে, কিন্তু প্রভাত দেখিতে পায় না। কাহারো-বা প্রভাত আছে সন্ধ্যা নাই। বসন্ত আছে, শরৎ নাই। কাহারো জ্যোৎস্না হাসে, কাহারো জ্যোৎস্না কাঁদে।" (পৃঃ ৩৮৫)

এখানে কবির বক্তব্য হল, প্রত্যেকের ভাবের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক, তার নিজের আপনার জগৎ। এই ভাবের ভাবুক যিনি, তিনি তাঁর ভাব-জগতেই ধ্যাননিবিষ্ট থাকেন, বাইরের কলরবের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ থাকে না।[৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে বস্তুজগৎকে অবলম্বন করে প্রত্যেক হৃদয়ে একটা পৃথক ভাবের জগৎ গড়ে ওঠে, আর সেই ভাবের জগৎকে শিল্পমূর্তি দেওয়া কবি ও শিল্পীর কাজ। 'প্রকৃতি-পুরুষ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি যে মৌলিক চিন্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটি হল ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি মূল্যবান তত্ত্ব। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র থেকেই ভাব ও শিল্পের সম্পর্কটি বুঝে নিয়েছেন তা নয়। কারণ উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশের 'এলিট' সমাজে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ভাব ও রসের সম্পর্ক প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তরুণ রবীন্দ্রনাথও অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশংসাব্যঞ্জক মত পোষণ করতেন না।[৯] কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্যটি অনেকটা অলঙ্কার শাস্ত্রের

৮ "ঘর ও বাসাবাড়ি" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ১ম, পৃঃ ৩৮০-৮১)

৯. 'সমালোচনা'র "সঙ্গীত ও কবিতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমরা যেমন আজকাল নবরসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ

অনুরূপ। অলৌকিক বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাবের সংস্পর্শে এসে লৌকিক স্থায়ীভাব আস্বাদ্যমান রসে পরিণত হয়, এটাই হল ভারতীয় রসতত্ত্বের মূলকথা। রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, আমাদের মনের মধ্যে দুটো অংশ: একটা ভাবের বীজ বপন করে, "আর একজন তাহাই বহন করিয়া, পালন করিয়া, পোষণ করিয়া তাহাকে গঠিত করিয়া তুলেন। একজন সহসা একটা সুর গাহিয়া উঠেন, আর একজন সেই সুরটিকে গ্রহণ করিয়া, সেই সুরকে গ্রাস করিয়া সেই সুরের ঠাটে তাঁহার রাগিণী বাঁধিতে থাকেন। একজন সহসা একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র নিক্ষেপ করেন, আর একজন সেই স্ফুলিঙ্গটিকে লইয়া ইন্ধনের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে ফু দিয়া তাহাকে আগুন করিয়া তোলেন" (পৃঃ ৩৮৭)। এখানে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ এবং কবি-শিল্পীর মনের দুটো অংশ; একজন ভাববীজ নিক্ষেপ করেন, বা ভাব সৃষ্টি করেন, আর একজন সেই ভাবকে শিল্পরূপ দান করেন। এই ভাবে নিত্যই আমাদের মনের অন্তরালে অসংখ্য ভাবের বীজ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে; তার অনেকগুলিকেই আমরা বিস্মৃতিলোকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি।[১০] অনেক সময় সেই বিস্মৃতিলোকের ভাব স্মৃতিলোকে ভেসে ওঠে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়:

> "এমন অনেক সময় হয় তখন আমাদের মনে হয়, একটি ভাববিশেষ এই মাত্র বুঝি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইল, আমাদের হৃদয়বাসে এই বুঝি তার প্রথম পদার্পণ, কিন্তু আসলে হয়ত আমরা ভুলিয়া

করিয়া রাখি না। অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না —তেমনি সঙ্গীতে কতকগুলা নাম নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি।" (অচলিত-সংগ্রহ, ২য়, পৃঃ ৯২)

১০. লৌকিক স্থায়ীভাব অলৌকিক রসে পরিণত হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে ফুটে উঠেছে। বীজ বপন করাকে বলতে পারি স্থায়ীভাব, আর বীজ পোষণ করাকে বলা যেতে পারে ভাবের রসে পরিণত হওয়া।

গেছি, কিংবা হয়ত জানিতেও পারি নাই, কখন্ সেই ভাবের প্রথম অদৃশ্য বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপিত হয়—কিছুকাল পরিপুষ্ট হইলে তবে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম।”—‘প্রকৃতি পুরুষ’ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৭)

কীভাবে আমাদের মনে ভাবের অঙ্কুর ফুটে ওঠে, কবি ঐ বয়সে তখনও তার রহস্য সমাধান করতে পারেন নি। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, “ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরা জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের নিজ-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম বৃত্তিটি পর্যন্ত, কোন পদার্থের আদি মুহূর্ত জানিতে পারি না, আমাদের নিজের ভাবের আরম্ভও আমরা জানিতে পারি না…।” বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আরণ্যক ঋষিরা বলেছেন, “অথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।”—কে জানে কি থেকে এ হল। এই সৃষ্টি কোথা থেকে হল, কেউ কি একে সৃষ্টি করেছে, বা করে নি। পরম ব্যোমে যিনি এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ রয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে জানতে পারেন, নাও পারেন। এই আর্ষবাক্যের প্রতিধ্বনি করে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, “ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্তা মানবেরাও জানে না, তাহাদের নিজের ভাবের আরম্ভ কোথায়, আদি কারণ কি” (পৃঃ ৩৮৮)। কবির মতে, কেমন করে মানুষের মনে ভাবোদয় হয়, তার রহস্য এখনও অজ্ঞাত বটে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে মানুষের মনের অন্তরালে বহু ভাব চাপা অবস্থায় আছে, আমরা তার স্বরূপও জানি না, অস্তিত্বেরও খবর রাখি না। হয়তো কোন প্রতিভাবান শিল্পীর অন্তর সেই অশরীরী ভাবকে একটি আকার-আয়তন দিল, তখন আমরা সেই ভাবের অস্তিত্ব জানতে পারলাম।

‘বিবিধ প্রসঙ্গের’ নানা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও প্রবন্ধের অন্তরালে শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক এই ধারণাটি কবির মনে বেশ বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ভাবের জগৎ কীভাবে রসের জগৎ হয়ে ওঠে তিনি শুধু সেই সন্ধানটি তখনও পান নি। সে বিষয়ে ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র কী বলছে, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকলে ভাবের জগৎ ও রসের জগতের যথার্থ

সম্পর্ক ধরা যাবে না। এই সময়ে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন বলে মনে হয় না, কারণ তখনও ইংরেজী-শিক্ষিতসমাজে ও শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা শুরু হয় নি। তাই ভাব-জগতের চাবি খুলে রসজগতের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য এ-যুগের সমস্ত রচনাতে রসলোকের চেয়ে সৌন্দর্য-জগতের কথাটা তিনি বেশী বলেছেন। বোধ করি 'সাধনা' পর্বের পূর্বে সাহিত্যবিচারপ্রসঙ্গে তিনি রসের পরিবর্তে সৌন্দর্যকেই সেই স্থান দিয়েছেন। প্রথম দিককার এই নিবন্ধগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের শেষ পরিণাম যে সৌন্দর্যসৃষ্টি, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ।

এই প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থলে সৌন্দর্যের উল্লেখ করেছেন এবং সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে মনের কী সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত করেছেন। মনের দারিদ্র্য বলতে তিনি বুঝেছেন সৌন্দর্য উপভোগের স্বাভাবিক অক্ষমতা ("গরীব হইবার সামর্থ্য" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। বস্তু-প্রাচুর্যের দ্বারা বা উপাদানের অজস্রতার দ্বারা সৌন্দর্যভোগ হয় না। "শিল্পসৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য ঘরটাকে একেবারে ছবির দোকান করিয়া তুলে" (পঃ ৩৪৬)। আর একটি প্রবন্ধে ("অধিকার") তিনি বলেছেন, সৌন্দর্যের পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই না। তুমিও তাহার সব পাও নি, আমিও তাহার সব পাই নি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব; তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও যে, আমারও সে" (পৃঃ ৩৫৩)। তাঁর মতে, বিশ্লেষণের দ্বারা সৌন্দর্যকে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ:

> "একটি গোলাব ফুল তুলিয়াছ, তোমার হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাপটি ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু সে গোলাপটির সৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই—ইচ্ছা করিলে আর সব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে উপভোগ করিতে পার না—আর, আমি তাহাকে ছিঁড়িতে পারি

> না বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারি" (পৃঃ ৩৫৩)।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বিশ্লেষণের দ্বারা সৌন্দর্যের স্বাদ পাওয়া যায় না, তাকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি না করলে তার উপভোগ সার্থক হয় না—এ কথাটাই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু তরুণ বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, মানুষ আসলে কতকগুলি ক্ষুধার সমষ্টি—জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যের ক্ষুধা। সৌন্দর্যের ক্ষুধা আমরা কীভাবে কোন্ উপায়ে মেটাতে চাই? "আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়" (পৃঃ ৩৬৩)। কবিরা সেই সৌন্দর্যকে শিল্পরূপের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেন—তাই তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মধ্যে সাহিত্যবিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, কবির মন দুটি রেখায় চলাচল করছে—ভাব বা আইডিয়ার জগৎ এবং সৌন্দর্য বা রূপের জগৎ। একথা ঠিক যে, এই কথাগুলি তাঁর রচনার অনেক স্থলেই বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কোথাও-বা এক উক্তির সঙ্গে অন্য উক্তির কিছু পার্থক্যও আছে। একটি প্রবন্ধে ('মনের বাগানবাড়ি') তিনি বলছেন, সাহিত্য বা আর্টের জগতে নির্বাচন চাই। ভালোমন্দ সব কিছুই নির্বিচারে শিল্পীর *motif* হতে পারে না। আবার আর একটি প্রবন্ধে ('ছোটো ভাব') বলছেন, ছোটোবড়ো, ভালোমন্দ যে-কোন ব্যাপারই শিল্পীর হাতে রসমূর্তি লাভ করতে পারে। কবি যে একরোখা একমুখো পথ ধরে একই দিকে চলেছেন তা নয়, এবং তা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। আঁদ্রে জিদ্ও কতকটা এইভাবে মনের সঙ্গে খেলা করেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য স্থির, গতি অচঞ্চল, বক্তব্য অটল। অনতিক্রান্ত-কৈশোর রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে গঙ্গার ধারে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির সর্বোচ্চতলের ঘরটিতে যখন একা একা গদ্যে-পদ্যে মনের কথা লিখে যেতেন, তখন সে-সব কথা আনুষ্ঠানিকভাবে, নিয়ম মেনে, বাঁধা চালে আসত না। তারা পোষাপাখির মতো যুক্তিসিদ্ধান্তের বাঁধা খাঁচায় ঢুকতে চাইত

না। মনকে খোলা আকাশে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ান এবং চিন্তাকে খোলা মাঠে দৌড় করানই ছিল তাঁর মানসিক বিলাস। তাই গ্রন্থ শেষ করতে গিয়ে বলেছেন :

> "ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র, ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি কি আমি জানি, না বিশ্বাস করি চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।...এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্যশীল পরিবর্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে।" (পৃঃ ৩৯০-৯১)

কবির এ কবুল জবাব গ্রন্থটির স্বরূপকেই উদ্ঘাটিত করেছে। বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত নিবন্ধের রীতিতে রচিত প্রবন্ধগুলিতে যুক্তিতর্কের বাহুল্য এবং সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা থাকে না—তাতে থাকে একটি মনের উপলব্ধি। সে-উপলব্ধি ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। কিন্তু সেই সমস্ত এলোমেলো চিন্তার ইতস্ততঃ চরণক্ষেপের মধ্যেও কবিচেতনায় সাহিত্য-বিচারের দুটো মৌলিক ব্যাপার অর্থাৎ আইডিয়ার জগৎ ও সৌন্দর্যের জগতের নানাভাবের ছায়া পড়েছে, মনের মধ্যে এ বিষয়ে নানা কৌতূহল ঘনিয়ে এসেছে তা স্বীকার করতে হবে। একথাও স্বীকার করতে হবে যে, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভেসে-যাওয়া মনের কথার অন্তরালে পরবর্তীকালের সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কোন কোন মৌলিক চিন্তার উত্তরীয়প্রান্ত দেখা যাচ্ছে।

৩

পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, যৌবনের প্রারম্ভভাগে, যখন একটা অকারণ-বিষণ্ণতা কবিচিত্তকে ঘিরে ধরেছে, প্রিয়জনের হৃদয়ের মধ্যে তিনি আশ্রয় খুঁজছেন এবং আপন মনের গভীরে তলিয়ে যাবার সাধনা করছেন, তখনকার সেই ভাবব্যাকুল মনের সৃষ্টি হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। তাই এই নিবন্ধগুলির মধ্যে কিছু শিথিলতা, কিছু

অস্পষ্টতা আছে, এবং এগুলি নিছক সাহিত্যালোচনার বাহন হিসেবেও লেখা হয় নি, প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য. সাহিত্যের উপাদান, সৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা এসে গেছে। সে আলোচনা সর্বদা খুব তীক্ষ্ণ হয় নি—কোথাও কোথাও পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে, কোথাও বক্তব্যের বিষয়ের চেয়ে বক্তব্য প্রকাশের বক্রতাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এর পরে প্রকাশিত 'আলোচনা'-গ্রন্থেই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার বিকাশ ঘটল। এই গ্রন্থেই অস্পষ্টতা ও ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ত্যাগ করে সাহিত্যজিজ্ঞাসার যথার্থ স্বরূপ যুক্তিপারম্পর্যের ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থ-ধৃত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের মননসত্তার আর এক পরিচয় উপস্থিত করল।

'আলোচনা' মোট ছ'টি বড় প্রবন্ধের সমষ্টি। তার মধ্যে প্রথম চারিটি প্রবন্ধ ('ডুব দেওয়া,' 'ধর্ম', 'সৌন্দর্য ও প্রেম', 'কথাবার্তা') ১২৯০-৯১ সনের 'ভারতীতে, পঞ্চম প্রবন্ধ ('আত্মা') ১৮০৬ শকের শ্রাবণ মাসে'র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এবং ষষ্ঠ প্রবন্ধ ('বৈষ্ণব কবির গান') ১২৯১ সনের কার্তিক মাসের 'নবজীবনে' মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধগুলি 'আলোচনা' নাম নিয়ে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এরও দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নি। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে দু' প্রসঙ্গে 'আলোচনা'র উল্লেখ করেছেন। একবার 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র সঙ্গে এর তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন, "যখন সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছিলাম, তখন খণ্ড খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর, প্রভাত-সঙ্গীত যখন লিখিতেছিলাম, কিংবা তাহার কিছু পর হইতে ওইরূপ গদ্যলেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।" অর্থাৎ এখানে তিনি বোধ হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র ব্যাকুল বিষণ্ণতার স্পর্শ এই 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় গদ্য-সংকলন 'আলোচনা'র মধ্যে 'প্রভাতসঙ্গীতে'র আনন্দতত্ত্ব ও উদার মানসিকতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'র আর একস্থানে

'আলোচনা' সম্পর্কে বলেছেন, "তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।" 'আলোচনা'র প্রথম প্রবন্ধ 'ডুব দেওয়া'র কেন্দ্রীয় বিষয় ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র তাৎপর্য একই। সেই সীমা-অসীমের সম্পর্ক, জগৎ ও জীবনের স্বীকৃতি এবং সীমাকে নিয়েই অসীমের অসীমত্ব ইত্যাদি রবীন্দ্র-কবিভাবনার মূলতত্ত্ব 'আলোচনা'র প্রথম প্রবন্ধেই বক্তব্যের আকারে ব্যক্ত হয়েছে। তাই এই রচনা-গুলির প্রতি তাঁর 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব নেই। এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর নিবন্ধাত্মক চিন্তা সবপ্রথম স্পষ্ট আকার লাভ করেছে। এতে নানাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ঈষৎ শিথিলভাবে যা বলেছেন, পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনার মধ্যে তাই আরও পূর্ণাকারে ফুটে উঠেছে। 'আলোচনা'র ছ'টি প্রবন্ধের মধ্যে 'সৌন্দর্য ও প্রেম' এবং 'বৈষ্ণব কবির গান' এই দুটি প্রবন্ধে মুখ্যতঃ সাহিত্য ও শিল্পের তত্ত্বগত দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। বাকিগুলিতে তিনি দর্শনচিন্তা, সীমা-অসীমতত্ত্ব, জ্ঞান ও প্রেমের দৃষ্টি প্রভৃতির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যেও কথাপ্রসঙ্গে কবিতার কথাও এসে গেছে।

এই পর্বের গদ্যরচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বস্তুর তুচ্ছতা মোচন করিয়া তাহাকে মহৎ করিবার প্রয়াস যেমন দেখা যায় কবিতায়, তেমনি দেখা যায় সমসাময়িক গদ্যরচনায়—বিশেষভাবে 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলির মধ্যে। কিন্তু হৃদয়ের রসে সামান্য বিষয় বা বস্তু যেমন তুচ্ছতা হইতে মুক্ত হইয়া মহান হইতে পারে, তেমনি মহৎ ও গম্ভীর বিষয় হৃদয়ের অন্যতম রসের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া তুচ্ছতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কারণ বিষয় ও বস্তুবিচারের মানসূচী যখন

হৃদয়ের মধ্যে, তখন সে উহাকে sublime বা ridiculous-এর যে-কোন লোকে পরিচালনা করিতে পারে। এ যুগের গদ্যরচনাগুলি sublime হইতে পারে নাই। তাই দেখি এ-যুগের গদ্যরচনার মধ্যে অতি সামান্য জিনিসকে অত্যন্ত ফলাও করিয়া প্রকাশের চেষ্টা।··· তরুণ লেখকের সর্বগ্রাসী চিত্তে বিচিত্র সাহিত্যজিজ্ঞাসা, সমাজ ও রাষ্ট্রসমস্যা জাগিতেছে; কিন্তু সবগুলিই লঘুভাবে আলোচিত।" অবশ্য আর এক-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'আলোচনা'র প্রবন্ধগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মতো হালকাভাবে রচিত নয়। এর মধ্যে তিনি "বয়স্ক চিন্তাশীল, প্রায়-দার্শনিকের রচনার ন্যায় গভীর, গম্ভীর ও জটিলতা" লক্ষ্য করেছেন। তাঁর শেষোক্ত মন্তব্যই ঠিক। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র তুলনায় 'আলোচনা'র রচনাগুলি অনেক বেশী সংহত ও যুক্তিপূর্ণ। আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে বটে, তবে তাও উচ্চতর নীতি-ধনের দ্বারা সংযত। হয়তো সব লেখাগুলি যথেষ্ট sublime হতে পারে নি, কোথাও কোথাও মত-প্রকাশের চড়া সুরও আছে, কিন্তু সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর ছোট ছোট মন্তব্যগুলি অনেকটা আঁদ্রে জিদ ধরনের —সংহত কিন্তু সুগভীর বাণীবহ। আমরা এ গ্রন্থে-গৃহীত শুধু সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের কথাই বলব। অন্যগুলি মূলতঃ কবির গভীর প্রত্যয়জাত—যার সঙ্গে তাঁর সূক্ষ্ম মানসিকতা ও গভীর হৃদয়াবেগের সম্পর্কই বেশী। এই চিন্তাঋদ্ধ প্রবন্ধগুলিতে পরবর্তী-কালের 'শান্তিনিকেতনে'র পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাবে। সে যাই হোক, 'আলোচনা'র সাহিত্যবিষয়ক নিবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সাহিত্য ও সৌন্দর্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বিধাহীনভাবে আলোচনা করেছেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র পর এবং 'আলোচনা'র পূর্বে তাঁর 'ছবি ও গান', 'শৈশব সঙ্গীত' এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়েই তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে সীমা ও অসীমের সম্পর্ক রূপকের ছলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'ছবি ও গানে' ছোট ছোট চিত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রীতিকেই রূপে রসে ফুটিয়ে তুলেছেন, কখনও-বা 'শৈশব সঙ্গীতে'র

অস্ফুটভাষায় মিলনেব আবেগ ও বিরহেব বেদনাকে ব্যক্তিচিত্তের সুগভীর আর্তিরূপে প্রকাশেব প্রয়াস পেয়েছেন, কখনও বিদ্যাপতির ছায়াতলে বসে বৈষ্ণব কবিদেব সুবসাধনা কবেছেন। একদিকে তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ব অকাবণ বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে 'প্রভাতসঙ্গীতে'র মধ্যে বিশাল বিশ্ববোধেব সম্মুখীন হয়েছেন, আব একদিকে উপনিষদেব প্রভাব, বিশেষতঃ সীমা ও অসীমতত্ত্ব তাব সৌন্দর্যপিযাসী চিত্তে আর একটা গভীব সুব ধ্বনিত কবে তুলেছে যেটা নিছক কাল্পনিকতা বা কবিত্ব নয়, কল্পিত বিবহমিলনেব বোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাও নয়। প্রতিদিনেব জীবনযবনিকা ভেদ কবে তিনি যেন ওপাবেব আলো দেখতে পেযেছেন। সে কথাই তাঁব 'আলোচনা'ব কোন কোন প্রবন্ধে ('ডুব দেওযা', 'ধর্ম', 'আত্মা') আভাসে-ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে এবং সে অস্ফুট প্রকাশেব মধ্যে কোনও প্রকার sophistication বা ভান নেই। নিজেকে জাহিব কবা নয, নিজেকে সন্ধান কবাই এই প্রবন্ধগুলিব মধ্যে নতুন আলোকবেখায কম্পিত হযেছে। সুতবাং এই সমস্ত ভাবগভীব নিবন্ধকে sublime না বলাব কোন কাবণ নেই। সে যাই হোক, 'আলোচনা'ব সাহিত্যবিবয়ক প্রবন্ধগুলিতে তরুণ ববীন্দ্রনাথেব মনে সাহিত্যেব রূপ ও বীতি সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্ব সঞ্চিত হচ্ছিল, যে যুক্তিজালেব সাহায্যে তিনি সাহিত্যমীমাংসাব স্থিব লক্ষ্য খুঁজে পেযেছিলেন, তাব যথার্থ স্বরূপ এই নিবন্ধগুলিতেই পাওযা যাবে।

'আলোচনা' গ্রন্থে সাহিত্য ও সৌন্দর্য বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে যুক্তিতর্কেব পবম্পবা অনুসবণ কবে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন, ক্রম হিসেবে সেই অনুচিন্তাগুলিকে এইভাবে বিন্যস্ত কবা যায় :

১. সৌন্দর্যতত্ত্ব সাহিত্যেব অঙ্গীভূত।

২. কবিব কাজ ও উদ্দেশ্য।

৩. স্থূল নিসর্গ ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যেব সম্পর্ক।

৪. কাব্যেব উপাদান।

৫ কাব্যের মধ্য দিয়ে আঁর একটি অস্পষ্ট রহস্যলোকের ব্যঞ্জনা।

এই বিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে, বস্তু-উপাদানের সঙ্গে কাব্য, কবিচেতনা ও সৌন্দর্যবোধের কী সম্পর্ক এই নিয়েই কবি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এবং নানা দিক দিয়ে আলোচনা কবে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চাইছেন।

'আলোচনা'র প্রবন্ধগুলি লেখার সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের চিদ্বৃত্তি ও হৃদ্বৃত্তির মধ্যে আপাতঃ-বৈষম্য থাকলেও, সবই এক উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে এব একই সঙ্গমে গিয়ে মিলিত হবে। অনেকের ধারণা বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য—এদেব কারও সঙ্গে কারও যেন পরিচয়ের সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ বলবেন, বিজ্ঞান বস্তুজগতের মধ্যে ঐক্য সন্ধান করছে। কিন্তু কবিতা এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখাপ্রশাখা—এদের কি কোন গুরুতর কাজ নেই? শুধু অলস স্বপ্নবয়ন এবং আবেগের অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন কবিতার কি কোন গুরুতর দায়-দায়িত্ব থাকতে পারে না? কবির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন:

> "এ বিশ্বরাজ্যে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল? তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর, তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ ২য় খণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১৩)

এখানে "জগতের সৌন্দর্যগত ও ভাবগত ঐক্য বাহির করার" অর্থ বোধ হয়—কবিতা, শুধু কবিতা কেন, সাধারণভাবে সমস্ত সাহিত্যই সৌন্দর্যের মধ্যে জগৎ-প্রতীতিকে ডুবিয়ে দেয়, নানা বৈষম্যের মধ্যেও কবিতা ভাবের ঐক্য আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক বস্তুগত বিদ্যার সাহায্যে বা সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়জ জগৎকে ক্রমবিন্যস্ত করে শ্রেণীবদ্ধ করেন।

কবিরা নিরেট বস্তুর মধ্যে বা শুধু বুদ্ধির মধ্যে না গিয়ে নিজ হৃদয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে ঠিক রত্নটিকে আহরণ করে আনেন। তাই বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জন্য যে পৃথক পৃথক বোধের সীমা নির্দেশ করেছেন, কবিরা সে সীমা মেনে চলতে সর্বদা বাধ্য নন। তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে গিয়ে পৃথক, এমন কি পরস্পরবিরোধী ইন্দ্রিয়জ বোধ একটি সমগ্র রসমূর্তি লাভ করে। এমন কি একটি ইন্দ্রিয় হয়তো অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন :

> "কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক হইতে, নানা দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে উপার্জন করিয়া আনে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরের মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে, এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোন্‌টি যে-কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধকে স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অ. সং. ২য়, পৃঃ ১৪)

বোধের ঐক্যসাধন কবিতায় অধিকতর পূর্ণ, অধিকতর সার্থক হয়। কারণ দর্শন-বিজ্ঞানের ঐক্যসাধন আংশিক, কবিতার ঐক্যসাধন সমগ্র চেতনাকে অধিকার করে থাকে। ভাবের দিক থেকে যারা মূঢ় তারা কবিতার এই ভাবগত সমগ্র ঐক্যের স্বরূপ বুঝতে পারে না, শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের ঐক্য সম্বন্ধে উচ্চ কলরব করে। রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, "কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে, আর কখনও বিচ্ছেদ হইবে না।" সে ঐক্যের অর্থ, মানুষের ভাবের ঐক্য। বস্তুতঃ বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য—এসব কিসের জন্য? মানুষের মনে বিচ্ছিন্ন, বিবিক্ত ও বিরোধী প্রবৃত্তিগুলিকে একটি সুসমঞ্জস পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা অধিকতর

পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে এ কথাটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।*

এরপর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কবিচার প্রসঙ্গে প্রথমে সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। এ আলোচনায় কিছু কিছু বিদেশী সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রভাব আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য বলতে তিনি একপ্রকার সামঞ্জস্যবোধকে নির্দেশ করেছেন, যে-সামঞ্জস্যবোধ প্রেম থেকে আসে। তাঁর উক্তি স্মরণীয়ঃ "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে : তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা ; তাহার কোনখানে বিরোধবিদ্বেষ নাই" (পৃঃ ২৭)। জগতের যা কিছু অনুকূল, প্রেমপ্রীতিময়, সুসমঞ্জস—কবি তাকেই সুন্দর বলতে চান। ইন্দ্রিয়জ প্রীতিরস—পাশ্চাত্য সৌন্দর্যতাত্ত্বিক যাকে সৌন্দর্যের পরিণাম বলবেন, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে প্রেম ও বোধের অনুকূলতাকে জুড়ে দিয়েছেন। জুড়ে দিয়েছেন বলা ভুল। প্রেম, প্রীতি ও সামঞ্জস্যকেই সৌন্দর্যের প্রধান লক্ষণ বলে ধরেছেন।

'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যদিও সৌন্দর্যকে একটি ভাবস্বভাব চেতনা বলে ধরেছেন, এবং তার সঙ্গে প্রেম বা আবেগকে সম্পর্কায়িত করেছেন, কিন্তু আসলে এটি সাহিত্যতত্ত্বের দৃষ্টি থেকেই বিশ্লেষিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি এই কয়টি উপচ্ছেদে সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

(১) সৌন্দর্যের কারণ, (২) সৌন্দর্য, (৩) বিশ্বপ্রেমী, (৪) মনের মিল, (৫) উপযোগিতা, (৬) আমরা সুন্দর, (৭) সুদূর ঐক্য, (৮) সুন্দর সুন্দর করে, (৯) শান্তি, (১০) উদ্ধার, (১১) কবির কাজ, (১২) কবিতা ও তত্ত্ব, (১৩) তত্ত্বের বাধকতা, (১৪) সৌন্দর্যের কাজ, (১৫) স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক, (১৬) পুরাতন কথা, (১৭) জ্ঞান ও প্রেম, (১৮) নগদ কড়ি, (১৯) আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার, (২০) লক্ষ্মী।

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে

এই উপচ্ছেদগুলিতে সৌন্দর্যের তত্ত্বগত সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন—যেটা মূলতঃ কবির আত্মগত রসভোগ ছাড়া আর কিছু নয়। এর কয়েকটি উপচ্ছেদ বিশেষভাবে সাহিত্যবিচারের পটভূমিকা থেকেই লেখা। তার মধ্যে এই উপচ্ছেদগুলি—'কবির কাজ' 'কবিতা ও তত্ত্ব', 'তত্ত্বের বার্ধক্য', 'স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক', 'পুরাতন কথা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উপচ্ছেদগুলির মধ্য দিয়ে কবির কোন ধরাবাঁধা দার্শনিক তত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব বা কোন বিশেষ দর্শনচিহ্নিত তত্ত্ববাদ ফুটে ওঠে নি। বস্তুতঃ সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তত্ত্ব-দর্শন-বিজ্ঞানকে আদৌ ভিত্তি করেন নি। বরং একটি উপচ্ছেদে ('তত্ত্বের বার্ধক্য') নিরেট তত্ত্বকথা ও নিছক বৈজ্ঞানিকতাকে সৌন্দর্যভোগের অন্তরায় বলেই ধরেছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্যকে তত্ত্ব বা জ্ঞানের দিক থেকে না দেখে ("তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়, মৃত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়", পৃঃ ৩১) সম্ভোগের দিক থেকে তিনি বিচার করেছেন। অবশ্য সে সৌন্দর্যসম্ভোগ হেডোনিস্টদের মতো ইন্দ্রিয়পারবশ্য-জনিত সুখবোধ নয়। যথার্থ সৌন্দর্য ও প্রকৃত প্রেমে যে তফাত নেই, সমস্ত জগৎ-প্রতীতির মূলকথা বস্তুজ্ঞান নয়—সৌন্দর্যবোধজনিত প্রেম, এ কথাটাই তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধের নানা উপচ্ছেদে বলেছেন। জগৎ ও সৌন্দর্যের মধ্যে সংযোগ কোথায় ?

> "যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ,"—"এই জন্যই সৌন্দর্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অন্যকে প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে সুন্দর করে" (পৃঃ ৭৭)।

তাঁর এই সমস্ত উক্তি থেকে মনে হচ্ছে তিনি সৌন্দর্যকে বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক বৃত্তি বলে গ্রহণ না করে তাকে ইন্দ্রিয়ময় বোধসত্তার মধ্য দিয়ে আবেগধর্মী প্রেমে উদ্বর্তিত করেছেন। তাঁর এই সৌন্দর্যতত্ত্ব কখনই একটা নির্বিশেষে নির্বিকল্প তত্ত্বমাত্র নয়; তার সঙ্গে জগৎ, জীবন ও মনের সুগভীর আকর্ষণের যোগ রয়েছে। তারপর তিনি দেখিয়েছেন, এই সৌন্দর্য শুধু খণ্ড ব্যক্তিত্বের ভালোলাগা-মন্দলাগার

সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রুদ্ধ নয়। এরই মারফতে আমরা সমস্ত বিশ্বকেই নিজের করে পাই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সুন্দরের দেবতা রয়েছেন প্রচ্ছন্ন-অস্তিত্বে। সেই জন্য যা কিছু সুন্দর, তাকেই আমরা আপনার বলে এক লহমায় চিনতে পারি।

> "সৌন্দর্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।"

এই মন্তব্যের পর রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপযোগিতা বিচার করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কৌতুকপূর্ণ হলেও সিদ্ধান্তটি পরিহাসের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়েছে :

> "যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাস-বশতঃ আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় ও বংশপরম্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিস্ফুট হইতে থাকে, এরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়রার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি টাঙাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত!" (র-র, অচলিত-সংগ্রহ, ২য়, পৃঃ ২৮)

সৌন্দর্যকে উপযোগ বা ব্যবহারিকতার দিক থেকে দেখা হাস্যকর। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আমাদের জৈবসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়, এ কথাটি এখানে ঈষৎ পরিহাসের সুরে বলেছেন। বস্তুতঃ এ মন্তব্য তাঁর মনের একটা সাময়িক ব্যাপার নয়, পরবর্তীকালে সমগ্র জীবন ও সাধনার স্তরে স্তরে তিনি উপলব্ধি করেছেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের জগতের কোন সম্পর্ক নেই। "অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়"—এটাই হল শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যের শেষ কথা।

আমার ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা,
দেউটি তোমার হেথায় রাখো বালা।

এই বলে কবি যে দীপধারিণীকে তাঁর ঘরের অন্ধকার দূর করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সে নারী কোন ঘরের কাজে প্রদীপটিকে ব্যবহার করে নি, শুধু অকারণে সেটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল—

চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে,
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

এ কথাটাই তিনি উত্তরকালে প্রতীকের সাহায্যে বলেছেন। কিন্তু তার সূচনা হয়েছে প্রথমযৌবনে-লেখা এই 'আলোচনা'য়, 'ভারতী' পর্বের প্রবন্ধে। কতকটা এইভাবেই ক্রোচে বলেছেন, "Art is independent both of science and of the useful and the moral." জ্ঞানের কথা ও নীতির কথা – এর কোনটাই শিল্প-সাহিত্যের মূল লক্ষ্য নয়, 'সাধনা' পর্ব থেকে সেইভাবে রবীন্দ্রনাথ শিল্পতত্ত্ব বিচার করেছেন। তাই তিনি 'ভারতী' পর্বের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে যে স্থূল রূঢ় শাসন রয়েছে বলে আমরা মনে করি, তা আসলে অপ্রয়োজনের সৌন্দর্যসৃষ্টির আনন্দ। তাঁর বক্তব্যটি যুক্তির নিরিখে যাই মনে হোক না কেন, বিশিষ্ট আদর্শের দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট :

> "শাসনের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া সৌন্দর্যের মাথায় রাজছত্র ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দর্যের আবশ্যকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মনুষ্যের মুখশ্রী মধুর হইত না।"

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত দিয়ে তারপর তিনি কবি, কবিতা ও সৌন্দর্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ 'আলোচনা' গ্রন্থেই সাহিত্য ও সৌন্দর্যের উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। পরের যুগে, বিশেষ করে 'সাধনা' পর্ব থেকে সাহিত্য ও সৌন্দর্যবিষয়ক আলোচনা এই রেখা ধরেই অগ্রসর হয়েছে। Theory of poetry-র একটা বড় আলোচ্য বিষয় হল Function of poetry। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদে তাকেই বলেছেন 'কবির কাজ'। তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত,

সৌন্দর্যসৃষ্টি কবিতার একমাত্র কাজ, কবির একমাত্র সাধনা। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম যৌবনের সুচিন্তিত অভিমত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> "কবিদের কি কাজ এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মত কাটাকুটি করিয়া এ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না।...বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতা-ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।...অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন,—জগতের সবত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ২য়, পৃঃ ৩০-৩১)

এখানে দু'একটা ইঙ্গিত লক্ষ্য করার মতো। বিদেশী সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে যুবক বয়সেই যে রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি মানসিক মিল হয় নি এবং এই সময় থেকেই তাঁর মনে সৌন্দর্য সম্বন্ধে নতুন চিন্তা গড়ে উঠেছে তা উক্ত মন্তব্য থেকেই প্রমাণিত হবে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের একমাত্র কাজ রূপনির্মিতি, যার সম্পর্কে ক্রোচে বলেছেন, "The aesthetic fact, therefore, is form, and nothing but form" (Croce-*Æsthetic*, *P. 16*), এবং সে-রূপনির্মিতির মূল কথা হল আমাদের অন্তরশায়ী সৌন্দর্যবোধের আত্মপ্রকাশ। যার প্রকাশ নেই, তার সৌন্দর্যও নেই। কুৎসিতের প্রধান ত্রুটি—তার প্রকাশ কুণ্ঠিত।[১১]

১১. "Beauty as *successful expression*, or rather, as *expression* and nothing more, because expression when it is not

আকাশে-মৃত্তিকায়, প্রকৃতির স্থূল-সূক্ষ্ম অযুত বর্ণিকাভঙ্গে যে সৌন্দর্য মানুষের হৃদয়ের কাছে, অনুভূতির দ্বারে প্রকাশিত হচ্ছে, আসলে তাই-ই হল মনোসমুদ্রসম্ভব আদিম সৌন্দর্যের শ্বেতপদ্ম। অন্তরে সেই রত্নপ্রদীপটি অনুক্ষণ জ্বলছে বলেই আমরা তার আলোকে পৃথিবীতে স্বর্গের ছায়া দেখি, পরিচিত প্রিয়জনের মুখের ওপর অমেয় সৌন্দর্যের অপরিচিত রহস্য উপলব্ধি করি। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-দার্শনিক এ কথাটাই একটু দার্শনিকসুলভ চিদ্‌বৃত্তির ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "The beauty of natural things is the archetype existing in the soul, the sole source of natural beauty" (Croce). প্লটিনাস সৌন্দর্যকে অনির্বচনীয়ত্বের কল্পনালোকে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের সৌন্দর্যচিন্তার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্লটিনাস বলেছেন, "The beautiful and art are now both alike melted into a mystical passion and elevation of the spirit."*

রবীন্দ্রনাথের মতে সৌন্দর্যের সঙ্গে তত্ত্ব ও নীতি-উপদেশের কোন সম্পর্ক নেই। লেসিং-ও বলেছেন, "The aim of art is delight." দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ শিল্প ও সৌন্দর্যের বিচারবিশ্লেষণে নীতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও সৌন্দর্যের শেষ নিদান আনন্দ—স্পষ্ট করে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এমন কোন অভিমত এখনও প্রকাশ করেন নি। কবিরা শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই একমাত্র কর্তব্য বলে জানেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির বাইরে তাঁদের আর কোন সৃষ্টিকর্ম নেই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন, "জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে" (র-র, অ. সং. ২য়, পৃঃ ৩২), সৌন্দর্যই কবিতার বিষয়। "কবিরা সেই সৌন্দর্যের কবি,…তাঁহারা উপদেশ দিতে আসেন নাই। সজীবতা ও সৌন্দর্যলাভ করিবার জন্য কখন

successful is not expression. Consequently, the ugly is unsuccessful expression." (B. Croce—*Æsthetic*, The Noonday Press, New York, P. 79)

* ক্রোচের উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১৬৬

কখন তত্ত্ব তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তত্ত্বের কাছে কখন উমেদারী করিতে যান না। কবিরা অমর, কেন-না তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন" (ঐ, পৃঃ ৩৩)। সৌন্দর্যসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ অমর বলে ধরেছেন, এবং কবিরা সেই অমরতা সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন বলে তাঁরাও অমর। সৌন্দর্যের অর্থ কি? চক্ষুকর্ণের প্রীতিজনক, ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদজনক সৃষ্টিকর্মকে কি যথার্থ সৌন্দর্য বলতে হবে? তাঁর মতে, সৌন্দর্যের অর্থ "হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া" (ঐ, পৃঃ ৩১)। দেখা যাচ্ছে, তাঁর সৌন্দর্যবোধ এবং নন্দনতাত্ত্বিকের সৌন্দর্যবোধ এক ব্যাপার নয়। চিত্তকে প্রসারিত করা, বৃহতের অভিমুখী করা, মনের অসাড়তা ও অচেতনতার বিরুদ্ধে সমগ্র সত্তাকে জাগিয়ে তোলা এবং হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করা—রবীন্দ্রনাথের মতে এই হল সৌন্দর্যের প্রধান কাজ। অর্থাৎ তাঁর মতে সৌন্দর্যবোধ শুধু ইন্দ্রিয়জ প্রীতির ব্যাপার নয়, এ তারও চেয়ে বড়। একে বরং sublime বলা যেতে পারে। লংগিনাস (১১৩-৭৩ খ্রীঃ অঃ) বহু শতাব্দী পূর্বে একেই *hupsous* বলেছিলেন, যার অর্থ হল উর্ধ্বতর সত্তায় উদ্বর্তন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে সৌন্দর্য ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সৌন্দর্যকে প্রেমে পরিণত করতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণা, কবিরা বিশ্ব-সৌন্দর্যের সাহায্যে আমাদের হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে তোলেন। ক্রমে এই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়ে।[১২] তা হলে দেখা যাচ্ছে, কবিরা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, তার একমাত্র ফলশ্রুতি প্রেম। এখনও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে আনন্দতত্ত্বের কথা বলেন নি, কিন্তু তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'বৈষ্ণব কবির গান' শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি উপচ্ছেদে তিনি সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট কথা বলেছেন। তাঁর ধারণা, "সৌন্দর্য যেন স্বর্গের জিনিস পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে।...

১২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ২য়, পৃঃ ৩৪

সৌন্দর্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গেমর্ত্যে চিরবিচ্ছেদ হইত।…পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে" (ঐ, পৃঃ ৪৭)। সৌন্দর্য যে divine ও archetype, সে ধরনের নানা কথা পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিকেরা নানাভাবে বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে কতকটা সেই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। সৌন্দর্য স্বর্গের, তা প্রতিদিনের মলিন মর্ত্য থেকে আমাদের অনন্তের দিকে নিয়ে যায়— "সৌন্দর্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়" (ঐ, পৃঃ ৪৮)। এই যে বার বার তিনি স্বর্গের কথা বলছেন, এটি আসলে অনন্তের জগৎ, এবং মনের জগৎ—যাকে বলে *ideality*। বস্তুগত সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মনোজগতের অসীম-ব্যঞ্জনা নানা রূপে রসে বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি যখন বলেছেন, "সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আবেকটি সৌন্দর্য-নিরুদ্দেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে," - তখন মনে হয়, তাঁর মনে সম্ভবতঃ ভারতীয় আলঙ্কারিকদের বহু-আলোচিত ব্যঞ্জনাতত্ত্বের কিছু ছায়া পড়েছে। জ্ঞানদাসের বংশীশিক্ষার একটি পদ[১৩] ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মর্ত্যের সঙ্গে স্বর্গের, বস্তুর সঙ্গে মনের, reality-র সঙ্গে ideality-র, সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনরসের মূল সূত্রটি সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যেই লাভ করেছেন এবং জ্ঞানদাসের পদ বিশ্লেষণ করে রাধা-কৃষ্ণের রূপকের মধ্য দিয়ে সীমা-অসীমের সেই মিলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বুঝেছেন "জগতের সৌন্দর্য অসীম-সৌন্দর্যকে ডাকিতেছে, তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন।…অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য ইহার গলায়

১৩. জ্ঞানদাসের "মুরলী করাও উপদেশ" পদটি কবি উল্লেখ করে বলেছেন, "সৌন্দর্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।" (ঐ, পৃ. ৪৯)

পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য স্বর্গমর্ত্যের বিবাহবন্ধন।" (পৃঃ ৫১)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে, যখন তাঁর চিত্তে ঔপনিষদিক ভাবরস এবং মহাজনদের গীতিরস একসুরে বেজে উঠেছিল, তখন তিনি সীমা-অসীমের নির্দ্বন্দ্ব ঐক্যের মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করেছেন এবং এ-ও লক্ষ্য করেছেন যে, সাহিত্য ও কবিতা সেই সৌন্দর্যকেই নানা রূপে-রসে পূর্ণ করে তুলছে। উপনিষদের এই প্রভাব তাঁর সাহিত্যচিন্তা, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং আনন্দবোধকে কীভাবে লালিত করেছে সেকথা আমরা এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করব। তবে এখন এইমাত্র বলা যায় যে, তাঁর কুড়ি-একুশ বছরের রচনাসংগ্রহের ('সমালোচনা') কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে সৌন্দর্যতত্ত্ব-সম্পর্কে তাঁর ধারণা, সৌন্দর্যের সঙ্গে সীমা-অসীমের সম্পর্ক, সৌন্দর্য ও প্রেমের সংযোগ—এটুকু বেশ স্পষ্ট হয়েছে। পরবর্তীযুগের সাহিত্য-আলোচনায় এই প্রেমই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে 'অনন্ত' ও 'আনন্দ' নামে আখ্যাত হয়েছে। সে যাই হোক, এই পুস্তিকা থেকে দেখা গেল, কাব্যসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য কীভাবে সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং সে সৌন্দর্যের পরিণাম হচ্ছে প্রেম, এ কথাটাই তিনি ছোট ছোট নিবন্ধের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য এ আলোচনা কোন কোন স্থলে অস্পষ্ট, কোথাও কোথাও যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনচিন্তারও সমর্থন নেই, কোথাও কবি ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতির রসে মনোগ্রাহ্য তত্ত্বকে ভাবাবেগে আর্দ্র করে তুলেছেন। সুতরাং তার এ নিবন্ধগুলি থেকে সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক প্রথাগত বাঁধা মতামতের সাক্ষাৎ ততটা পাওয়া যাবে না। কবির কোন প্রথামাফিক নিরেট দর্শনতত্ত্ব থাকে না। তত্ত্বকে, দর্শনকে অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে তাকে রসমূর্তি দেওয়াই কবির কাজ। কবির কাজ বৈচিত্র্য সৃষ্টি, দার্শনিকের কাজ ঐক্যের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা। একজন 'ডিস্‌কর্ড'-এর মধ্য দিয়ে, আর একজন 'হার্মনি'র মধ্য দিয়ে মেলক সুর সৃষ্টি করতে চান। দু'জনের পথ ভিন্ন হলেও

পথের প্রান্তটি এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। এখানে বিশুদ্ধ দর্শনচিন্তা ও তথ্যবিশ্লেষণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্য-সংক্রান্ত মনোভাবে ঠিক ধরা যাবে না। এক-এক মুহূর্তে তাঁর মনে যে-ভাবে ভাবগুলি পাখা মেলে এসেছে, তিনি সে-ভাবেই তাদের ধরেছেন—সুতরাং এ রচনার মধ্যে পরম্পর-যৌক্তিকতার কিছু অভাব আছে বলে তাত্ত্বিক ঈষৎ বিরস হতে পারেন। কিন্তু এযুগে মননের মনস্বিতার চেয়ে হৃদয়ের আবেগধর্মের দ্বারা কবি বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে মিশেছিল উপনিষদের সীমা-অসীম তত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের লীলারস—বিশেষ করে ঔপনিষদিক তত্ত্ব। 'প্রভাত-সঙ্গীত', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং 'আলোচনা' গ্রন্থের "ধর্ম" ও "আত্মা" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ দুটিতে উপনিষদের তত্ত্বকথাই রসরূপ ধারণ করেছে। 'আলোচনা' সংকলন থেকেই তাঁর মনে সাহিত্য ও সৌন্দর্যবিষয়ক কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে এবং যা ছিল ইঙ্গিত, 'সাধনা' ও পরবর্তী পর্বে, তাই হয়েছে সুদৃঢ় প্রত্যয়। সেকথা যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

৪

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' পর্বের শেষ সমালোচনাগ্রন্থ 'সমালোচনা' ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হলেও এর অধিকাংশ প্রবন্ধই ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাস থেকে ১২৯১ সনের ফাল্গুন মাসের মধ্যে রচিত ও 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। মোট ষোলটি প্রবন্ধের মধ্যে নয়টি প্রবন্ধ বিশেষ-ভাবে সাহিত্যবিষয়ঘটিত, আর কয়টি প্রবন্ধে সাহিত্যপ্রসঙ্গ থাকলেও সেগুলিতে তত্ত্ব, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে গুরুতর কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স উনিশ থেকে চব্বিশের মধ্যে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তিনি সাতাশ বৎসরের পরিণত যুবক, এবং সেই পরিণত মনের ছাপ পড়েছে

অনেকগুলি প্রবন্ধে। তাঁর পনের থেকে সাতাশ বছর—মোট বারো বছরের মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বঘটিত চিন্তাধারা কীভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তার চূড়ান্ত পরিচয় হল এই 'সমালোচনা'। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি প্রথমে সাহিত্যবিষয়ে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সাহিত্যের স্বরূপ, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ এই কয়টি প্রবন্ধে নানা দিক থেকে উত্থাপিত হয়েছেঃ (১) অনাবশ্যক, (২) তার্কিক, (৩) নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি, (৪) সঙ্গীত ও কবিতা, (৫) বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা, (৬) কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন। এই ছ'টি প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তারই দ্বারা 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ডি-প্রোফাণ্ডিস্', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা, বসন্তরায় ও বিদ্যাপতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার, এবং বাউল গানের রসবিচার ও সমালোচনা করেন। 'ভারতী' পত্রে সমালোচকের পদে আসীন হয়ে তাঁকে প্রচুর গ্রন্থ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হত। কোন মাপকাঠির সাহায্যে গ্রন্থ বিচার করতে হবে, নিন্দা-প্রশংসাকে কীভাবে ভাগাভাগি করতে হবে, সে বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। অবশ্য তাঁর কিছু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শন পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা করতে গিয়ে অনুরূপভাবে সাহিত্য-বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধের' অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখা। সাহিত্যের কর্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে এত গুরুতর চিন্তার কর্মে ব্যাপৃত হয়েছিলেন যে, সমালোচনার মোটামুটি পথরেখা নির্দেশ করেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছিলেন. সাহিত্য-সমালোচনার গোটা স্বরূপটিকে পূর্ণবলয়িত করবার অবকাশ পান নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ধরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছিল। তাঁর 'ভারতী' পর্বের 'সমালোচনা' গ্রন্থ এবং 'সাধনা' পর্বের সাহিত্য-বিচার ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ

মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও বিশেষ-বিশেষ গ্রন্থবিচারের জন্য সাহিত্যসমালোচনাবিষয়ক কিছু কিছু সাধারণ সূত্র ও বিচারপ্রণালী উপস্থাপনার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পূর্বের 'আলোচনা' গ্রন্থেই তার সূচনা হয়েছিল, অবশ্য সে-সময়ে সিদ্ধান্তগুলি কিছু শিথিল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু 'সমালোচনা' গ্রন্থে সাহিত্যবিচারপ্রণালী অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর এযুগের মতামত ও সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালেও পরিত্যক্ত হয় নি, শুধু অধিকতর পরিমার্জনা লাভ করেছে। এতে তিনি যে রীতি-প্রণালী অনুসরণ করেছেন, পরবর্তী যুগে তাতে দার্শনিকতা ও বৈচিত্র্য সংযুক্ত হলেও, তার মূল কিন্তু এই 'সমালোচনা'য় নিহিত। প্রথমেই তাঁর মনে হয়েছে, সাহিত্যবিচার ও সমালোচনার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না। তিনি বলছেন :

> 'ভালো বইয়ের ভালো আলোচনা ভালো, কুরুচিবিনাশক হানিজনক বইয়ের নিন্দা করাও দোষের নহে, কিন্তু লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করিলে তাহাতে কি ভালো হয় বুঝিতে পারি না।" ("ভাবিক", রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত-সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯)

এখানে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থারম্ভে তিনি বুঝেছেন, সাহিত্য-সমালোচনার আবশ্যকতা আছে। গ্রন্থের গুণ দেখান ও ত্রুটি নির্দেশ সাহিত্যের বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। কিন্তু যে-গ্রন্থ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীতই হয় নি, যে-লেখকের লেখক-সত্তাই গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেখানে অনাবশ্যক নিন্দাবিদ্রূপের দ্বারা পাঠক, সমালোচক ও লেখক কারও উপকার হয় না।[১৪] সুতরাং একথা অনুমান করতে বাধা নেই যে, ভারতী পর্বে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল সাহিত্যের যথার্থ বিকাশের জন্য সাহিত্য-সমালোচনাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

১৪. এ সম্পর্কে মরিস বাওরা বলেছেন, "The critic's task is to judge a work on its merits, to decide what in it is good and

এই গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমযৌবনে:সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলি শুধু তাঁরই নয়—সাহিত্যস্রষ্টা, সাহিত্যভোক্তা, সাহিত্যসমালোচক—প্রত্যেকেরই সমস্যা। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি যে সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, সেইগুলি তাঁর পরবর্তী সাহিত্যতত্ত্ব ঘটিত গ্রন্থে ('সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য, 'সাহিত্যের পথে') চিন্তার গঠন ও বিকাশের দিক থেকে আরও পূর্ণতা পেয়েছে, তা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করব। 'ভারতী' পর্বের সমালোচনা-প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সত্য ও তথ্য অর্থাৎ fact ও truth সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন, এবং বিশুদ্ধ শিল্পসাহিত্যে সত্য ও তথ্যের তুল্যমূল্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তাঁর পরিণত বয়সেও তিনি তাকেই নানাভাবে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'সমালোচনা'র প্রথম প্রবন্ধে ("অনাবশ্যক") জ্ঞানে জানা ও ভাবে জানা—তিনি এই দু'ভাবে জানার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আমরা জ্ঞানে জানি তথ্য বা fact-কে। "যাহা জানি তাহা না জানিয়া থাকিবার জো নাই বলিয়াই জানি।" তাই তাঁর প্রথমেই সিদ্ধান্ত হল, "কেবলমাত্র জ্ঞানে যাহাকে জানি তাহাকে কি আর জানা বলে। তাহাকে মানিয়া লওয়া বলে (পৃঃ ৫৯)।" হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ ভাবের সত্য জাগে, তখন যদি "নৈয়ায়িক শিকারীর ইঙ্গিতে দেশী, বিলাতী, আধুনিক, প্রাচীন, যত দেশের যত ন্যায়শাস্ত্রের যতগুলা যুক্তির খেঁকি কুকুর আছে, সকলগুলা একেবারে দাঁত খিঁচাইয়া সেই অসহায়দের উপর আসিয়া পড়ে, facts নামক ছোট ছোট ইটপাটকেল চার দিক হইতে তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তবে সে বেচারীরা দাঁড়ায় কোথায় ?" (পৃঃ ৬৪) এ বেচারী—অর্থাৎ কবির হৃদয়ানুভূতি, ভাবের আবেগ। কবি প্রশ্ন করেছেন,

what is bad, to relate it to the society in which he lives, and to other works with which it is, in some sense, comparable." (*English Critical Essays*, XX Century, Second Series, p. 131)

একদিকে আছে facts-এর নিরেট, নীরন্ধ্র অনবকাশ। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে উপযোগবাদ বা pragmatism। এই facts ও pragmatism— যা নৈয়ায়িক বুদ্ধির কেজো নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার দ্বারা কি ভাবের আবেগ ও ভাব স্বরূপ বোঝা যায়? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা শুধু তার এ যুগেরই সিদ্ধান্ত নয়, পরবর্তী কালেও তাঁর সমস্ত মনঃপ্রণালী এই 'সত্য' ও 'তথ্যে'র দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। 'সমালোচনা' গ্রন্থে এবিষয়ে তিনি বলেছেন :

> "জগতের যেমন একদিকে জ্ঞান আর একদিকে অনন্ত, একদিকে তীর, আর একদিকে সমুদ্র, আমাদের মনেও তেমনি একদিকে সীমা, আর একদিকে অসীম, সীমার রাজ্যে যুক্তির শাসন, অতএব সে রাজ্যে [illegible] পদে পদে তাহার [illegible] করিতে হয়। কিন্তু যখনি অসীমের রাজ্যে পদার্পণ করিলাম তখনি তাহার আর যুক্তির প্রভাব নাই—অতএব হে বন্ধু, হে তার্কিক, আমি যখন অসীমের রাজ্যে আছি, তখন আমাকে যুক্তি আইনের ভয় দেখাইলে আমি মানিব কেন?" (পৃঃ ৬৭)

বলা বাহুল্য এ সীমা-অসীম তত্ত্ব মূলতঃ উপনিষদ-ভিত্তিক, পিতৃদেবের সান্নিধ্য-সংস্পর্শহেতু যে-উপনিষদ তাঁর বাল্যকাল থেকেই আত্মার খাদ্যপানীয়ে পরিণত হয়েছিল। পিপ্পলীশাখায় অধিষ্ঠিত দুটি সুপর্ণের প্রতীকেই তিনি বস্তুকেন্দ্রিক, সীমাসঙ্কুচিত ফ্যাক্ট্-এর জগৎকে এবং আত্মকেন্দ্রিক অসীম প্রত্যয় ও বাসনার নিত্যসৌন্দর্যময় ভাবজগৎকে গ্রহণ, বিচার ও মূল্যায়ন করেছেন। চিত্রকলার পার্স্পেকটিভ-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, "যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড় করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে, বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোট। একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছগুলি প্রায় সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না—অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না।" লেখার বিষয়েও তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন। মনের কাছে যে-ভাবটি যেমন পার্স্‌পেকটিভ-এ উপস্থিত হয়, তাকে সেইভাবে প্রকাশ করাই শিল্প-সাহিত্যের উদ্দেশ্য। তাতে ফ্যাক্‌ট্‌-এর বৈরূপ্য ঘটলেও 'রূপদক্ষে'রা তাতেই খুশি হবেন। তাঁর উপদেশটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "এই জন্য লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায় যে, যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ তাহাই বড় করিয়া আঁক; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া, ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাটো করিবার কোন আবশ্যক নাই" (পৃঃ ৭০)। হৃদয়ের কাছে ব্যক্তিভাবরঞ্জিত হয়ে সাহিত্যের যে-রূপটা প্রকাশমান, সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাতে তথ্য বা ফ্যাক্‌ট অথবা যৌক্তিক পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হলেও তার ক্ষতি নেই। এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সত্য ও তথ্য, ভাব ও বস্তু, সৌন্দর্যের আবেদন ও যৌক্তিক পারম্পর্য সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, পরবর্তীকালেও সেই অভিমতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এটাই সাহিত্য ও শিল্পবিচারে তাঁর মৌলিক দান।

এরপর এই মূল সূত্রকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি প্রবন্ধে কবিত্ব, কল্পনা প্রভৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করেন। 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', 'সঙ্গীত ও কবিতা', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' এবং 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন'—এই চারিটি প্রবন্ধে তিনি সাধারণ-ভাবে সাহিত্য এবং বিশেষভাবে কাব্যসম্বন্ধে অনেক প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করেন এবং নিজস্ব ভাব-ভাবনা অনুসারে কাব্য, কল্পনা, কবি ও পাঠকের পারস্পরিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত এই চিন্তাগুলিকে বাংলা সাহিত্যে theory of poetry আলোচনার সোপান বলে গণ্য করা যায়।

সে-যুগে 'নীরব কবি' কথাটা কৃত্রিম ফ্যাসনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্যজগতের দিক্‌পাল ব্যক্তিরাও 'নীরব কবি' নামক 'দিল্লীকা লাড্ডু'র কল্পিত স্বাদে বেশ কিছুকাল মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের কাছে যুক্তিবিরোধী ও হাস্যকর মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'সাহিত্যে'ও

তিনি কালীপ্রসন্নের 'নীরব কবিত্ব' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তার আলোচনা করব। তবে কবির ধর্মই হল প্রকাশ, একথা তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন না, অপ্রতিরোধ্য যুক্তিজাল সৃষ্টি করে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত নস্যাৎ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালের (মাঘ) 'বঙ্গদর্শনে' "বাঙ্গালি কবি কেন" প্রবন্ধে একটু লঘুভাবে, সময়-সমাপরস্পরবিরোধী কথা বলে, প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, বাঙালীর কল্পনা অশিক্ষিত, অমার্জিত ও অসংযত বলেই বাঙালী কবি। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, য়ুরোপীয়েরা ক্রিয়াবান মনঃশক্তি প্রসঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান-তত্ত্ব নিয়ে কত গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করছে। আর আমাদের দেশ? "আমাদের দেশে কেবল রস, কেবল কল্পনা, কেবল কবিত্ব,—কেবল নির্মল চন্দ্রিকা, আর প্রফুল্ল মল্লিকা, কোকিলের কূজন, আর ভ্রমরের গুঞ্জন, কবরীভূষণ, আর কাঁচলিকষণ, বিরহিণী বালা আর যৌবনের জ্বালা।" বঙ্কিমের এ মন্তব্য ঈষৎ তির্যক হলেও খুব কিছু প্রতিবাদযোগ্য নয়। দেশে যখন সুস্থ কর্মপন্থার স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন বিক্ষিপ্ত-বুদ্ধি অলস poetasterদের কবিত্ব-কণ্ডুয়ন একমাত্র সম্বল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার সুর চড়িয়ে বাঙালীর কবিপ্রতিভাকে ব্যঙ্গ করলে, রবীন্দ্রনাথ সে কৃত্রিম যুক্তিজালের আক্রমণ সইতে পারলেন না। অবশ্য 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ১২৮৭ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে দুটি প্রবন্ধে ('বাঙ্গালি কবি কেন', এবং 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন') বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সমালোচনা করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কবিত্বের অর্থ কবির আত্মপ্রকাশ, কবিত্বের সঙ্গে অশিক্ষিত কল্পনার কোন যোগ নেই। হৃদয়ের কবিত্ব ও চিত্তের কর্মঠতা একই চাষের শস্য—এইভাবে কৌশলে বঙ্কিমের মতের সমালোচনা করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার বেশ কিছু পরে প্রথম-যুবক রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের প্রতিবাদ করে কাব্যতত্ত্বের মূল স্বরূপটি

আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। পরে তিনি 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন' এবং 'বাঙ্গালি কবি কেন' প্রবন্ধ দুটির ঈষৎ পরিমার্জন করে "নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি", এই নামে 'সমালোচনা' গ্রন্থে প্রকাশ করেন (১২৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর কর্মবিমুখতা, জ্ঞানবিজ্ঞানে অনীহা এবং কেবলমাত্র কাব্যসাহিত্যে অতি-আগ্রহ আদৌ সুচক্ষে দেখেন নি। তাই ঈষৎ তিক্তভাবে বলেছেন "কবিত্বের প্রধান উপকরণ অনুভাবকতা ও কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে-কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে-কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি।..... আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জিতবুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ। সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি।" বলা বাহুল্য সাহিত্যসম্রাটের এ যুক্তিক্রম যে সত্য নয়, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কে বেশী জানতেন? ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে অনুভব করলেই কবি হওয়া যায় না। কিংবা ভালোবাসা বা ঘৃণার সঙ্গে কবিত্বের অঙ্গাঙ্গী কোন যোগ নেই। আর তা ছাড়া অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরই কল্পনায় অধিকার—এ অভিমত একেবারেই গ্রাহ্য নয়। আসল কথা, কর্মকুণ্ঠ এবং কেবল-কবিত্ব-চর্চায়-ব্যস্ত অলস বাঙালীকে বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছে করেই নিন্দা করেছেন। প্রবন্ধটি গভীর ভাবের বশে লেখা নয়, এর সুর মূলতঃ ব্যঙ্গের সুর। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথ, যিনি কাব্য, কল্পনা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, তিনি এ ধরনের অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী কথা—হোক তা ব্যঙ্গের ছলে বলা, তা তিনি কোনমতেই মেনে নিতে পারলেন না, সাহিত্যরথীর মতের প্রতিবাদে কর্তব্যবোধেই অগ্রসর হলেন। কবির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বললেন,

> "লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রেণীর ভাবসমূহ (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে। নীরব ও কবি দুটি অন্যোন্যবিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত

> বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও তবে এমন একটি পরস্পরধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয় যে, শুভদৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবা-মাত্রই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে।”

অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত হল, “কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না।…যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না সেও কবি নহে” (পৃঃ ৮১)। সুতরাং তাঁর মতে নীরবতা কবিত্বের লক্ষণ নয়, প্রকাশধর্মই কবিত্বের একমাত্র ধর্ম। ক্রোচে-পন্থী সমালোচক ex-pression-কেই শিল্প-সাহিত্য বলবেন। যে-কোন শিল্পসৃষ্টি প্রকাশের মধ্য দিয়ে জীবনলাভ করে। শিল্পের ভাববীজ কারও মনের মধ্যে গাঁথা থাকলে তাকে কখনও শিল্পী বলা যাবে না। এ সম্পর্ক অনেকটা আলঙ্কারিকদের ভাব ও রসের সম্পর্কের মতো। প্রাকৃত জগৎ থেকে যে idea-র জন্ম হয় তাকে বলে ভাব, শিল্পের জগৎ থেকে সেই ভাবের জন্ম হলে তাকে বলে রস। অন্তরে উপচিত ভাব হল নিছক আইডিয়া; সেই আইডিয়া যখন শিল্পীর মানসিক প্রবণতা ও সামর্থ্যানুসারে বিভিন্ন স্থূল-সূক্ষ্ম মিডিয়মের (বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব) মধ্য দিয়ে পূর্ণসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই তাকে বলতে পারি একটি শিল্পকর্ম। চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, অভিনয়, সাহিত্য—এ সমস্তই প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে, শিল্পী তাকে মূকত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করেন। শিল্পী রামচন্দ্র বস্তুজগতের পাষাণী অহল্যাকে প্রাণহীন প্রস্তরসত্তা থেকে প্রাণপূর্ণ মানবী সত্তায় ফিরিয়ে আনেন। এই হল শিল্পীর কাজ এবং এটাই হল সমস্ত মানসিক সৃষ্টির মূল কথা। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, “Expression always arises directly from impressions.”[১৫] শিল্পীর মানসিক সংবেদনই শিল্পের মধ্যে ফুটে ওঠে, এবং শিল্পের মধ্যে ফুটে ওঠার অর্থ হল প্রকাশ পাওয়া। ক্রোচের এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথেরও মনের কথা,--“The poet or painter

১৫. Croce—*Æsthetic*, The Noonday Press, New York, p. 20.

who lacks form, lacks everything, because he lacks himself."[১৬] বস্তুতঃ কবি-শিল্পী আত্মপ্রকাশের বেদনায় অস্থির হয়েই তাঁর প্রত্যয়ীভূত ভাবরাজিকে বস্তুপ্রতীকের মারফতে ফুটিয়ে তোলেন। সুতরাং কবির আত্মপ্রকাশই কবির একমাত্র ধর্ম, কবিতারও প্রাণকেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন থেকেই প্রকাশতত্ত্বকে শিল্পতত্ত্বের আদি কথা বলে মেনে এসেছেন। পরবর্তীকালে এই প্রকাশতত্ত্বকে তিনি ঔপনিষদিক তত্ত্বাদর্শের দ্বারা শোধন করে নিয়েছেন। 'সমালোচনা' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ শিল্পীজীবনের মূল তত্ত্ব, অর্থাৎ প্রকাশতত্ত্ব বা expression সম্বন্ধে প্রথম যৌবনেই অতিশয় সচেতন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ বিদ্রূপচ্ছলে বলেছিলেন যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের কল্পনাশক্তি প্রবল হলে তারাও কবি, বালকেরাও কবি। তাঁর এ মন্তব্য বিদ্রূপাত্মক লঘুধরনের উক্তি বলেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ মন্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত নয় তা বালকেও বুঝবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে-যুগের প্রধান লেখকের এজাতীয় বঙ্গপরিহাসও মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে বালকেরা "কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ, বয়স্ক লোকদের মত করে না" (পৃঃ ৮১)। সুতরাং বালকেরাই কবি, বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্য কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়। মূর্খ লোকের কল্পনা উদ্ভট ও অস্বাভাবিক বলে কি তাকেও কবি বলতে হবে? উন্মাদের কল্পনা তো আরও বিচিত্র। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত, "কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক।" অনেক সময়ে কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তখন অঘটনঘটনপটীয়সী কাল্পনিকতা চিত্তকে অধিকার করে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণের 'কমলে কামিনী'র সৌন্দর্যের মধ্যে সুসমঞ্জস কল্পনার অভাব দেখেছিলেন, "কবিকঙ্কণের 'কমলে-কামিনী'তে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণসামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের

১৬. Ibid, p. 25.

সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্‌গীরণ কোন মতেই একত্রে উদিত হইতে পারে না" (পৃঃ ৮৪)।* সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু কল্পনা থাকলে হবে না, তার মধ্যে সামঞ্জস্য চাই। সে সামঞ্জস্যের অর্থ সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য ও সংযম। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও দু'টি মূল্যবান উক্তি করেছেন ঃ

১. "প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ।" (পৃঃ ৮৫)

২ "দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারি না।" (পৃঃ ঐ)

এখানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃতির কাছে কল্পনা কিছু খাটো এবং কল্পনা পরিবেশের সীমা ছাড়াতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, প্রকৃতি-পারবশ্য যদি কল্পনার শেষ সীমা হত, তা হলে কবিতা বহুস্থলে অনুকরণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারত না। এবং

* রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানটি লইয়া মুকুন্দরামের সৌন্দর্যকল্পনায় খুঁত বাহির করিয়াছেন। এমন মহান সমুদ্রের শোভা, এমন সুন্দর পদ্মবন, তন্মধ্যে এমন সুন্দরী রমণীমূর্তি, একমাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীভৎস কল্পনায় সৌন্দর্যের চিত্রখানি কবি একেবারে কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীকাব্য ধর্ম-কাব্য, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্য দেবতা। গজগ্রাসশীলা চণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধর্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ববর্তী সমস্ত চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মূর্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূজামণ্ডপে ভাস্করহস্তে এই ভাবের মূর্তিই গঠিত হইয়া পূজিত হইত, কবি এই মূর্তিকে স্বীয় তুলি দ্বারা সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না। গণেশের শুণ্ড বর্জন করিয়া তাঁহার দন্তের সঙ্গে মুক্তা কি দাড়িম্ববীজের উপমা দেওয়াও যেরূপ হাস্যকর হয়, এস্থলে কবির স্বীয় কল্পনা দ্বারা দেবীর মূর্তি সংশোধিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপ হাস্যকর হইত।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৫৮ (৮ম সংস্করণ)

কল্পনা যদি অতি মাত্রায় পরিবেশ-কেন্দ্রিক হত, তা হলে নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার কোন শক্তি কবির থাকত না। কল্পনা যে 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত', রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হন নি। অথচ কিশোর কাল থেকেই কাব্য-কবিতায় তিনি কল্পনাবালার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, 'সাধনা' পর্বের আলোচনায় তিনি কল্পনাকে সীমার সঙ্কীর্ণতা থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সে-যুগে কল্পনা ও শিল্পসৃষ্টির স্বরূপ প্রায় একাঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল।

'সঙ্গীত ও কবিতা' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, গদ্য ও পদ্যের কার্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর উক্তিটি গূঢ় অর্থবহ—"যুক্তির ভাষা গদ্য আমাদের বিশ্বাস করায় আর কবিতার ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়।" এখানে উদ্রেক করায় শব্দটি বোধ হয় টলস্টয়ের "infection"-এর অনুরূপ ব্যঞ্জনা বহন করছে। বস্তুতঃ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অবিকল টলস্টয়ের মতোই শিল্পের "সংক্রামক" তত্ত্বের কথা বলেছেন যদিও টলস্টয়ের উক্ত 'infection'-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের অন্ততঃ দশ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৭] ১২৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করিতেছি তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্যভাবের উদ্রেক হয়" (পৃঃ ৮৮)। এ কথাটাই আর একটু সরল করে টলস্টয় বলেছেন ;

> "There is one indubitable sign distinguishing real art from its counterfeit—namely, the infectiousness of art. If a man without exercising effort and without altering his standpoint, on reading, hearing, or seeing another man's work experiences a mental

১৭. টলস্টয়ের *What is Art* শীর্ষক প্রবন্ধ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত 'infection'-তত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ ১৮৯৮ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। এতেই 'infection' তত্ত্ব সবিস্তারে আলোচিত হয়েছিল।

condition which unites him with that man and with others who are also affected by the work, then the object evoking the condition is a work of art."
—*What is Art* (Tolstoy), Oxford University Press, London, p. 225

অন্য কথায় :

"If a man is infected by the author's condition of soul, if he feels this emotion and this union with others, then the object which has effected this is art"—Ibid, p. 228

এখানে টলস্টয় নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেও infection-তত্ত্বের প্রকৃত ব্যাপারটিকে যথেষ্ট স্বচ্ছ করতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু 'সংক্রামকতাই শিল্পের লক্ষণ'--একথা বলে কর্তব্য সমাধা করেন নি। তাঁর মতে:

"আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করান, আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি তোমাকে তাহাই অনুভব করান—এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি, একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারিদিকে মাপিয়া জুখিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে, গোলাপ সুগোল—আর, আমি অনুভব করাইতে পারি না যে, গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়।" (পৃঃ ৮৮)

এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু 'কবিতার সাহায্য' না বলে যাবতীয় শিল্প-সৃষ্টিকেই আলোচনায় আনতে পারতেন। তাঁর মতে সংক্রামকতা বুদ্ধির দ্বারাও হতে পারে, সৌন্দর্যের দ্বারাও হতে পারে, আবেগের দ্বারাও হতে পারে। বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাস করানো যায়—তার মিডিয়ম হল যুক্তি। যুক্তির দ্বারা একজনের বুদ্ধি অপরের যুক্তি-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে কোন বিষয়কে বিশ্বাস করাতে পারে। সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টার সৌন্দর্যানুভূতিকে উদ্রিক্ত করাও সম্ভব। তার মিডিয়ম হল

aesthetic motif বা সৌন্দর্যের উপাদান। এই সৌন্দর্যানুভূতিও বুদ্ধির সামঞ্জস্যবোধ থেকে আসে, বস্তুতঃ সৌন্দর্যানুভূতি বুদ্ধির সামঞ্জস্যবোধকেই অবলম্বন করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যানুভূতি আনন্দে পরিণত হয়, যে-আনন্দ হচ্ছে বুদ্ধি ও আবেগের রসায়নে প্রস্তুত শিল্পত্বের একমাত্র ফলশ্রুতি। কাব্য অর্থাৎ সাহিত্য মূলতঃ আবেগকে অবলম্বন করে, লেখকের আবেগ ও অনুভূতি পাঠকের অন্তর্লোকেও অনুরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। মিডিয়ম হল—সংস্কৃত মতে বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব, পাশ্চাত্য মতে sense stuff। এই আলোচনায় কাব্যের দ্বারা এক মন থেকে অপর মনে আনন্দের অভিসংক্রমণ,—রবীন্দ্রনাথ এই মতে উপনীত হয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, আধুনিক যুগই যথার্থ কাব্য-কবিতার বৈচিত্র্যের যুগ। যাঁরা কাব্যের যুগ চলে গেছে বলে হা-হুতাশ করেন কবি সে দলের নন। মেকলে একবার বলেছিলেন যে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে কবিত্বের হ্রাস হয়। ঈষৎ অনগ্রসর অন্ধকার যুগেই মহাকাব্যাদি লেখা হয়েছিল। আধুনিক সভ্যতাভিমানী সমাজে আর মহাকাব্য লেখা হয় কি? মেকলের এ-সম্পর্কীয় মন্তব্যটি বেশ কৌতুকাবহ; "And as the magic lantern acts best in a dark room, poetry affects its purpose most completely in a dark age."[১৮] অন্ধকার ঘরেই ছায়াবাজি জমে ভাল, অন্ধকার যুগেই কবিতার কাজ হাসিল হয় সহজে। মিল্টনের প্রতিভা বিচার করতে গিয়ে মেকলে পরিষ্কার বলেছেন, "Perhaps no person can be a poet, or can even enjoy poetry, without a certain unsoundness of mind.··· Truth indeed, is essential to poetry; but it is the truth of

১৮. *Macaulay's Essays*, Everyman's Library, 1907, pp. 154-55.

madness."* তাঁর মতে কাব্যের ভাবাবেগ ও উন্মত্ততার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। অসভ্য সমাজেই কাব্য ও কল্পনার বেশী বিকাশ হয় এবং অসভ্য বর্বর সমাজেই "one may expect to find the poetical temperament in its highest perfection." কিন্তু সভ্যযুগে, বিদ্বৎসমাজে কাব্যের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাবে।[১৯]

---

* প্লেটো তাঁর *Phaedrus*-এ কবিদের দিব্যশক্তি ('Theia dunamis') স্বীকার করেও তাঁদের কল্পনাকে পাগলামি বলেছেন, *Ion*-এ এ-মত আর একটু তীব্র হয়েছে। কিন্তু তাঁর *Republic*-এ মিথ্যাচারী কবিদের প্রতি নির্মম শর নিক্ষিপ্ত হয়েছে (দশম অধ্যায়)। এই প্রসঙ্গে কবিদের প্রতি শেক্সপিয়রের খোঁচা স্মরণ করা যেতে পারে :

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact
(*A Midsummer Night's Dream*, IV, I)

অবশ্য এই ছত্র দুইটির পরেই তিনি স্বীকার করেছেন :

One sees more devils than vast hell can hold,
That is, the madman,

কিন্তু কবির সম্বন্ধে বলেছেন :

The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

কবিশ্রেষ্ঠ শেক্সপিয়র দ্বিতীয়বিধাতা কবিকে যে এই শ্রদ্ধা অর্পণ করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মনীষী মেকলে কবিতা লিখলেও কবিদের প্রতি সুবিচার করেন নি।

১৯. "In an enlightened age there will be much intelligence, much science, much philosophy, abundance of just classification and subtle analysis, abundance of wit and eloquence, abundance of verses, and even of good ones, but little poetry."—*Macaulay's Essays*, Everyman's Library, 1907, p. 415.

অবশ্য শুধু মেকলে নন, হ্যাজলিট-ও কতকটা এই ধরনের মতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরও মতে, "The necessary advances of civilization are unfavourable to the spirit of poetry."[২০]

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন,—এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে (পৃঃ ১০৫)।" এমত রবীন্দ্রনাথ ভ্রান্ত মনে করেছেন। যুগভেদে কাব্যেরও ভেদ হয়ে থাকে। এক সময় মহাকাব্য রচিত হত যুগের প্রয়োজনে, এখন সে যুগ চলে-গেছে, সুতরাং মহাকাব্যও আর রচিত হয় না। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের বৈচিত্র্যের জন্য কাব্যপ্রবৃত্তির হ্রাস না হয়ে বরং বৃদ্ধিই হবে। "যখন জটিল লীলাময় গাঢ় বিচিত্র বেগবান মনোবৃত্তি সকল সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত, ঘটনাবৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়" (পৃঃ ১০৭-৮)। এখানে দেখা যাচ্ছে, মেকলে-হ্যাজলিট আধুনিক বিজ্ঞানালোকিত যুগে কবিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যে আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালের সঙ্কীর্ণতা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্য সেকালের কাব্যপ্রকরণ জটিল হয়ে পড়েনি, কিন্তু কাল যত অগ্রসর হয়েছে কাব্যপ্রকরণও তত জটিল, বিচিত্র, ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত হল, "যতই জ্ঞান বাড়িতেছে, ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে, কবিতার ততই শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে" (পৃঃ ১১০)। এখানে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ বাহ্যতঃ মেকলে ও হ্যাজলিটের কথা না মানলেও প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন যে,

২০. *Hazlit's Works*—Edited hy P.P. Howe, Vol. IX.

মহাকাব্য আর রচিত হবে না, সে-যুগ ও পরিবেশ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন নতুনযুগে কাব্যের গৌরব মহাকাব্যের একক গৌরব থেকে নেমে এসে গীতিকাব্য-খণ্ডকাব্যাদির বহুত্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যাঁরা এখনও কৃত্রিমভাবে মহাকাব্যের যুদ্ধবিগ্রহ, বীররস, বর্ণনার ঘনঘটা আঁকড়ে গতপ্রাণ অতিকায় প্রাণীকে পুনরায় বাঁচাতে চাচ্ছেন, তাঁরা ঘড়ির কাঁটা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। মধুসূদনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কৈশোর বয়সে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন এই কারণেই। তাঁর মতে বর্তমান যুগে একজন ব্যাস, একজন বাল্মীকি, একজন হোমরের জন্ম আর হবে না। এমনকি ভার্জিল, দান্তে, তাসো, মিল্টন, কালিদাসও তাদের মহাকাব্য নিয়ে আর আসরে নামতে পারবেন না, তাঁদের আসতে হলে, মহাকাব্যের রাজপোষাক পরিত্যাগ করে, হয় গীতিরসের রাখালী পোষাক পরতে হবে, অথবা খণ্ডকাব্যের অনুজ্জ্বল পোষাক ধারণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে পরিহাসের ছলে বলেছেন :

আমি নারব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিনীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত,
স্বপ্ন মতো।
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র
অষ্টসর্গ

কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ
রইল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবীকেলে
কীর্তিকলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত,
স্বপ্ন মতো।

এর পরিহাসের কথা বাদ দিলে এটাই হল মহাকাব্য-গীতিকাব্য-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। অবশ্য ও-দেশে কেউ কেউ ইদানীং মহাকাব্য লিখবার প্রয়াস করছেন, কিন্তু মহাকাব্য আর কোন দিন জনবল্লভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক অতিকায় প্রাণী আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, রাজামহারাজারাও তাঁদের বর্মচর্ম নিয়ে এখন স্মৃতির জাদুঘরে আশ্রয় নিয়েছেন, মহাকাব্য স্বাভাবিক ভাবেই কবি ও পাঠকের অনুকূল্য হারিয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বহুলাংশে বাস্তবানুগ এবং যুক্তিসম্মত। তিনি মহাকাব্য-সংক্রান্ত এ-মত ব্যক্ত করেছিলেন ১৮৮২ সনে। তার পর ছিয়াশি বছর চলে গেছে। বিশ্বের সাহিত্য ও ইতিহাস বিবেচনা করলে এ কথা এখনও যৌক্তিক মনে হবে। হার্ডির *The Dynasts* ছাড়া রসোত্তীর্ণ আর কোন মহাকাব্য-শ্রেণীর রচনা ইদানীং পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।*

এই 'সমালোচনা' গ্রন্থে প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক আর এক প্রকার বিচার-মানের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রবন্ধটি হল 'বস্তুগত ও ভাবগত

* অবশ্য বর্তমানকালেও কোন কোন দুঃসাহসী কবি পূর্বতন মহাকাব্যের জের টেনে চলেছেন। গ্রীক কবি কাজানৎজাকিস-এর *The Odyssey—a Modern Seauel* এবং ফরাসী কবি সাজন প্যার্স্-এর *Amers* সাম্প্রতিক-কালে রচিত মহাকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত।

কবিতা'। এটি ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। তখন কবি সবেমাত্র বিশ বছরে পড়েছেন। প্রবন্ধটির গোড়াতে, যাকে বলে other-worldliness, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাবে। এখানে তাঁর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা চলতে পারে :

> "চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই হাটবাজার, সদাসর্বদাই কাজকর্ম বিষয়-আশয় চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনাদার, দক্ষিণে বিষয়কর্ম, বামে লোকলৌকিকতা, পদতলে গতকল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামীকল্যের জন্য জমা। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি— পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, একমুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই।" (পৃঃ ৯২-৯৩)

তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা—বস্তুজগৎ, পরিচিত 'মাটি ও মাংসের' জগৎ ছাড়িয়ে যাবার ব্যাকুল বাসনা—এ তো যে-কোন রোমান্টিক কবিরই আর্তনাদ। তিনি নিজেও তো 'সব পেয়েছির দেশে'র জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বলেছেন :

> নাইকো পথে ঠেলাঠেলি নাইকো হাটে গোল,
> ওরে কবি, এইখানে তোর কুটিরখানি তোল্।
> ধুয়ে ফেল্‌রে পথের ধূলো নামিয়ে দেরে বোঝা,
> বেঁধে নে তোর সেতারখানি রেখে দে তোর খোঁজা।
> পা ছড়িয়ে বস রে হেথায় সারা দিনের শেষে
> তারায়-ভরা আকাশতলে সব-পেয়েছির দেশে।

এ ধরনের 'সব-পেয়েছির দেশের' কথা, 'Land of Heart's Desire', 'সাস্‌কে হান্না' (Susquehanna) নদীর স্বপ্ন প্রায় তাবৎ রোমান্টিক কবিকুলই দেখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবিদের 'নরোত্তম'। সুতরাং তিনি যে 'অধরা' দেশের জন্য ব্যাকুল হবেন, তাতে আর

বিস্ময়ের কি আছে ? কিন্তু তাঁর 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' প্রবন্ধটির বক্তব্যবিষয় শুধু বিশুদ্ধ রোমান্টিক সৌন্দর্যপিয়াসী আত্মার ব্যাকুলতায় সমাপ্তি লাভ করে নি, এটিতে রোমান্টিক কবি মীস্টিক হবার চেষ্টা করেছেন। এর সমসাময়িক কালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েন কর্ম-সূত্রে। তাঁর রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত যথারীতি সমাজে গাওয়াও হচ্ছিল। এই ধরনের অধ্যাত্মমুখী চেতনা তাঁর যৌবনকালের সাহিত্যসৃষ্টিতেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তিনি 'ভাবগত কবিতা' বলতে অধ্যাত্মমুখী কবিতাকেই নির্দেশ করেছেন। এবিষয়ে তাঁর মন্তব্য খানিকটা দার্শনিক প্রত্যয়সিদ্ধ স্বগতোক্তির মতো :

> "সম্মুখে চাহিয়া দেখি—সীমা নাই! পদতলে চাহিয়া দেখি—সেইখানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চতুর্দিকে ভাষার অনধিগম্য সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যাবেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয়, যেন ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি—কে জানে কোথায় ? ওই যে দূর দিগন্তে স্বর্ণের মৃদু রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক হইতে আসিতেছে। সে জন্মভূমির সকল কথা ভুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে—অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুটভাবে।" (পৃঃ ৯৩)

এই স্বপ্নময় অস্ফুটভাবকে স্ফুটতর করা, শেক্সপিয়রের ভাষায়

> And as imagination bodies forth
> The forms of things unknown, the Poet's pen
> Turns them into shapes and gives to airy nothing
> A local habitation, and a name.

এটাই কবির স্বভাব ও কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কল্পনা' কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতাতেও স্বপ্নসমুদ্র সন্তরণ করে চিররোমান্টিকতার উজ্জয়িনী-পুরে পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু এই 'বস্তুগত

ও ভাবগত কবিতা'য় তিনি বস্তুজগৎ, মাটি ও মাংসের জগতের প্রতি প্রবল অনীহা প্রকাশ করে বলেছেন :

> "রক্তমাংসের অত কাছে ঘেঁষিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি, ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি, ত ই ত ভাল।" (পৃঃ ৯৬)

বস্তুতঃ 'রক্তমাংসের কাছে ঘেঁষা' রবীন্দ্রনাথের স্বভাবধর্ম নয়। কাজেই যে কবিতায় স্থূল বস্তুজগতের এবং রক্তমাংসের তীব্র গন্ধ আছে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই তার ওপর বিরূপ। এখানে দেখা যাচ্ছে, যে-কবিতায় সুদূরের ব্যঞ্জনা বেশী, যেখানে অচেনা পৃথিবীর অজানা রহস্য তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে মানসপ্রয়াণ করে স্বস্তি পান। কিন্তু ভাবগত কবিতা বলতে তিনি কি ইন্দ্রিয়াতীত, 'বাক্‌পথাতীত' ধরনের কাব্যসাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন? এ সম্বন্ধে তিনি পাঠকের কোন দ্বিধা রাখবার অবকাশ দেন নি। তাঁর মতটি প্রণিধানযোগ্য :

> "এমন লোকও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চশ্রেণীর। তাঁহারা বলেন, ইহাও ভাল, উহাও ভাল। আবার এমন লোকও আছেন, যাহারা বস্তুগত কবিতা অধিকতর উপভোগ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিবান লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভাল, না অতীন্দ্রিয় সুখ ভাল? রূপ ভাল, না গুণ ভাল? ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কাবতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।" (পৃঃ ৯৩)

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কবি 'ভাবগত কবিতা' বলতে মীস্টিক জাতের, ইন্দ্রিয়াতীত জগতের অপরোক্ষ অনুভূতিকেই নির্দেশ করেছেন। যে-সমস্ত কবিতা ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তাকে তিনি বস্তুগত কবিতা বলেছেন। তাঁর মতে বস্তুগত কবিতার তুলনায় ভাবগত কবিতা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও স্পৃহণীয়। তাঁর

প্রথম-যৌবনের এ মত পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। এ-মত আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নয়। সাহিত্যবিচার ও উপভোগে ভাবগত ও বস্তুগত—এভাবে কবিতাকে ভাগ করা যায় না। চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুধর্ম ও সমাজঘেঁষা সাহিত্যবুদ্ধিকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। কারণ কাব্যসাহিত্য সর্বোপরি রসবস্তু। তার সঙ্গে দল বা মতের কোন সংস্রব নেই। কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি কতকটা সেই ধরনের মতই কি প্রকাশ করেন নি? প্রথমতঃ ভাবগত কবিতাকে অতীন্দ্রিয় কবিতারূপে গ্রহণ করার কোন রীতি সমালোচনায় স্বীকৃত হয় না। প্রত্যেক কবিতাই ভাবগত। বস্তুগত বলে কবিতা কেন, কোন শিল্পকর্মই হতে পারে না। বস্তুকে ছাড়িয়ে ওঠাই শিল্পের ধর্ম। তাজমহলের শিল্পত্ব পাথরের মধ্যে নেই, প্রস্তরকঠিন বস্তুপিণ্ডকে অতিক্রম না করলে শিল্প কায়া লাভ করলেও কখনও কান্তি লাভ করতে পারে না। কি কবিতা, কি চিত্র, কি মর্মরসৌধ—সবই বস্তু-উপাদানকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। কিন্তু বস্তুত্বকে ছাড়িয়ে ভাবলোকে (অলঙ্কার শাস্ত্রমতে রসলোকে, পাশ্চাত্য মতে aesthetic emotion-এ) প্রয়াণ করাই হচ্ছে 'চৌষট্টি কলা'র একমাত্র 'ফলশ্রুতি'। কবির মানসিক প্রবণতা হিসেবে *motif*-এর মধ্যে কখনও পরিদৃশ্যমানতা, কখনও-বা অশরীরী অমূর্ত ভাবব্যঞ্জনা বেশী থাকে। কিন্তু স্থূল চাক্ষুষ ব্যাপারই হোক, আর সূক্ষ্ম ভাবমূর্তিই হোক, যে-কোন পথেই রস, সৌন্দর্য ও আনন্দ সঞ্চারই কলালক্ষ্মীর একমাত্র আশীর্বাদ। সাফোর গীতিকবিতা, বোকাচিও-মোপাসাঁর গল্প, জোলা ও মিলারের উপন্যাস—এর মধ্যে রক্তমাংসের স্বাদ কিছু তীব্র। আবার ভারতীয় সন্তসাধকদের গানে ও বাউলদের পদে 'অধর'-মানুষের ব্যঞ্জনা কিছু বেশী। কিন্তু আস্বাদ্যমানতা পেলে উভয়ই শিল্প হিসেবে সার্থক হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত বস্তুগত ও ভাবগত কবিতার শ্রেণীভেদ এবং ভাবগত কবিতার প্রতি অধিক আনুকূল্য সাহিত্যরসিকের কাছে স্বীকৃতি পাবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে, এমন কি তার কিছু পূর্ববর্তী প্রবন্ধেও এই 'other-worldliness'-এর কিছু কিছু ইঙ্গিত

পাওয়া যায়। এই যুগে টেনিসনের 'ডি প্রোফাণ্ডিস্' কবিতা অবলম্বনে তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন, তারও মূলকথা অন্যলোকের ব্যঞ্জনা। 'ভারতী'তে প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ, ১২৮৮) 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি' প্রবন্ধেও দেখা যাচ্ছে, এই সময়ে তিনি অধ্যাত্মদর্শনের দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনে হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং দেবেন্দ্রনাথেব পরোক্ষ প্রভাবে ঔপনিষদিক রসাবেশে মুগ্ধ হয়ে রোমান্টিক সৌন্দর্যপিয়াসী কবি কিছু মীস্টিক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এধরনেব সিদ্ধান্তেব অযৌক্তিকতা নিশ্চয়ই পববর্তী কালে তার কাছে ধবা পড়েছিল। কারণ 'সাধনা'পর্ব থেকে এ জাতীয় অতীন্দ্রিয়ভাবের অনাবশ্যক গুরুভাব তাঁর সমালোচক-জীবনকে পীড়িত করে নি। 'ভারতী' পবে লিখিত 'আলোচনা' পুস্তিকাটিকে তিনি যে পুনর্বার প্রকাশ করেন নি, তাঁর কাবণ, চিন্তার এই ধরনের অতিশযোক্তি এবং যুক্তিব শিথিলতা। সে যাই হোক, 'সমালোচনা' গ্রন্থে কোন কোন স্থানে চিন্তা ও যৌক্তিকতাব কিছু দুর্বলতা থাকলেও, পরবর্তীকালের সাহিত্যবিচাবে তিনি যে সমস্ত তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তাবই বীজরূপ হচ্ছে এই পুস্তিকাটি।

সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্য সীমা-অসীম প্রভৃতি বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা রবীন্দ্রনাথের মনে যে ধবনের সাহিত্যজিজ্ঞাসা উদ্দীপিত করেছে, তারই আলোকে তিনি কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ আলোচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য', বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা, বসন্তরায়ের পদের মূল্যবিচার এবং লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বাউল গান—মোট চারটি প্রবন্ধে তিনি পূর্বে-আলোচিত সাহিত্যতত্ত্বের মূল্য যাচাই করে নিয়েছেন। 'মেঘনাদবধ' সম্পর্কিত তাঁর দুটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি, এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম ধরনের মহাকাব্যের প্রতি কবির কিছুমাত্র মমতা ছিল না, এবং অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগের দ্বারা যে সাহিত্য রূপ লাভ করে, বিশেষতঃ গীতিকবিতা—তাকেই তিনি যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত করেছিলেন। মধুসূদনের প্রতি বিশেষভাবে, এবং মহাকাব্যের প্রতি সাধারণভাবে তিনি তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁর 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি সাহিত্যরসবিচার ও রসভোগের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই পর্বের মধ্যে রচিত প্রবন্ধের মধ্যে এইটিই অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারে। পরে 'সমালোচনা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত না হলেও এই প্রবন্ধের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি, 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধটি উক্ত প্রবন্ধেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। চুঁচুড়া থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র দুইখণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম খণ্ডটির সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের কোন কোন পাঠ ও ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন নি এবং সেজন্য অক্ষয়চন্দ্রকে মৃদু আক্রমণও করেছিলেন। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পড়তে গিয়েই তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর দিকে আকৃষ্ট হন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ঐ 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পাঠের ফল। পরে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' (১২৯২) শীর্ষক যে-বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন, তারও মূলে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উক্ত সঙ্কলনের প্রভাব আছে। এই সময়ে বিদ্যাপতির পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার পর তিনি গভীর অভিনবেশ সহ বৈষ্ণবপদ পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রমাণ রয়েছে আলোচনার দু'টি প্রবন্ধে (১) চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, (২) বসন্তরায়। প্রথম প্রবন্ধের গোড়াতেই একটু তিক্তস্বরে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কবি ও সুষ্ঠু কল্পনার কী লক্ষণ তা এইভাবে আলোচনা করেছেন :

> "নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে। মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা। আর

গোঁজামিলন দিবার কল্পনা—না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার—না অনুভব করিয়া কবি হইবার একপ্রকার গিল্‌টি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।" (পৃঃ ১১০)

কবির নিজস্ব সত্তা, মানুষ এবং প্রকৃতি—এই হল কবির জগৎ, এবং এই জগতে প্রবেশ করতে হলে কবির স্বাভাবিক কল্পনার সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু যারা কল্পনার অভাবে নিজের, অন্যের এবং প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে না, তারা বাধ্য হয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়, যে-ধরনের কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ 'জালিয়াতি' কল্পনা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"সহজ ভাষায়, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত; কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়। …সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না।"

এখানে অস্পষ্টভাবে তিনি ভারতীয় রসতত্ত্বের ব্যঞ্জনার কথাই বলেছেন, যদিও পারিভাষিক অর্থে অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যঞ্জনাতত্ত্ব তখনও তাঁর অধিগত হয় নি। এইটুকু ভূমিকা করে এই প্রবন্ধে সহজ ভাব ও সহজ ভাষার কবি চণ্ডীদাসের রচনারীতি ও ভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিপুণভাবে বলেছেন,

"আমাদের চণ্ডিদাস[২১] সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লেখাইয়া লন।"

এই অংশে তিনি দেখিয়েছেন যে, শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাব ও ভাষা সহজ প্রাণের আবেগ থেকেই জন্মায়, তার মধ্যে কোন দিক দিয়েই কৃত্রিমতা থাকে না। উপরন্তু যথার্থ কবিতা—বলার চেয়ে না-বলাতেই বেশী প্রকাশ পায়। বহু পূর্বে শিলার এই সম্পর্কে বলেছিলেন :

২১. রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'চণ্ডীদাসে'র বদলে সর্বদা 'চণ্ডিদাস' ব্যবহার করেছেন।

"The artist may be known rather by what he omits, and in literature, too, the true artist may be best recognised by his tact of omission."[২২]

শিলারের কথায় সায় দিয়ে ওয়াল্টার পেটার যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের অভিমতও তার চেয়ে বেশী দূরবর্তী নয়। চণ্ডীদাসের সরলভাষার সহজভাবের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি প্রমাণ করেছেন যে, পূর্ণোক্তির চেয়ে অর্ধোক্তিই অনেক বেশী কাব্যগুণান্বিত হয়। এর পর তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি- -এবং বলাই বাহুল্য এই পর্বে দুঃখের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাপতির রচনাচাতুর্যাদির প্রশংসা করলেও প্রাণের গভীরতার দিক থেকে চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তাঁর এই তুলনামূলক বিচার নিয়ে হয়তো এখন বাদপ্রতিবাদ হতে পারে। প্রাণের গভীর কথা, ব্যঞ্জনার গূঢ় ইঙ্গিত, প্রেমের তীব্র অনুভূতি—বিদ্যাপতির পদে এর কি অজস্র ঐশ্বর্য নেই? সহজভাবে সহজভাষায় যেমন রসসৃষ্টি সম্ভব, তেমনি আবার অলঙ্কৃত বাকপুঞ্জের দ্বারাও রসসৃষ্টি সম্ভব। শুধু সহজ ভাষাই কাব্যের ভাষা, অলঙ্কৃত বিদগ্ধ বাকরীতি কাব্যের ভাষা নয়, এ মতও বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া কঠিন। তা হলে শুধু বিদ্যাপতি নয়,- —জয়দেব, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র কেউ-ই কবি-অভিধা বজায় রাখতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার ব্যতিক্রম। তাঁর সহজ ভাষার কবিতাও যেমন শ্রেষ্ঠ রসবস্তু হয়েছে, তেমনি বক্রোক্তিমূলক অলঙ্কৃত রচনাও সাহিত্যরসের দিক থেকে সমান স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এই যুগের কবিতাতেও ('ছবি ও গান') তিনি খুব সহজ আটপৌরে ভাষায় কাব্যরচনার পরীক্ষা করেছিলেন। তিনিও এই যুগে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো বিশ্বাস করতেন যে, কবিতার ভাষা ও দৈনন্দিন সংলাপের

---

২২. W. Pater—*Appreciation* ("Style"), P. 14 (Macmillan & Co, 1944)

ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং পার্থক্য থাকাও উচিত নয়।[২৩] এই সময়ে এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বিদ্যাপতির তুলনায় বসন্তরায়কে সর্বোচ্চ স্তরে স্থাপন করেছিলেন ('বসন্ত রায়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তাঁর মতে, "বসন্তরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা, উপমার ঘনঘটা নাই, সরল প্রাণের সরল কথা—সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথ্যা।" এই মন্তব্যের পর তিনি উভয় কবির পদের তুলনা দিয়ে এই মন্তব্যটিকে প্রমাণসঙ্গত করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির কিছু কৃত্রিম পদকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করলে তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিমাপ হয় না। রবীন্দ্রনাথ বসন্তরাযের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন :

আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব ?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ?
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জবাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি।

এই পদটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ।" তাঁর মন্তব্যও তর্কাতীত নয়। উক্ত ছত্রে দু'একটি আধুনিক শব্দ ('তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি') ছাড়া বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদকে অতিক্রম করতে পারে, এতে এমন কোন্ গুণ আছে ? তিনি বিদ্যাপতিব

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুডন না গেল।

এবং বসন্তরায়ের :

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি।
তোলা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি॥

২৩. 'লীরিক্যাল ব্যালাড্স্'-এর ১৮০০ এবং ১৮০২ সালের সংস্করণের ভূমিকায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সহজভাষা, এমন কি দৈনন্দিন সংলাপের গদ্যকেও শ্রেষ্ঠ কাব্যে ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন।

ছত্রগুলির তুলনা করে বলেছেন, "বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে" (পৃঃ ১২৯)। বলা বাহুল্য কবির এ সমস্ত মন্তব্য ব্যক্তিগত আবেগের রঙে রঙিন হয়েছে; একে যথার্থ সমালোচনার নিরিখে বড জোর রসানন্দ বা appreciative pleasure বলা যায়। কবি যেন পদাবলীর বসন্তরায়কে নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাই বসন্তরায়ের সাধারণ ধরনের কথাও রবীন্দ্রনাথের কাছে অসাধারণ ও অপূর্ব বলে মনে হয়েছে। তাঁর ভাবমুগ্ধ ও তন্ময় চিত্ত অনেক সময় যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য অতিক্রম করে গেছে, তা স্বীকার করতে হবে। এই আদর্শেই তিনি পরের প্রবন্ধ 'বাউলের গান' আলোচনা করেছেন। সঙ্গীত-সংগ্রহে প্রকাশিত বাউলের গান অবলম্বনে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখে-ছিলেন। প্রবন্ধের গোড়ার দিকে অনেকটা অংশে তিনি বাঙালী জাতির প্রাণের ভাব এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রভাববর্জিত যথার্থ বাংলা ভাষার সন্ধান করেছেন আর এই গ্রাম্য বাউল গানগুলিতে তারই পূর্ণ স্বরূপ দেখেছেন। এখানেও তিনি কয়েকটি মধ্যম শ্রেণীর অর্বাচীন বাউল গান নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং তার ভাব ও ভাষার মধ্যে খাঁটি বাঙালিয়ানার সুর শুনতে পেয়েছেন।

ভাবের আজগবি কল গোরাচাঁদের ঘরে
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর আনছে একতারে,
গো সখি, প্রেম-তারে।

এই পদ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যাকুল চিত্ত অসম্পূর্ণ গানটিকে এইভাবে সম্পূর্ণ করে নিল :

"প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমিষে নিমিষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া

> পৌঁছায়। তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে?" (পৃঃ ১৩৫)

এখানে কবি যেন কীর্তনের আখরের মতো বাউল গানের রস ব্যাখ্যা করেছেন। বাউলেরা যা বলেন নি, বা যা ব্যঞ্জনার আকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন—এটি subjective criticism-এর প্রভাবে পরিকল্পিত। কোন সাহিত্যকর্মকে অবলম্বন করে তার সূত্র ধরে নিজেব মনেব মধ্যেই সমালোচকের পদচারণা, কোন একটি পদকে অবলম্বন কার তার সূত্র ধরে অন্তরের গহনে হারিয়ে যাওয়া--এই ধরনের ব্যক্তিধর্মী সমালোচনার বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যবিষয়ক অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ এই রীতিতেই রচিত। কিন্তু 'ভারতী' পর্বে এই রীতিটি এখনও কবির ততটা আয়ত্ত হয় নি। এখনও তিনি ব্যক্তিগত চিত্তপ্রবণতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন; এতে যৌক্তিকতার বন্ধন কিছু শিথিল। অবশ্য কবির স্বপক্ষে আনাতোলা ফ্রাঁসের যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। ফ্রাস বলেছিলেন,

> "To be quite fr ık, the critic ought to say, 'Gentlemen, I am going to speak about myself, aprpos of Shakespeare, apropos ot Racine."[২৪]

বস্তুতঃ একদল ব্যক্তিবাদী সমালোচক মনে করেন, কোন গ্রন্থকে অবলম্বন করে সমালোচক তাঁর নিজের মনের মধ্যেই বিচরণ করে থাকেন। গ্রন্থটি উপলক্ষ, লক্ষ্য তিনি নিজে। এর অর্থ হল, নিজের ভাবকল্পনা ও অনুভূতির মধ্যে যথেচ্ছা পদচারণা। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের সমালোচনা বিশ্লেষণকালে এর স্বরূপ আরও গভীরভাবে

২৪. W. K. Wimsatt & C. Brooks—*Literary Criticism—a Short History*, P. 494

ধরা পড়বে। উপস্থিত প্রসঙ্গে 'ভারতী' পর্বের আলোচনায় এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারক হিসেবে যে-পথে পদচারণা করবেন, যে-রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করবেন, এখানে তারই আভাস ফুটেছে। এখানে কোথাও কোথাও সাহিত্য-সংক্রান্ত সুদৃঢ় ও সুপরিব্যক্ত অভিমতও লক্ষ্য করা যাবে। প্রভাতসূর্যকে দেখে মধ্যাহ্নসূর্যের স্বরূপ কতকটা বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' পর্বের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে তাঁর পরবর্তীকালের সুগঠিত সাহিত্যসমালোচনা ও রসবিচারপদ্ধতির স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করা যাবে—এই জন্যই এই পর্ব সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করতে হল।

নির্ঘণ্ট